শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন

প্রমদারঞ্জন ঘোষ

ওরিএন্ট্ বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ : জুন : ১৯৬৫

প্রকাশক : শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২
মুদ্রাকর : শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান, নবীন সরস্বতী প্রেস ১৭ ভীম ঘোষ লেন : কলিকাতা ৬

মুখবন্ধ

এই পুস্তকের দুটি অংশ। প্রথম অংশে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা আলোচিত হয়েছে; দ্বিতীয় অংশের আলোচ্য শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন। তাঁর জীবন-কথা আবার স্বভাবতই দুইভাগে বিভক্ত—তাঁর কর্মজীবন ও তাঁর তাপস-জীবন; প্রথম যৌবনে শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদার রাজকর্মচারী, তখন থেকেই তিনি যোগ-অভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। পরে স্বদেশী যুগের বিপুল কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর যোগ-সাধনা অব্যাহত ছিল।

শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মাত্র চার বছর কাল তিনি দেশের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। দেশের রাষ্ট্রনেতাদের পুরোভাগেই ছিল তাঁর আসন। তাঁর ত্যাগ, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দেশ-প্রেম সারা ভারতের হৃদয় জয় করেছিল। দেশ-প্রেমিক অরবিন্দ ঘোষ দেশের যুবকদের নিকট যে শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করেছিলেন আজকের অশীতিপর বৃদ্ধ লেখক তার প্রত্যক্ষদর্শী। সে শ্রদ্ধা-ভক্তি যে কত গভীর ছিল, আজকের যুবকদের পক্ষে তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি প্রায় অসম্ভব।

১৯১০ সনে (যখন শ্রীঅরবিন্দের বয়স চল্লিশেরও কম) তাঁর পণ্ডিচেরী-প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় তাঁর কর্মজীবনের অবসান এবং যোগ-সাধনায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ। জীবনের শেষ চল্লিশটি বছর তাঁর কেটেছিল পণ্ডিচেরীতে। এই চল্লিশ বছরের মধ্যে শেষ পঁচিশ বছর তিনি কাটিয়েছেন পণ্ডিচেরী আশ্রমের সেই নিভৃত সাধন-কক্ষে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

স্বদেশীযুগে শ্রীঅরবিন্দের জীবন ছিল কর্মবহুল। এই কাহিনীতে সেই স্বল্পকালস্থায়ী চার বছরের কথাই অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে; আর তাঁর জীবনের চল্লিশ বছরের ইতিহাস যতই মহান্ হোক না কেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বাস্তবিকই খুব অল্প। তাঁর সেই ঘটনাবিরল জীবনের ইতিহাস কেবল তাঁর নিজের পক্ষেই বলা সম্ভব ছিল। অথচ সে প্রসঙ্গে তিনি বিশদভাবে কিছু লিখে যান নি; তবে তাঁর রচিত পুস্তকসমূহ ও তাঁর লেখা চিঠিপত্র থেকে পাঠককে তা আন্দাজ করে নিতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি কথা বলা দরকার। পাঠক লক্ষ্য করবেন পুস্তকের এই অংশে উদ্ধৃতির সংখ্যা বিস্তর। কেন এত

উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে একটু কৈফিয়ত প্রয়োজন। অনেকের মুখে শোনা যায় শ্রীঅরবিন্দের লেখা সহজবোধ্য নয়। গল্প-উপন্যাসের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের লেখা সহজে বোঝা যাবে, এমন হালকা জিনিস তা নয়। তার মধ্যে প্রবেশলাভ করতে হলে স্বভাবতই একটু আয়াস স্বীকার করতে হবে বৈকি। তবে একথাও ঠিক যে একবার শ্রীঅরবিন্দের লেখার সঙ্গে সম্যক পরিচয় ঘটলে তাঁর লেখার ভাব-গাম্ভীর্য ও ভাষার সৌন্দর্য পাঠককে নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে। তাই প্রথম থেকেই লেখক শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভাষার সঙ্গে পাঠককে একটু পরিচিত করতে চেয়েছেন। উদ্ধৃতিগুলিকে সোপানস্বরূপে ব্যবহার করে পাঠক শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শনে প্রবেশ লাভ করতে পারবেন, লেখকের এই আশা যদি আংশিকভাবেও পুর্ণ হয়, তবে লেখক তাঁর পরিশ্রম সার্থক মনে করবেন।

দুরূহ জিনিস আয়ত্ত করতে হলে প্রথমে বিষয়টি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান-লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়াই সমীচীন। বিশদ্ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার সময় আসবে পরে। From simple to complex—এই হলো জ্ঞান-লাভের ক্ষেত্রে একটি সুবিদিত নীতি। শ্রীঅরবিন্দের মূল কয়েকটি উক্তিই কেবল লেখক উল্লেখ করেছেন। যে অদ্ভুত যুক্তি পরম্পরার সাহায্যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উক্তিগুলি প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছেন সর্বক্ষেত্রে তার উল্লেখ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভব হয় নি। এই পুস্তক শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের ভূমিকা মাত্র।

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা লেখার পরিমাণ যৎসামান্য; তাই উদ্ধৃতিগুলির অধিকাংশই তাঁর The Life Divine, Essays on the Gita, Synthesis of Yoga প্রভৃতি ইংরেজী পুস্তক থেকে নেওয়া। পরিশেষে বক্তব্য The Life Divine ও Essays on the Gita পুস্তক দুটির যে সংস্করণ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তা আমেরিকার The Greystone Press, N. Y. কর্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকার

বিষয়-সূচী

প্রথম অধ্যায় : গোড়ার কথা

দ্বিতীয় অধ্যায় : শ্রীঅরবিন্দের জীবনের পর্বসমূহ

তৃতীয় অধ্যায় : বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ : ব্যক্তিগত জীবন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : আলিপুর বোমার মামলার পটভূমি

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বোমার মামলার বিচার

সপ্তম পরিচ্ছেদ : কলকাতায় শেষ দশ মাস

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যা—(No Control No Co-operation)

পঞ্চম অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ : চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ : শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত সৃষ্টি-তত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

সৃষ্টি—পুরুষ যজ্ঞ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দিব্যকর্ম—The Gospel of Divine Action

শুদ্ধি-পত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	ভুল	শুদ্ধ
১৫	১৭	—	Purani's
৬৩	২২	—	সমাজেরই অর্থে
৬৫	৩	—	পরিচালক সংঘ
৭৩	২৫	উল্লাস	উন্নয়ন
৮৫	৭	দ্বিতীয় কংগ্রেস	কংগ্রেস
৯৪	২৭	—	luminous
৯৬	১৮	—	flung them away
১০০	৫	বলেন	চলেন
১০৩	১৬	final	find
১৫৩	২৬	—	সভাপতির
১৬০	৫	after-images-এর পরে	যোগ করুন "remained before the eye for two minutes
১৮৩	১৪	—	খর-দস্তুর
১৮৬	২৬	জেলে	লেলে
২০৯	৩	—	সেদিন
	২৬	কন্নিত	কম্পিত
২৬৪	৮	—	কুক্
২৬৫	১৬	—	নিমমোহ
	১৯	অসৎ	অস্তু
২৭৩	১৮	মাণ্ডুক্য	মণ্ডুক
২৭৭	২৮	আনন্দ	আদর্শ
২৮৪	১৮	ব্রহ্মা	ব্রহ্ম
২৯২	৯	of	to
২৯৪	২	—	সমং কায়শিরগ্রীবং
২৯৬	১২	ধাতা	ধ্যাতা
৩০৮	২৮	—	প্রতিষ্ঠাতা
৩১৪	৮	এভাবে	প্রভাবে
৩১৫	১৩	—	যোগযুক্ত
	২০	না	বা

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা

প্রথম অধ্যায়

গোড়ার কথা

বর্তমান ভারতের চার মহাপুরুষ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে অল্প কয়েক বছর পর পর আমাদের দেশে যে চারজন প্রধান মহাপুরুষের জন্ম হয়, তাঁরা হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দ। কবিগুরুর জন্ম হয়েছিল ১৮৬১ সনে; স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন ১৮৬৩ সনে; মহাত্মার জন্মসন হলো ১৮৬৯ সন; তার তিন বছর পরে ১৮৭২ সনে শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমের নিকট প্রাচ্যের এই মহাপুরুষেরা প্রত্যেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিলেন; এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে পশ্চিমের নিকট ভারতের জীবনাদর্শ ও ভাবধারা প্রচার করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁদের জীবনের আদর্শ ও কর্মপন্থা অবশ্য এক ছিল না। মহাত্মাজীকে সর্বজগৎ জানে একজন সাধু পুরুষ ও ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা বলে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন কর্মপন্থা—অহিংসা, অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পন্থা প্রদর্শন করেছিলেন। মহাত্মাজীর এ কর্মপন্থা সর্বজগতে বিস্ময়ের সঞ্চার করে, এবং বহু মনীষীর মতে সে পথই হলো বিশ্ব-রাজনীতিতে একমাত্র কল্যাণের পথ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বর্তমান জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তানায়ক বলে পরিচিত। তাঁর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি নিজের দেশকে ভালবাসতেন এবং পৃথিবীর সকল দেশকে নিজের দেশ বলে মনে করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন সন্ন্যাসী এবং এক আধুনিক সন্ন্যাসী দলের স্রষ্টা। তাঁর শিষ্যগণ দেশ-সেবার জন্য সব ছেড়েছেন, প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। তাঁর তীব্র দেশপ্রেমই বিশ শতকের প্রথম দশকে ভারতের যুবকদের মনে দেশপ্রেমের ও জাতীয়তার প্রেরণা দিয়েছিল। আমেরিকা ও ইউরোপে ভারতের ধর্ম ও দর্শন প্রচার করে

সেখানকার বহু লোককে তিনি মুগ্ধ করেছিলেন। আর শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একাধারে সত্যদ্রষ্টা ঋষি, দার্শনিক, কবি, দেশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ছিলেন একজন যোগী; এবং সর্বমানবের কল্যাণ ও উন্নয়ন ছিল তাঁর কাম্য। এই চার মহাপুরুষের জীবন-ধারা পৃথক হলেও তাঁদের ভাব-ধারার মধ্যে মিল ও অমিল দুই-ই দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আলোচ্য শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন। তবে শ্রীঅরবিন্দকে বুঝবার জন্য উপরোক্ত অপর তিন মহাপুরুষের ভাবধারা ও আদর্শের কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করা প্রয়োজন হবে।

ঋষি শ্রীঅরবিন্দ

প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক্। শ্রীঅরবিন্দকে ঋষি বলা হয়। ঋষি কথাটি আমাদের দেশে সুপরিচিত। অতীতে ভারতে বহু প্রসিদ্ধ ঋষি জন্মেছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল তপস্যা করা আর জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞান দান করা। তপস্যা-পূত এই ঋষিগণের চোখের দৃষ্টি যেন খুলে যেত—তাঁরা সত্যদর্শন করতেন। সত্যদর্শন করতেন বলে তাঁদের বলা হতো ঋষি বা সত্যদ্রষ্টা। কেবল প্রাচীন কালেই এদেশে ঋষি জন্মেছিলেন, বর্তমানকালে ঋষির জন্ম হয় না, এরূপ মনে করা ভুল। শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান যুগের একজন সত্যিকারের ঋষি। প্রাচীন ভারতের ঋষিরা যেসব সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন সাধনা করে শ্রীঅরবিন্দও জীবনে সেসব সত্য উপলব্ধি করেন। কেবল তাই নয়; শ্রীঅরবিন্দ প্রাচীন ঋষিদের অজ্ঞাত নতুন সত্যেরও সন্ধান পান। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের উপলব্ধ সত্যের অতিরিক্ত নতুন কিছু জ্ঞাতব্য আর অবশিষ্ট নেই, সত্যদর্শনের অবসান প্রাচীন ঋষিগণের সঙ্গেই ঘটেছে, একথা স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দও বিশ্বাস করতেন না। অতীত ভারত অপেক্ষা অনাগত ভারত শ্রেষ্ঠতর হবে, এবং ভাবী ভারতে আরো শ্রেষ্ঠ ঋষির আবির্ভাব হবে, এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের স্থির মত। পশ্চিমের সুবিখ্যাত মনীষী রোমাঁ রোঁলার মতে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন "ভারতের মহান ঋষিকুলের শেষ ঋষি।" তবে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে প্রাচীন ঋষিদের পার্থক্য এখানে যে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একজন আধুনিক যুগের উপযোগী ঋষি। তাঁর জীবন প্রাচীন ভারতের সাধনার সঙ্গে পশ্চিমের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত-স্থল।

দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ কেবল ঋষি নন একজন জ্ঞান-তপস্বী দার্শনিকও। তাঁর দার্শনিক গ্রন্থগুলি, যথা The Life Divine, The Synthesis of Yoga, The Ideal of Human Unity, The Human Cycle, The Essays on the Gita প্রভৃতি দেশ-বিদেশের পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ The Life Divine আলডুস হাক্সলি (Aldous Huxley), রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের নিকট অতি উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে ; এবং তাঁদের মতে ঐ গ্রন্থখানা দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন আলোকপাত করেছে। তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ সমূহে বিশেষভাবে বর্তমান যুগের শিক্ষিত লোকেরা তাঁদের চিন্তার খোরাক ও হৃদয়ের তৃপ্তি পাবেন, অনেকেরই এরূপ বিশ্বাস। একদিকে পাশ্চাত্যের নানা ভাষা এবং অপর দিকে প্রাচ্যের সংস্কৃত ভাষার সকল শাস্ত্র শ্রীঅরবিন্দের অধিগত ছিল। তিনি তাঁর দার্শনিক গ্রন্থ সমূহে পূর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্বোক্ত মনীষী রোমাঁ রোঁলা বলেছেন শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিভার অপূর্ব মিলন, পরিপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছিল। তাই আজকের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতির মেলামেশার যুগে শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক গ্রন্থগুলি বিশেষ মূল্যবান ও শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রণিধানযোগ্য।

কবি শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ একজন কবি। কবি কথাটি একটি বিশেষ অর্থে, অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা ঋষি অর্থে, আমাদের দেশে উপনিষদে ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের দাবী তিনি এমন অনেক সত্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেছিলেন যা ছিল তাঁর যোগসাধনার প্রত্যক্ষ ফল। এই হিসাবেও তিনি একজন কবি। আবার কবি কথাটির প্রচলিত অর্থ কাব্য-রচয়িতা, সে অর্থেও তিনি একজন কবি। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি একজন স্বভাব-কবি, কবিত্বশক্তি নিয়েই তাঁর জন্ম। কাব্যরচনায় তিনি যে কবি-সুলভ অসাধারণ ছন্দ-জ্ঞানের, শব্দ-চয়ন শক্তির ও কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা কাব্যের সমঝদার ব্যক্তিরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। পাশ্চাত্যের ইংরেজী, ফরাসী, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে তাঁর অবাধ প্রবেশ ছিল। প্রাচীন গ্রীক কবিদের রচনা কাব্যজগতের প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ রচনা—Classical রচনা। গ্রীক সাহিত্যে তিনি পারদর্শী ছিলেন, একথা

বললে যথেষ্ট বলা হয় না, গ্রীক-সাহিত্য তাঁর নখ-দর্পণে ছিল একথা বলাই ঠিক। আর ইংরেজী ছিল তাঁর মাতৃভাষার মতন। কাব্যরচনায় তিনি গ্রীক সাহিত্যের ও ইংরেজী সাহিত্যের ছন্দাদির ব্যবহার সুনিপুণ ভাবে করেছিলেন। তাই তাঁর মেজদা সুকবি মনোমোহন ঘোষ মশাই একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে কাব্যলক্ষীর সাধনায় অনন্যমনা না হয়ে শ্রীঅরবিন্দ যে অন্য নানা কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন তা কাব্যের পক্ষে এক মহা ক্ষতির কারণ হয়েছিল। (What a Loss to Poetry !) শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্য সাবিত্রী বহুজনের নিকট সমাদর লাভ করেছে।

দেশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ দেশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক। তিনি প্রথম যৌবনেই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তিনিই (ও তাঁর বন্ধু শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল) প্রথমে নির্ভীক ভাবে প্রচার করেন যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর লক্ষ্য। সেইজন্য তাঁকে যথেষ্ট দুঃখ বরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু দেশকে ভালবাসতেন বলে তিনি অপর বহু সাম্রাজ্যবাদী দেশপ্রেমিকের ন্যায় কেবল নিজের দেশের স্বার্থই যে খুঁজতেন তা নয়। তিনি বলতেন স্বাধীনতা লাভ করে ভারত সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় অপর দেশের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে কখনো সচেষ্ট হবে না। অর্থাৎ তিনি কেবল দেশপ্রেমিক ছিলেন না বিশ্বপ্রেমিকও ছিলেন।

আজ অনেকেই বুঝেছেন যে দেশ-বিদেশের মধ্যে এই অবাধ যোগাযোগের দিনে আজকের পৃথিবী একটি বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের সমষ্টি মাত্র নয়, এবং সমগ্র জগতের কল্যাণ ব্যতীত কোন একটি দেশের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভবপর নয়। বহু আগেই শ্রীঅরবিন্দ একথা বলেছেন যে সর্বমানব এক। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতিকগণ জাতিসংঘ ও রাষ্ট্রসংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে ব্যর্থ হয়েছেন। আজ জগতে শান্তি কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Ideal of Human Unity গ্রন্থে রাজনীতিকগণের ভুল কোথায় এবং বিশ্বশান্তির প্রকৃত পথ কী তা দেখিয়েছেন। এক সময় ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পুরোভাগেই ছিল তাঁর স্থান; পরে স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে তিনি সরে দাঁড়ান: কেবল ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনা অপেক্ষা সর্বমানবের কল্যাণ-চিন্তা তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠতর মনে হোল। তিনি বাংলা ত্যাগ করে জীবনের শেষ চল্লিশ বছর পণ্ডিচেরীতে সর্বমানবের কল্যাণের জন্য যোগসাধনায় প্রবৃত্ত

ছিলেন। তবে দেশ ত্যাগ করলেও এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও তিনি যে বঙ্গমাতার প্রতি এবং ভারতের স্বাধীনতার প্রতি উদাসীন ছিলেন না তার প্রমাণ আমরা পাব।

যোগী ও Mystic শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ একজন ঋষি, দার্শনিক ও কবি, তিনি দেশপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক—এ সবই সত্য ; কিন্তু এসব তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি একজন যোগী ও Mystic। Mystic বলতে কী বোঝায়? কেউ কেউ Mystic কথাটির বাংলা অনুবাদ করেন "মরমীয়া" সাধক। কেউ আবার Mystic কথাটির অর্থ করেন "অন্তরঙ্গ সাধক"। Mystic-দের বিশ্বাস ঈশ্বর আছেন, এবং মানুষের পক্ষে তার মর্মে বা অন্তরে ঈশ্বরের অনুভূতিলাভ সম্ভব। কেবল আমাদের দেশে নয় পৃথিবীর নানা দেশেই এরূপ Mystic-দের কথা শোনা যায়। ইতিহাসেও কোন কোন Mystic-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ফ্রান্সের কুমারী যোয়ান-অব-আর্ক (Joan of Arc) তার একটি সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন পরাধীন ফ্রান্সকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর তাঁকে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলেন। কুমারী যোয়ান দাবী করেছিলেন তিনি ঈশ্বরের বাণী স্পষ্ট শুনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের এক সহযোগী শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা থেকেই কেন শ্রীঅরবিন্দকে Mystic বলা হয় তা বোঝা যায়। শ্রীঅরবিন্দ যখন বরোদা কলেজের Vice-Principal, তখন তাঁর এক সহযোগী ক্লার্ক সাহেব ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। ক্লার্ক সাহেব বলেছিলেন যে যোয়ান-অব-আর্ক দৈববাণী শুনতেন, আর অরবিন্দ সম্ভবত চর্মচক্ষুর অগোচর দিব্যদর্শন লাভ করতেন। অরবিন্দের চোখে রয়েছে Mystic-এর আলো। ঐ আলো চর্মচক্ষুর অগোচর এবং সাধারণ মানবমনের অগোচর অনেক কিছু দেখতে পায়। আমরা দেখবো ক্লার্ক সাহেবের শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে এ মন্তব্য চন্দননগরের মতিলাল রায় মশাই তাঁর "জীবন-সঙ্গিনী" পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার দ্বারা সমর্থিত হয়। যথাস্থানে সেকথার আলোচনা এপুস্তকে করা হয়েছে। একজন Mystic-এর জীবন আর সাধারণ লোকের জীবন যে একরকমের নয়, পাঠককে একথাটা স্মরণ রাখতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্মরণ রেখে আমরা শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দের জীবনের পর্বসমূহ

শ্রীঅরবিন্দের জীবনী নিম্নলিখিত কয়েকটি পর্বে ভাগ করে আমরা আলোচনা করব :

(১) শৈশব-পর্ব—জন্ম, পরিবার ও পরিবেশ

(২) বিলাতে শিক্ষার পর্ব—৭ বছর বয়স থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত (১৮৭৯ সন থেকে ১৮৯৩ সন পর্যন্ত)

(৩) বরোদায় চাকরির পর্ব (১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯০৬ সনের জুন পর্যন্ত)

(৪) বাংলায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষতার ও স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্বের পর্ব (১৯০৬ থেকে ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত)

(৫) নিভৃত সাধনার পর্ব—চন্দননগরে দেড় মাস (ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ১৯১০) ও পণ্ডিচেরীতে জীবনের শেষ চল্লিশ বছর (৪ঠা এপ্রিল, ১৯১০ সন থেকে ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫০ পর্যন্ত)

শৈশব পর্ব

(ক) **জন্ম**

১৮৭২ সনে ১৫ই আগষ্ট তারিখে কলকাতা নগরীতে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম হয়। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মশাই ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ মশায়ের বন্ধু। তাঁদের স্ত্রীরাও পরস্পরের বন্ধু ছিলেন—একে অন্যকে "গোলাপ" বলে ডাকতেন। মনোমোহন ঘোষ মশায়ের থিয়েটার রোডের বাড়ীতেই শ্রীঅরবিন্দ ভূমিষ্ট হন। শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস ১৫ই আগষ্ট অন্য কারণেও ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন—ঐ দিনেই ১৯৪৭ সনে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। শ্রীঅরবিন্দই প্রথমে নির্ভীক ভাবে ভারতের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন; এবং তাঁর জন্মদিবসেই ভারতের স্বাধীনতার জন্ম কী একটা শুধু আকস্মিক ব্যাপার? Mystic শ্রীঅরবিন্দ তা মনে করতেন না। এর পেছনেও তিনি ভগবানের হাত দেখেছিলেন। ১৯৪৭ সনে ভারতের স্বাধীনতা দিবসে শ্রীঅরবিন্দ যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি একথা বলেন।

(খ) বংশপরিচয়

শ্রীঅরবিন্দের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ মশাই ছিলেন কলকাতার অদূরবর্তী কোন্নগরের প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশের সন্তান। শ্রীঅরবিন্দের মাতা স্বর্ণলতাদেবী ছিলেন বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসু মশায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। কৃষ্ণধন ঘোষ মশাই কলকাতার মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে প্রথমে এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জন নিযুক্ত হন। পরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলাত যান এবং স্কটল্যাণ্ডের এবারডিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে M. D. ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে তিনি রংপুর, ভাগলপুর ও খুলনা জেলায় কৃতিত্বের সঙ্গে সিভিল সার্জনের কাজ করেন। বিলাত থেকে তিনি পুরাদস্তুর "সাহেব" হয়ে এসেছিলেন, এবং K. D. Ghosh নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর উগ্র সাহেবিয়ানার একটি প্রমাণ এই যে তাঁর বাড়ীতে ছেলেমেয়েরা হয় ইংরেজীতে না হয় হিন্দুস্থানী ভাষাতে কথাবার্তা বলত। বাংলা ভাষা তাঁর বাড়ীতে সযত্নে পরিহার করা হতো। তিনি তাঁর শিশুপুত্রদের জন্য Miss Pagett নাম্নী এক ইংরেজ নার্স নিযুক্ত করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গোড়া থেকেই ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী চালচলনে শিশুপুত্রদের অভ্যস্ত করা। শ্রীঅরবিন্দ বাংলা শিখলেন না, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে কথা বলতে শিখলেন। K. D. Ghosh-এর সাহেবিয়ানার আর একটি প্রমাণ উল্লেখ করা যাচ্ছে। ভারতে তাঁর এক ইংরেজ বান্ধবী ছিলেন Miss Akroyd। শিশু অরবিন্দের নামকরণের সময় Miss Akroyd উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণধন ঘোষ মশাই Akroyd পরিবারের নাম অনুসারে শ্রীঅরবিন্দের নাম রাখেন "অ্যাক্রয়েড অরবিন্দ ঘোষ।" বিলাতে সেণ্টপল্‌স্ স্কুলের ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের King's College-এর রেজেষ্ট্রীতে শ্রীঅরবিন্দের নাম A. A. Ghosh (Akroyd Aravinda Ghosh) দেখা যায়। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নামের Akroyd অংশটি বিলাত ত্যাগের পূর্বেই বর্জন করেন।

(গ) শৈশবের শিক্ষা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর K. D. Ghosh-এর কোন আস্থা ছিল না। শ্রীঅরবিন্দের বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর পিতা শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা বিনয়ভূষণ ও মনোমোহন সহ শ্রীঅরবিন্দকে দার্জিলিং-এর লরেটো মঠ-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। ঐ বিদ্যালয়টি বিশেষভাবে ভারতের উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের মিশনারী মেম। শ্রীঅরবিন্দের সহপাঠীরা ছিল ইউরোপীয় ছেলেমেয়ে। শিক্ষার ও কথাবার্তার ভাষা সেখানে ইংরেজী, বাংলা ভাষার সেখানে কোন স্থান ছিল না। দার্জিলিং-এ শ্রীঅরবিন্দ প্রায় দুবছর ছিলেন। তারপর পুরোপুরি বিলেতী পরিবেশে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া Dr. K. D. Ghosh স্থির করেন। তদনুসারে ১৮৭৯ সনের মে মাসে তিনি স্ত্রী স্বর্ণলতাদেবী, তিনপুত্র বিনয়ভূষণ, মনোমোহন ও শ্রীঅরবিন্দ এবং শিশুকন্যা সরোজিনীকে নিয়ে বিলাত যাত্রা করেন। তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত থেকেই তাঁর ছেলেরা পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম হয়ে উঠুক।

Dr. K. D. Ghosh-এর সুচিকিৎসক বলে খ্যাতি ছিল। তাঁর তেজস্বিতাও ছিল অসাধারণ। সেকালে শিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়া বিশেষ সাহসিকতার পরিচায়ক ছিল এবং প্রায়শ্চিত্ত না করলে সেকালে সমাজে বিলাত ফেরতের স্থান হোত না। তিনি কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী হলেন না, গ্রাম ও সমাজ ত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলেন। হৃদয় ছিল তাঁর অতি উদার; গরীবদুঃখীদের প্রতি তাঁর দরদ ছিল যথেষ্ট। "সাহেব" হলেও তিনি দেশকে ভালবাসতেন। মুক্ত হস্তে দান করা ছিল তাঁর অভ্যাস; এইজন্য অনেক সময় তাঁর এমন অর্থাভাব হতো যে ছেলেদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সব সময় তিনি বিলাতে পাঠাতে পারতেন না। এই পরিবেশে শ্রীঅরবিন্দের শৈশব কাটে। কিন্তু ইহাই একমাত্র পরিবেশ ছিল না। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে তাঁর মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। শৈশবেও দার্জিলিং-এ পড়ার সময় ছুটিতে শ্রীঅরবিন্দ দেওঘরে মাতামহ রাজনারায়ণ বসু মশায়ের গৃহে যেতেন। রাজনারায়ণ বসু মশাই ছিলেন Dr. K. D. Ghosh-এর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক।

(ঘ) মাতামহ রাজনারায়ণ বসু

রাজনারায়ণ বসু মশাই ছিলেন তৎকালে প্রসিদ্ধ হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে জানা যায় তিনি ছিলেন ইংরেজীতে সুপণ্ডিত; এবং উপনিষদাদিতে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়। তিনি ছিলেন একজন মহাপ্রাণ, সরলস্বভাব ও ঈশ্বরভক্ত ব্যক্তি। ব্রাহ্মসমাজের নেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিনি ছিলেন একজন প্রধান সহযোগী এবং ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সেকালে হিন্দু কলেজের বহু ছাত্রই

ইংরেজী শিক্ষার মোহে এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে হিন্দুধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন একবার প্রকাশ্যে বলেছিল, "If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism." অর্থাৎ মনে প্রাণে যেই জিনিসটিকে আমরা ঘৃণা করি তা হচ্ছে হিন্দুধর্ম। এককথায় সেকালের অনেক হিন্দু যুবক চাল চলনে, আচার-ব্যবহারে বিজাতীয়-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। দেশের ভাষা, দেশের পোশাক ও আচার-ব্যবহার ত্যাগ করে নির্বিচারে ইংরেজের অনুকরণ করাকেই তারা সভ্যতার পরাকাষ্ঠা মনে করত। মাতৃভাষায় কথা বলা বা লেখা তাদের নিকট ছিল অগৌরবের বিষয়। দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির কোন খোঁজই তারা রাখত না। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু মশাই ছিলেন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী হয়েও তিনি দেশে সমাজ ও ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভালবাসতেন। তাঁর "হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ক বক্তৃতা আর "বৃদ্ধ হিন্দুর আশা" প্রবন্ধ বিখ্যাত। বাঙালী ছেলেরা বাংলা ভাষার চর্চা করুক এই ছিল তাঁর কাম্য। সমাজ সংস্কারক হয়েও তিনি সমাজের সুপ্রথাসকল রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। নিম্নে তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল।

রাজনারায়ণ বসু মশাই অনেক দিন মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সেখানে তিনি "জাতীয় গৌরব-সঞ্চারিণী সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন। সভার নাম অর্থপূর্ণ। এই সভার সভ্যগণের লক্ষ্য ছিল হিন্দু সভ্যতার নির্দোষ প্রথাগুলি রক্ষা করা। হিন্দু সঙ্গীতের অনুশীলন এবং সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার চর্চা ও বহুল প্রচলন ছিল তাঁদের কাম্য। তাঁরা দেশের প্রাচীন সুপ্রথাসকল মেনে চলতেন। ১লা জানুয়ারীর পরিবর্তে দেশের চিরদিনের প্রথা অনুসারে ১লা বৈশাখ নববর্ষের উৎসব পালন করতেন। লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎকালে বিজাতীয় "Good morning" না বলে তাঁরা বলতেন সুপ্রভাত; এবং আমাদের দেশের সনাতন প্রথায় তাঁরা প্রণাম নমস্কারাদি করতেন; ইত্যাদি। মোট কথা রাজনারায়ণ বসু ছিলেন একজন দেশভক্ত। বিশ শতকের প্রথম দশকে দেশে জাতীয় আন্দোলন শুরু হবার বহু আগে রাজনারায়ণ বসু মশাই আর তাঁর বন্ধু ও সহযোগী নবগোপাল মিত্র মশাই জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। নবগোপাল মিত্রের প্রসিদ্ধ হিন্দুমেলা কংগ্রেসের জন্মের পূর্বে কলকাতায় জাতীয়তার বন্যা এনেছিল। বস্তুত রাজনারায়ণ বসু মশাই ছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একজন

অগ্রদূত। তাই আমাদের দেশের এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তাঁকে "কংগ্রেসের পিতামহ" এই আখ্যা দিয়েছিলেন।)

(রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে তাঁর বালক বয়সের যে গুপ্তসমিতির কথা বলেছেন (সঞ্জীবনী সভা) তারও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু মশাই। সেই গুপ্তসমিতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নবজীবন আনয়ন। সমিতির কাজ ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "রাজনৈতিক তাপের আগুন পোহানো।" সভার অবশ্য অকালমৃত্যু হয়েছিল কিন্তু বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজনারায়ণ বসুর দেশপ্রেম অটুট ছিল। শ্রীঅরবিন্দ মাতামহের এই দেশপ্রেমের অধিকারী হয়েছিলেন।)

আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় সংস্কৃতির অপূর্ব মিলন ঘটেছিল। তার পরিবারের পরিবেশেও এই উভয়বিধ সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠা লক্ষিত হয়। যথা, তাঁর পিতার ছিল পশ্চিমের সংস্কৃতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা; আর তাঁর মাতামহের ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর নিষ্ঠা। তাঁর পিতা চেয়েছিলেন পুত্রকে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম করতে কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত রাখতে। তিনি শ্রীঅরবিন্দের বিলাতের শিক্ষকদের অনুরোধ করেছিলেন তাঁর পুত্রকে যেন বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেওয়া না হয়। তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল—শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম হয়েছিলেন; কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল্য স্বীকার করলেও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে শ্রীঅরবিন্দের চিত্তের সকল ক্ষুধা মেটাতে পারে নি একথা ঠিক। দেশে ফিরে এসে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের গীতা ও উপনিষদে তাঁর চিত্তের সে ক্ষুধা মেটাবার উপকরণ লাভ করেছিলেন—মাতামহ রাজনারায়ণ বসু মশায়ের ন্যায় তিনি আর্য সভ্যতার, ভারতীয় সভ্যতার, মহাভক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ছিলেন মাতামহের প্রিয় দৌহিত্র এবং তাঁর জীবনে মাতামহের প্রভাব অস্বীকার যায় না। (১৮৯৩ সনে তিনি দেশে ফিরে এলেন এবং ১৮৯৯ সনে তাঁর মাতামহের মৃত্যু হয়। বরোদায় চাকরী করার সময় প্রতি বছর ছুটিতে দেওঘরে মাতামহের গৃহে শ্রীঅরবিন্দ নিয়মিত যেতেন।))

বিলাতে শিক্ষার পর্ব—ম্যাঞ্চেষ্টার

বিলাতে প্রথম পাঁচ বছর (১৮৭৯-৮৪) শ্রীঅরবিন্দ ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে বাস করেছিলেন। সেই শহরের একজন পাদ্রী ও শিক্ষক Rev. William H. Drewett ছিলেন Dr. K. D. Ghosh-এর এক ইংরেজ বন্ধু, রংপুরের

ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেজিয়ার সাহেবের আত্মীয়। সেই পরিচয়-সূত্রে মিঃ ড্রুয়েট ও তাঁর স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে তাঁদের গৃহে শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। শ্রীঅরবিন্দের বড় দুই ভাইয়ের স্কুলে যাবার বয়স হয়েছিল, তাই তাদের ম্যাঞ্চেষ্টার শহরে এক স্কুলে ভর্তি করা হয়। মিঃ ড্রুয়েট শ্রীঅরবিন্দকে লাতিন ও ইংরেজী শেখাতেন, আর তাঁর পত্নীর নিকট শ্রীঅরবিন্দ ইতিহাস, ভূগোল, পাটীগণিত ও ফরাসী ভাষার পাঠ নিতেন। চার মাস বিলাতে থেকে তাঁর ছেলেদের পড়ার ব্যবস্থা করে Dr. K. D. Ghosh দেশে ফেরেন। তার স্ত্রী স্বর্ণলতাদেবী আরো কিছুকাল বিলাতে থাকেন ; এবং সেখানে ১৮৮০ সনের মার্চ মাসে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বারীন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। এরপর Dr. K. D. Ghosh চোদ্দ-পনেরো বছর জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর দুই দাদা বিলাতেই ছিলেন, দেশে আর আসেন নি, এবং পিতার সঙ্গে তাঁদের আর জীবনে দেখা হয় নি। অবশ্য পিতার সঙ্গে পুত্রদের চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হত।

মিঃ ড্রুয়েট ছিলেন লাতিন ভাষায় সুপণ্ডিত, আর শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন মেধাবী। তাই বালক অরবিন্দ লাতিন ভাষা ভাল করেই শেখেন। স্কুলে যেতে হত না বলে বাড়ীতে পড়াশোনার সময় শ্রীঅরবিন্দ যথেষ্ট পেতেন। খেলাধূলায় তাঁর মন ছিল না, খেলতে তিনি ভাল পারতেনও না। তাই এসময় তিনি বাইবেল আর সেক্সপীয়র, শেলি, কীট্‌স্ প্রভৃতি কবির গ্রন্থ অনেক পড়েন। ফলে তাঁর শিক্ষার বুনিয়াদ বেশ পোক্ত হয়। কয়েক বছর পর মিঃ ড্রুয়েট অষ্ট্রেলিয়ায় চলে যান এবং বালক অরবিন্দ বার বছর বয়সে ১৮৮৪ সনে বিলাতের একটি প্রথম শ্রেণীর স্কুলে, লণ্ডনের সেণ্টপল্‌স্ স্কুলে ভর্তি হন।

সেণ্টপল্‌স্ স্কুলে শ্রীঅরবিন্দ

সেণ্টপল্‌স্ স্কুলে (১৮৮৪-১৮৯০) শ্রীঅরবিন্দ ছয় বৎসর পড়েছিলেন। সেণ্টপল্‌সের প্রধান শিক্ষক Dr. Walker শ্রীঅরবিন্দের মেধার এবং ঐ অল্প বয়সেই তাঁর লাতিন ভাষায় জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে এতই সন্তুষ্ট হন যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের জন্য গ্রীক ভাষা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করেন। স্মরণ রাখতে হবে সেকালে ঐসব স্কুলে লাতিন ও গ্রীক এই দুই ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। Liberal Education অর্থাৎ ভদ্র সমাজের লোকদের উপযোগী শিক্ষা বলতে সেযুগে যে শিক্ষা বোঝাত লাতিন ও গ্রীক ভাষা ছিল সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক ভাষা শিক্ষায়ও বিশেষ পারদর্শিতা দেখালেন এবং স্কুলে তিনি দ্রুত উপরের ক্লাশে "প্রমোশন" পেতে থাকেন।

মেধাবী শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে ক্লাসের পড়া তৈরি করতে বেশী সময় দেবার প্রয়োজন হতো না। স্কুলে শেষ তিন বছর তো অধিকাংশ সময়ই তিনি ইংরেজী সাহিত্যের ও ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশের সাহিত্যের ও ইতিহাসের চর্চায় কাল কাটাতেন। সেন্টপল্‌স্‌ স্কুলে পড়বার সময়ই তিনি গ্রীক (ও লাতিন) ভাষা ভাল করেই শেখেন। ইংরেজী তো তাঁর মাতৃভাষার মতনই ছিল। ফরাসী ভাষাও তিনি সযত্নে আয়ত্ত করেছিলেন, এবং ফরাসী সাহিত্য তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। এ ছাড়া জার্মান, ইতালীয় ও স্পেনিশ প্রভৃতি ভাষায়ও তিনি প্রবেশ লাভ করেছিলেন। কবিতা ও ইতিহাসই ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। বিলাতে থাকা কালে ইউরোপের প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান যুগের ইতিহাস তিনি যত্নপূর্বক পড়েছিলেন। ইংরেজীতে কবিতা রচনায়ও তিনি অভ্যস্ত ছিলেন—শ্রীঅরবিন্দের প্রথম উল্লেখযোগ্য কবিতা রচিত হয়েছিল যখন তাঁর বয়স চোদ্দ বছর। তাঁর স্কুলের শিক্ষকদের কেউ কেউ এই বলে দুঃখ করতেন যে তিনি পাঠ্যপুস্তকে যথেষ্ট মনোনিবেশ না করে নানা বিষয়ের বই পড়ে সময় কাটান। (সেন্টপল্‌স্‌ স্কুল থেকে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করে তিনি বার্ষিক ৮০ পাউণ্ড মূল্যের একটি বৃত্তিলাভ করেন ; এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবার অধিকার লাভ করেন।) এই বৃত্তি লাভ করবার পর তাঁর ও তাঁর ভাইদের যে আর্থিক দুরবস্থার একটু অবসান হয় এখানে সেকথাটার একটু উল্লেখ প্রয়োজন। বিলাতে অর্থের অভাবে শ্রীঅরবিন্দকে খুবই কষ্ট পেতে হয়েছিল।

বিলাতে অর্থাভাব

পূর্বেই বলা হয়েছে যে Dr. K. D. Ghosh যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলেও তাঁর অর্থাভাব ছিল এবং বিলাতে ছেলেদের কাছে তিনি নিয়মিত ভাবে টাকা পাঠাতে পারতেন না। Dr. Ghosh মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করতেন। তাঁর পত্নী স্বর্ণলতাদেবী বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে পড়েছিলেন। দেওঘরের নিকট রোহিণী নামক স্থানে এক স্বতন্ত্র বাড়ীতে চাকর-দারোয়ানসহ তাঁকে রাখতে হয়েছিল। এজন্য Dr. Ghosh-কে বহু অর্থ ব্যয় করতে হতো। তারপর কর্মস্থলে নিজের পদ-মর্যাদা রক্ষা করতে এবং সাহেবিয়ানা বজায় রাখতে Dr. Ghosh-কে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতো। ফলে প্রথম কয়েক বছর টাকা পাঠাবার পর শেষে আর তাঁর পক্ষে বিলাতে ছেলেদের নিকট নিয়মিত টাকা পাঠানো সম্ভব হতো না। শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর ভাইদের খাওয়া-পরার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ

টাকা তাঁদের হাতে সব সময় থাকতো না। কষ্টেই তাঁদের দিন চলতো। শ্রীঅরবিন্দের নিম্নলিখিত পত্রখানা থেকে তাঁদের সেসময়ের অবস্থার কথা জানা যায়ঃ

"সাতবছর বয়সে আমার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাসহ আমাকে বিলাতে পাঠানো হয়। বিগত আট বছর যাবৎ আমরা নিজেদের চেষ্টায়ই কোনরূপে দিন গুজরান করে আসছি। এদেশে কারো নিকট—কোন সাহায্য পাই নি। আমাদের পিতা খুলনার সিভিল সার্জন Dr. K. D. Chosh আমাদের যে অর্থ প্রেরণ করেছেন তা অপর্যাপ্ত; তা দিয়ে নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি; এবং কয়েক বছরই আমরা অর্থাভাবে বিব্রত আছি।" পত্রখানা ১৮৯২ সনের নভেম্বর মাসে (I. C. S বা ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর) শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কমিশনারদের নিকট লেখেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শ্রীঅরবিন্দ যখন লণ্ডনের সেণ্টপল্‌স্ স্কুলের ছাত্র তখন অর্থাভাব কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করার জন্য শ্রীঅরবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ভূষণকে বাধ্য হয়ে দিনের কিছুটা সময়ের জন্য চাকরি করতে হতো। আসামের ভূতপূর্ব চিফ কমিশনার Sir Henry Cotton ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবন্ধু। হেনরী কটনের ভ্রাতা James Cotton ছিলেন লণ্ডনের South Kensington Liberal club নামক একটি ক্লাবের সেক্রেটারী। বিনয়ভূষণ তাঁর সহকারী রূপে দিনে কিছুটা সময় কাজ করতেন। সপ্তাহে তিনি সামান্য কয়েক শিলিং বেতন পেতেন; তবে ক্লাবের উপরতলায় একটি ঘরে তিনি ও শ্রীঅরবিন্দ থাকবার সুযোগ পান। তাঁদের অপর ভ্রাতা মনোমোহন অন্যত্র থাকতেন। এই সূত্রে James Cotton শ্রীঅরবিন্দের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন। James Cotton ছিলেন ঘোষভ্রাতাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর পরামর্শে শ্রীঅরবিন্দ পরে উপরোক্ত পত্রখানা লিখেছিলেন।

সেণ্টপল্‌স্ স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে তিনি যখন কেম্ব্রিজে যান তখন শ্রীঅরবিন্দের আর্থিক অবস্থার একটু উন্নতি হয়। তাঁর বৃত্তির টাকা থেকে তিনি ভাইদের কিছু কিছু সাহায্য করতেন; তাই কেম্ব্রিজেও প্রয়োজনীয় সকল ব্যয়ভার বহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। মিঃ প্রথেরো নামক কেম্ব্রিজের একজন শিক্ষক শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। একবার একজন ব্যবসায়ী কিছু জিনিস শ্রীঅরবিন্দকে সরবরাহ

করে। কিন্তু যথাসময়ে তার প্রাপ্য টাকা না পাওয়াতে আদালতে নালিশ করবার ভয় দেখায়। মিঃ প্রথেরো শ্রীঅরবিন্দের পিতাকে সত্বর টাকা পাঠাতে অনুরোধ করে এক পত্র দেন। Dr. K. D. Ghosh কিছু টাকা পাঠান এবং অমিতব্যয়ী বলে শ্রীঅরবিন্দকে পত্রে তিরস্কার করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ হেসে বলেছিলেন, There was no money to be extravagant about; অর্থাৎ ব্যয় করবার মতন টাকাই তাঁর ছিল না, অমিতব্যয়ী হওয়া তো দূরের কথা। বিলাতে থাকা কালে শ্রীঅরবিন্দকে নানা অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল; তার ফলে যে তিনি চরিত্রের দৃঢ়তা অর্জন করেছিলেন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা দেখব কোনদিনই বিপদে আপদে তিনি ধৈর্য হারাতেন না।

কেম্ব্রিজে শ্রীঅরবিন্দ

যে পরীক্ষায় পাশ করে তিনি বৃত্তি পান তা ছিল খুবই শক্ত পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অসামান্য ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দেন। Oscar Browning নামক কেম্ব্রিজের এক বিখ্যাত অধ্যাপক গ্রীক ও লাতিন ভাষার পরীক্ষক ছিলেন। কেম্ব্রিজে যাবার পর Oscar Browning-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হলে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে যা বলেন তা এই: "I suppose you know you passed an extraordinarily high examination. I have examined papers at thirteen examinations, and I have never during that time seen such excellent papers as yours." (এই পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দের Shakespeare ও Milton সম্বন্ধে একটি তুলনামূলক রচনার অতি উচ্চ প্রশংসা করে Oscar Browning বলেন, "As for your essay it was wonderful.") ঐ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তাঁর পুত্রের যে উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন তা শুনে শ্রীঅরবিন্দের পিতার আনন্দের সীমা রইল না।

১৮৯০ সনে শ্রীঅরবিন্দ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের King's College-এ যোগ দেন। সেখানে তিনি মাত্র দুই বছর কাল ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে কলেজের পড়া শেষ করতে হয়। কেবল তাই নয় সেণ্টপল্‌স্ স্কুলে শেষের দিকে ১৮৯০ সনের জুলাই মাসে তাঁর পিতার নির্দেশে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন। তাঁর ভাই বিনয়ভূষণ একই সময়ে ঐ পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হন। কেম্ব্রিজে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে অসাধারণ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। একদিকে তাঁকে সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন পরীক্ষাগুলির

জন্য প্রস্তুত হতে ও পরীক্ষায় উপস্থিত হতে হয়েছিল ; অপরদিকে যথাসময়ে কেম্ব্রিজের পরীক্ষায় পাশ করাও তাঁর দায় ছিল, কেননা তিনি বৃত্তিধারী। এই দুই বছর তিনি যে কী অসাধারণ শ্রমশীলতা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা জানা যায় উপরোক্ত প্রথেরো সাহেব তাঁর কাজ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন তা থেকে। প্রথেরো সাহেব বলেছিলেন : He performed his part of the bargain as regards the college most honourably and took a high place in the first of the Classical Tripos, part one at the end of the second year of his residence. He also obtained certain prizes, showing command of English and literary ability. That a man should have been able to do this (which alone is quite enough for most undergraduates) and at the same time keep up his I. C. S. work proves very unusual industry and capacity. Besides his classical scholarship he possesses a knowledge of English literature far beyond the average of undergraduates and writes much better English than most young Englishmen. (Quoted from A. Puran's Life of Sri Aurobindo).

স্মরণ রাখতে হবে যারা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সসম্মানে B. A পরীক্ষায় পাশ করেন তাঁরা এই Tripos পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। শ্রীঅরবিন্দ Classics বা লাতিন গ্রীক ভাষা বিষয়ে কেম্ব্রিজের B. A. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন। এক বছরের বেশী তিনি ঐ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবার সময় পান নি ; কারণ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার্থী হিসাবে তাঁকে কেম্ব্রিজে প্রথম বছর সিভিল সার্ভিসের নির্দিষ্ট পরীক্ষাগুলিও পরপর পাশ করতে হয়। ১৮৯২ সনে শ্রীঅরবিন্দকে সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবীশ রূপে গ্রহণ করা হয় ; তবে পাকাপাকি ভাবে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হবার পূর্বে তাঁর আর একটি পরীক্ষা বাকী ছিল—ঘোড়ায়-চড়া পরীক্ষা তখনো বাকী ছিল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি গ্রীক ও লাতিনে যে নম্বর পেয়েছিলেন ইতিপূর্বে কেউ নাকি আর তত নম্বর পায় নি।

শ্রীঅরবিন্দের পিতা সিভিল সার্ভিসের প্রবেশিকা পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দের সফলতার কথা শুনে খুশি হয়ে খুলনা থেকে দেওঘরে তাঁর শ্যালক যোগীন্দ্র বসুকে

১৮৯১ সনের ২রা ডিসেম্বর তারিখে যে পত্র লেখেন তার থেকে পিতার পুত্র-গর্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন: "আমার তিন ছেলেকে মানুষের মতন মানুষ করে তুলেছি। আমি হয়ত বেঁচে থেকে দেখে যাব না; তবে তোমরা তাদের নিয়ে নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করবে। তারা দেশের এবং বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আমার আশা অরো (শ্রীঅরবিন্দ) দেশ শাসনে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তার দেশকে গৌরবান্বিত করবে। সে এখন কেম্ব্রিজের King's College-এর ছাত্র। নিজের শক্তিতেই সে সেখানে স্থান লাভ করেছে।" কিন্তু ডাঃ ঘোষের আশা পূর্ণ হলো না—শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে স্থান পেলেন না। তার ইতিহাস বিচিত্র।

ঘোড়ায়-চড়ার পরীক্ষায় তিনি প্রথমবার যখন উপস্থিত হন তখন তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান, ফলে ফেল হন। কেম্ব্রিজে ঘোড়ায় চড়া শিখতে হলে বেশ কিছু অর্থব্যয় করতে হতো; অর্থাভাবে ভাল করে শিখবার সুযোগ তিনি লাভ করেন নি। James Cotton পীড়াপীড়ি করাতে শ্রীঅরবিন্দ দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেবার সুযোগ প্রার্থনা করে দরখাস্ত করেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করা হয়। দ্বিতীয়বার পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিন তাঁকে জানান হয়, কিন্তু তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হলেন না। এর পরও অনেকবার তাঁর পরীক্ষার দিন স্থির হয় কিন্তু তিনি পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকেন। অনেকের অনুমান ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়ে ভারতের ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করার জন্য শ্রীঅরবিন্দের মনে কোন আগ্রহ ছিল না। অথচ সরাসরি ঐ চাকরি গ্রহণ না করা তাঁর পিতা ও ভাইদের মনঃপুত হবে না; তাই কৌশলে (পরীক্ষায় অনুপস্থিত থেকে) তিনি ঐ চাকরি গ্রহণ করার দায় এড়ালেন। বিলাতের কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ার সামর্থ্য প্রমাণ করতে না পারার জন্য এই প্রতিভাবান যুবককে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করতে না দেওয়া সংগত হবে না, এরূপ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু তখনকার ভারত-সচিব লর্ড কিম্বার্লির শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল না। তিনি স্পষ্টই বললেন শ্রীঅরবিন্দকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। লর্ড কিম্বার্লির এ ধারণার মূলে কী ছিল দেখা যাক্।

কেম্ব্রিজের Indian Majlis ভারতীয় ছাত্রদের এক বিখ্যাত বিতর্ক-সভা। ১৮৯১ সনে অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের কেম্ব্রিজে যোগদানের অল্প পরে এই সভাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শ্রীঅরবিন্দ কিছুদিন এই সভার সেক্রেটারীর কাজ করেন।

মজলিসে ভারতীয় ছাত্রগণ রাজনীতিরও চর্চা করতো। শ্রীঅরবিন্দ মজলিসে ভারতের রাজনীতি, ভারতের শাসন-সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে "গরম গরম" বক্তৃতা দিতেন; এবং সিভিল সার্ভিসের কমিশনারদের ও ভারতসচিবের কাছে ঐসব বক্তৃতার কথা অজ্ঞাত ছিল না। যাঁর মতামত ঐরূপ, তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হবার অনুপযুক্ত, এ ধারণাই লর্ড কিম্বার্লি প্রভৃতির হৃদয়ে উপজাত হয়ে থাকবে; এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে তাঁকে না-নেওয়ার এই ছিল হয়ত আসল কারণ। ঘোড়ায় চড়তে না পারাটা তুচ্ছ ব্যাপার। ভারতে নিযুক্ত হয়ে আসবার পরও নাকি কেউ কেউ এই পরীক্ষা দেবার সুযোগ লাভ করতো। শ্রীঅরবিন্দও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন না, তাও আমরা দেখেছি। এটা ভারতের ও সর্ব-জগতের মহাসৌভাগ্য যে, ভারতের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরূপে শ্রীঅরবিন্দকে জীবন কাটাতে হলো না। শ্রীঅরবিন্দ সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হলে মহামান্য ভারতসরকার নিঃসন্দেহে একজন সুযোগ্য কর্মচারী লাভ করতেন; কিন্তু ভারতবাসী ও সর্বজগৎ যোগী, দার্শনিক, দেশপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দকে হারাতো। সে যাক্, শ্রীঅরবিন্দকে সিভিল সার্ভিসে নেওয়া হয় নি এ সংবাদ পেয়ে শ্রীঅরবিন্দের পিতা খুবই দুঃখিত হলেন।

বরোদা রাজসরকারে চাকরি গ্রহণ

১৮৯২ সনের অক্টোবর মাসে কেম্ব্রিজ ত্যাগ করে শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনে আসেন। লেখাপড়া সাঙ্গ হয়েছে, এখন কী করবেন তা-ই হলো শ্রীঅরবিন্দের সমস্যা। এই সময় বরোদার গায়কোবাড় বিলাতে ছিলেন। James Cotton-এর চেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দ গায়কোবাড়ের নিকট পরিচিত হলেন। ঐ বুদ্ধিমান নৃপতি শ্রীঅরবিন্দের বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বিশেষ সন্তুষ্ট হন, এবং বরোদা সরকারের কাজে তাঁকে নিযুক্ত করেন। তাঁর বেতন তখনকার মতন স্থির হয় দুশত টাকা। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন উচ্চশিক্ষিত যুবককে মাত্র দুশত টাকা বেতনে পেয়ে গায়কোবাড় নাকি বিশেষ খুশী হয়েছিলেন। ১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে শ্রীঅরবিন্দ চোদ্দ বছর পরে দেশে ফিরে আসেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর।

শ্রীঅরবিন্দ দেশে পৌঁছবার আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ডাঃ কে. ডি. ঘোষ-এর মৃত্যু বড়ই শোকাবহ। তাঁর মেয়ে সরোজিনীদেবী পিতার মৃত্যুর যে বিবরণ দিয়েছেন তা এই: একদিন বেড়াতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে

ডাঃ ঘোষ টমটমে উঠেছেন এমন সময় তাঁর নিকট এক টেলিগ্রাম এলো। টেলিগ্রাম এলো ডাঃ ঘোষ-এর বিলাতের ব্যাঙ্ক থেকে। টেলিগ্রামে তাঁকে জানানো হলো তাঁর পুত্র শ্রীঅরবিন্দ যে জাহাজে বিলাত থেকে ভারতে যাত্রা করেছেন সে জাহাজ জলমগ্ন হয়েছে। পুত্রের মৃত্যু অবধারিত মনে করে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং অল্প পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। ভারতের দিকে আসবার কালে যে জাহাজখানি জলমগ্ন হয়, শ্রীঅরবিন্দ সে জাহাজে রওনা না হয়ে পরবর্তী এক জাহাজে রওনা হন, এ সংবাদ মৃত্যু-পথযাত্রী পিতার নিকট অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ইউরোপীয় ভাবধারার প্রভাব

শ্রীঅরবিন্দের বিলাতের জীবনের পূর্ণ বিবরণ দিতে হলে শুধু তাঁর জ্ঞানার্জনের ও পরীক্ষায় পাসের কথা বলাই যথেষ্ট নয়; তাঁর মনের উপর বিলাতের পরিবেশ কী প্রভাব বিস্তার করেছিল সেকথাও বলা দরকার। বাল্যে ও প্রথম যৌবনেই মনের উপর পরিবেশের প্রভাব খুব বেশী হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দের বাল্য ও প্রথম যৌবন কেটেছিল স্বদেশের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বিদেশের আবহাওয়ায়। স্বদেশের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁর শুধু পত্রের মারফত যেটুকু যোগ সম্ভব ততটুকুই যোগ ছিল, তার বেশী নয়। দেশের ভাষা ও সংস্কৃতি তার নিকট প্রায় অজ্ঞাতই ছিল—বিদেশীর লেখা ভারতীয় সংস্কৃতির ও ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর অল্পস্বল্প হয়ত পরিচয় ছিল। Max Muller-এর সম্পাদিত 'Sacred Books of the East Series'-এর কিছু কিছু গ্রন্থ নাকি তিনি পড়েছিলেন। এদেশে আসবার আগে ভারতীয় সংস্কৃতি ও দর্শনের কিছুই তিনি জানতেন না বলা চলে। তিনি বলেছেন প্রথম জীবনে তিনি ভালবাসতেন কবিতা, ইতিহাস ও রাজনীতি। ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস তিনি খুব যত্নপূর্বকই পড়েছিলেন। সেই যুগের অর্থাৎ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস ও ভাবধারার মধ্যেই তিনি মানুষ হয়েছিলেন। সেই যুগের ইউরোপের রাজনীতির ক্ষেত্রে লোকের মনে যে দুটি মনোভাব বিশেষ প্রবল ছিল তা হলো জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র। সেযুগ ইউরোপের জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের যুগ। জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতাকামী, পরাধীনতার ঘোর বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দের বিলাত গমনের কিছুকাল পূর্বে জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত ইতালী তখন ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও কাভুরের ন্যায় জাতীয়তাবাদীদের নেতৃত্বে বিদেশীয়দের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন

হয়েছিল। বিলাতে শ্রীঅরবিন্দের চোখের সম্মুখে জাতীয়ভাবের প্রেরণায় আয়ারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে স্বাধীনতা-আন্দোলন চলছিল। আইরিশ স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেতা পার্নেলের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল; এবং পার্নেলের মৃত্যু হলে শ্রীঅরবিন্দ একটি কবিতায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতালাভের ইতিহাস থেকে, যথা মধ্যযুগের ফ্রান্সের ইংরেজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতালাভের ইতিহাস থেকে, আর বর্তমান যুগে অষ্টাদশ শতকে তৎকালে ইংরেজের অধীন আমেরিকার স্বাধীনতালাভের ইতিহাস থেকে শ্রীঅরবিন্দ এই শিক্ষা লাভ করেছিলেন যে পরাধীন দেশের স্বাধীনতালাভের উপায় হলো সশস্ত্র অভিযান। আমরা দেখব দেশে এসে তিনি তাঁর এই শিক্ষা কাজে লাগিয়েছিলেন।

সেই যুগে democracy বা গণতন্ত্র ছিল ইউরোপের অপর একটি জনপ্রিয় আদর্শ। ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে গণতন্ত্রের প্রসার হলেও সেকালের রাশিয়ায় গণতন্ত্রের অভাব ছিল—রাশিয়ার সম্রাট জার ছিলেন একজন স্বেচ্ছাচারী-রাজা; এবং সে দেশের শাসন-ব্যবস্থায় প্রজাদের কোন হাত ছিল না। গণতন্ত্রীরা শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধী ও শাসন-সংস্কারের পক্ষপাতী। রাশিয়ার শাসন-সংস্কার নিয়ে গণতন্ত্রের পক্ষপাতীদের সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী গভর্নমেন্টের বিরোধ ঘটে। গভর্নমেন্টের অত্যাচারে রাশিয়ায় প্রকাশ্য আন্দোলন অসম্ভব হওয়ায় দেশে গুপ্তসমিতি দেখা দেয়; এবং গুপ্তসমিতির সভ্যগণ বোমা ও পিস্তলের সাহায্যে সংস্কারবিরোধী ও অত্যাচারী বহু রাজ-কর্মচারীকে হত্যা করে। নিঃসন্দেহে ইউরোপের এসব ঘটনা যুবক শ্রীঅরবিন্দের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভারতে আসার পরও ঐ প্রভাব বিদ্যমান ছিল; পরে অবশ্য তিনি তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন।

স্বদেশের সেবা করবার ও ভারতের স্বাধীনতার পথ মুক্ত করবার আকাঙ্ক্ষা বিলাতে থাকা কালেই তাঁর চিত্ত অধিকার করেছিল, একথা শ্রীঅরবিন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন। তাঁর স্ত্রীকে লেখা পত্রের একস্থানে তিনি লিখেছিলেন: "এই আকাঙ্ক্ষা, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম। এই ভাব আমার মজ্জাগত।······চৌদ্দ বৎসর বয়সে জীবনে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল; আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।" চৌদ্দ বছর বয়সে শ্রীঅরবিন্দ লণ্ডনের সেণ্টপলসের ছাত্র; আর যখন তাঁর বয়স আঠার বছর তখন তিনি সবে

কেম্ব্রিজের King's College-এ যোগ দিয়েছেন। তের চোদ্দ বছর বয়স একটা বয়ঃসন্ধির কাল। এই সময়ে অনেক কিশোরের মনে পরিবর্তন ঘটে, ধর্মভাব জাগে, আত্মত্যাগের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন তের চোদ্দ বছর বয়সে তাঁর মনেও ঐরূপ পরিবর্তন ঘটে—নিঃস্বার্থ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জাগে; জীবনে একটা কিছু বড় কাজ করতে হবে, এ আকাঙ্ক্ষা নাকি তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন।

ভারতের স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ

গুপ্তসমিতির কথা তিনি কেবল যে ইতালী ও রাশিয়ার ইতিহাসে পড়েছিলেন তা নয়। শ্রীঅরবিন্দের বিলাত ত্যাগের অল্প আগে, যখন তাঁর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ হয়, এবং তিনি কয়েকমাস লণ্ডনে থাকেন, তখন কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র লণ্ডনে এক গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর ভাইয়েরা এই সমিতির সভ্য হয়েছিলেন। সমিতির নামটি ছিল অদ্ভুত—"The Lotus and Dagger Society।" সমিতির সভ্যদের সংকল্প গ্রহণ করতে হতো যে ভারতের স্বাধীনতাকে তারা তাদের জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করবেন এবং এ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রত্যেকে কোন একটি কাজের ভার গ্রহণ করবেন। এই অদ্ভুত-নামা সমিতির একটি বই দুটি অধিবেশন হয় নি; অর্থাৎ তার জন্ম ও মৃত্যু একই দিনে ঘটেছিল। তারা যে ব্রত গ্রহণ করেছেন একথা ভুলতে সমিতির অপর সভ্যগণের বেশী সময় লাগে নি; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে এ কথা সত্য নয়। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুললেন না। আমরা দেখবো ভারতে আসার পরেই তিনি দেশের সম্মুখে এক নতুন রাজনৈতিক আদর্শ স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন; এবং দেশে আসার কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ভারতের স্বাধীনতালাভের জন্য গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

স্বাধীনতার কামনা আর পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ একই জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ। সেযুগের ইউরোপের আবহাওয়া থেকেই শ্রীঅরবিন্দ পেয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন; আর তাঁর পিতার কাছে তিনি পেয়েছিলেন ভারতের অধীনতার জন্য তীব্র গ্লানিবোধ। শ্রীঅরবিন্দের পিতা আচার-ব্যবহারে যতই সাহেবী-ভাবাপন্ন হোন না কেন, দেশের জন্য তাঁর দরদ-বোধের অভাব ছিল না। ভারতীয়দের প্রতি সেকালের বহু ইংরেজ রাজ-কর্মচারীর অপমানকর ব্যবহারে তিনি মর্মাহত হতেন। তিনি পুত্রদের নিকট

সেকালের প্রসিদ্ধ ইংরেজী সংবাদপত্র Bengalee পাঠাতেন। অনেক সময় ঐ সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অপমানকর ব্যবহারের দৃষ্টান্তগুলির প্রতি পুত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লাল পেন্সিল দিয়ে সেই দৃষ্টান্তগুলি চিহ্নিত করতেন। তাই অল্প বয়সেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেশবাসীদের প্রতি এই অবমাননার জন্য অন্তরে গভীর পীড়া অনুভব করতেন। অল্পবয়সেই পরাধীনতার হীনতা ও স্বাধীনতার মূল্য তিনি মর্মে মর্মে বুঝতে পারলেন। বস্তুত ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করবার সংকল্প নিয়েই তিনি দেশে ফেরেন।

বিলাতী শিক্ষার অপর একটি প্রভাবের কথাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ ইউরোপে বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতির যুগ; এবং বিজ্ঞানের প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অসাধারণ শ্রদ্ধা সেযুগের বৈশিষ্ট্য। শ্রীঅরবিন্দের বিলাতগমনের প্রায় বিশ বছর আগে ১৮৫৯ সনে জগৎ-প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক চার্লস ডারউইন তাঁর 'Origin of Species' নামক বিখ্যাত পুস্তকখানা প্রকাশ করেন; এবং ঐ পুস্তক প্রকাশের পর ইউরোপের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তাধারায় এক বিপর্যয় ঘটে। এতকাল খ্রীষ্টান ইউরোপ বাইবেলে পড়েছে যে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হয়ে মাত্র ছয়দিনে ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য সমাধা করেন, এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম করেন। অর্থাৎ বাইবেলের মতে আমাদের পৃথিবীর বয়স মাত্র পাঁচ ছয় হাজার বছর মাত্র। ডারউইনের পূর্বেই ফসিল বা ভূস্তর মধ্যে প্রাপ্ত প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ দেখে কোন কোন বৈজ্ঞানিকের সন্দেহ হয়েছিল পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর। কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকেই আজকের গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশু, মানব যে বর্তমান আকারেই বিদ্যমান সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাস বাইবেলের Deluge বা জলপ্লাবনের বিবরণ দ্বারাও সমর্থিত হতো। এতকাল পর্যন্ত সে বিশ্বাস অটুটই ছিল। ভগবান মানুষকে প্রাণীজগতের প্রভুরূপে সৃষ্টি করেছেন, এ বিশ্বাস মানুষকে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ দিত। কিন্তু ডারউইন অকাট্য প্রমাণ দিয়ে বাইবেলের মত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করলেন। বিজ্ঞান দেখাল পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণ দেখা দেয় তা ছিল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, চর্মচক্ষুর অগোচর কিন্তু অনুবীক্ষণের গোচর এক প্রাণখণ্ড; এবং আজকের পৃথিবীর সকল উদ্ভিদ ও সকল জলচর, স্থলচর, উভচর ও খেচর প্রাণীই ঐ আদি প্রাণখণ্ড থেকেই এসেছে। যে নিয়মে লক্ষ লক্ষ

বছরে ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন ঘটেছে ডারউইন তারও একটা ব্যাখ্যা দেন। এই হলো বিখ্যাত Evolution বা ক্রমবিকাশবাদের মূল কথা।

ডারউইনের 'Origin of Species' পুস্তক প্রকাশের পর বাইবেলের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে বহু চিন্তাশীল ব্যক্তির বিশ্বাস শিথিল হলো। জগতের স্রষ্টা কোন ঈশ্বর নেই ; আছে কেবল ইন্দ্রিয়-গোচর এই জগৎ ও তার সুশৃঙ্খল নিয়ম—এই হলো তাঁদের বিশ্বাস। বাইবেলের সৃষ্টি-বিবরণ যখন নিঃসন্দেহে ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ, তখন বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিও অভ্রান্ত সত্য বলে গ্রহণযোগ্য নয় ; সুতরাং বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করে নিজ নিজ বিচার-বুদ্ধির উপর আস্থা রাখাই শ্রেয়। ঈশ্বর, আত্মার অস্তিত্ব ও পরকাল নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে জগতের কল্যাণ করা, উন্নততর সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তনের চেষ্টা করাই মানুষের কর্তব্য ও ধর্ম। একে বলে নাস্তিকতা বা জড়বাদ ; এবং সেকালের ইউরোপে এই জড়বাদেরই প্রভাব ছিল। মার্জিতবুদ্ধি শ্রীঅরবিন্দ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কলকাতার অদূরে উত্তরপাড়ায় যে বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে তিনি বলেছিলেন, এক সময় তিনিও নাস্তিক ছিলেন, এবং বুদ্ধিজীবী ছিলেন—অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধির অগম্য কোন বিষয়ে বিশ্বাস করতেন না। কী ভাবে নাস্তিক যুক্তিবাদী ও সংশয়াত্মা অরবিন্দ ঈশ্বরভক্ত যোগী ও Mystic শ্রীঅরবিন্দ হয়ে ওঠেন, এবং ইউরোপের বিজ্ঞান ও ভারতের ব্রহ্মবাদের অপূর্ব সমন্বয় করেন, তা আমরা ক্রমশ দেখবো।

স্বজন সঙ্গে

এইরূপে ৭ বছর বয়স থেকে ২১ বছর বয়স পর্যন্ত ১৪ বছর প্রবাসে কাটিয়ে শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফেরেন। প্রথমে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশে ফেরেন। পরে বরোদার চাকরি গ্রহণ করে শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফেরেন. দাদা বিনয়ভূষণ শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যেদিন দেওঘরে মাতামহ রাজনারায়ণ বসু মশায়ের বাড়ীতে যান, সেদিনের আনন্দময় পরিবেশের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ বসু মশাই তখন জীবিত। তাঁর বৃহৎ পরিবার। বহুদিনের প্রতীক্ষিত সেই শুভক্ষণ আগত। শ্রীঅরবিন্দের মাতামহী মাসীরা ও ভাইবোনেরা তাঁকে ঘিরে বসেছেন। তখনও তিনি বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলতে পারেন না। তবু শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন তাঁর আত্মীয়-আত্মীয়াদের তাঁর খুব ভাল লাগে। প্রথমে তাঁর বিকৃতমস্তিষ্ক মাতা স্বর্ণলতাদেবী নাকি তাঁকে চিনতে পারলেন না।

ছেলেবেলায় শ্রীঅরবিন্দের দেহে একটা (আঘাতের) চিহ্ন ছিল, তা স্বর্ণলতাদেবীর মনে পড়লো ; এবং সেই চিহ্ন দেখবার পর তিনি পুত্রকে চিনতে পারলেন। শ্রীঅরবিন্দের মাসতুতো ভাই-বোন অনেক ছিলেন ; তাঁদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যে বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল একথা তাঁদের কেউ কেউ লিখেছেন। শ্রীঅরবিন্দ মাতাকে নিয়মিত এবং বোনেদের প্রয়োজন মত সাহায্য করতেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মধুর স্বভাবের গুণে আত্মীয়দের বিশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন। যখন তিনি রাজরোষের লক্ষ্য, তখনও আত্মীয়-গৃহে তিনি সমাদরে স্থান পেয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় আত্মীয়দের নিকট তিনি কত প্রিয় ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তিগত জীবন

ভারতের ইতিহাসে ১৮৯৩ সনের গুরুত্ব

১৮৯৩ সনে শ্রীঅরবিন্দ বরোদার রাজসরকারের কাজে যোগ দেন। এই ১৮৯৩ সনটি নানা কারণে ভারতের ইতিহাসের একটি বিশেষ সন। ঐ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম হয়ে শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফেরেন। ঐ সনের ৩১রা মে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বাণী প্রচার করবার জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন, এবং ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগোর ধর্মমহাসমিতিতে (Parliament of Religions) হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা দেন। পাশ্চাত্য জগৎ একেবারে মুগ্ধ হয়। আর ১৮৯৩ সনেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেখানে কয়েক বছর পরে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ভারতীয় ও অশ্বেতকায় লোকদের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেণ্টের অত্যাচারের বিরোধিতা করে গান্ধীজী জয়ী হন। সেই বিরোধিতায় তাঁর অস্ত্র ছিল সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ। শ্রীঅরবিন্দ তখন কলকাতায় "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার কর্ণধার; এবং তিনি বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেণ্টের সঙ্গে গান্ধীজীর বিরোধের বিবরণ প্রকাশ করেন। বিনা অস্ত্রে ও অহিংসভাবে অত্যাচারী গভর্নমেণ্টের কীভাবে বিরোধিতা করতে হয় তা দেখিয়ে গান্ধীজী ঐ সময়ে সর্ব জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বোম্বাইয়ে শ্রীঅরবিন্দের একটি বিচিত্র অনুভূতি

যেদিন শ্রীঅরবিন্দ বোম্বাই বন্দরে পৌছান সেদিন তাঁর একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়—অকস্মাৎ তাঁর মন এক গভীর শান্তিতে পূর্ণ হয়, এবং কয়েক মাস পর্যন্ত তাঁর মনের এই প্রশান্ত ভাব বিদ্যমান থাকে। আমরা দেখবো শ্রীঅরবিন্দের জীবনে কয়েকবারই এরূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এবং তাঁর জীবনে এইসব অনুভূতি যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা-ও আমরা দেখবো। বোম্বাইয়ের ঐ অনুভূতি তাঁর প্রথম ঐ জাতীয় অনুভূতি। এই অনুভূতি

আকস্মিক হলেও তা মোটেই বিশেষ কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার মতন জিনিস ছিল না; নতুবা এ অনুভূতি তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকতো না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কেবল শ্রীঅরবিন্দের জীবনেই এরূপ অভিজ্ঞতা হয় নি; দেশ-বিদেশের অনেক প্রসিদ্ধ লোকই তাঁদের জীবনে অনুরূপ অনুভূতির কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে নিজ জীবনের এরূপ একটি আকস্মিক অনুভূতির বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথম যৌবনে সতের বছর বয়সে কলকাতার ফ্রীস্কুল স্ট্রীটের একটি বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন একদিন সকালবেলা অকস্মাৎ তাঁর চোখের পর্দা যেন খুলে গেল এবং বিশ্বসংসার সর্বত্র তাঁর নিকট আনন্দ ও সৌন্দর্যে পূর্ণ মনে হলো। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কয়েকদিন পর্যন্ত তাঁর এই মনোভাব স্থায়ী হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দও লিখেছেন, কাশ্মীর ভ্রমণকালে তাঁর অন্তরে এরূপ এক বিচিত্র অনুভূতি জন্মেছিল। বিদেশের কোন কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও তাঁদের জীবনে অনুরূপ আকস্মিক অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন। ইংল্যাণ্ডে যিনি The Seer of Chelsey অর্থাৎ চেল্‌সির ঋষি নামে খ্যাত সেই Thomas Carlyle তাঁর জীবনের এরূপ এক আকস্মিক ও সুগভীর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। একদিন ভ্রমণকালে এক পাহাড়ের উপর তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। নিম্নের উপত্যকার অদৃশ্য এক গৃহ থেকে ধূম উঠতে দেখে অকস্মাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর সকল সন্দেহের অবসান চিরদিনের জন্য ঘটে গেল। জগতের এক স্রষ্টা আছেন এই প্রতীতি তাঁর এত দৃঢ় হলো যে তাঁর পরবর্তী জীবন এই প্রতীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়ে পারে নি। শ্রীঅরবিন্দের মতে জীবনের এই অনুভূতিগুলিই তাঁর যোগ ও দর্শনের ভিত্তি; এবং তাঁর জীবনের বিচিত্র অনুভূতিগুলি ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়েই তাঁর দর্শনের উৎপত্তি; একথা শ্রীঅরবিন্দের নিজেরই কথা।

বরোদার কর্মক্ষেত্র

১৮৯৩ সন থেকে ১৯০৬ সন এই তের বছর কাল শ্রীঅরবিন্দ বরোদার রাজসরকারের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমে মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে বরোদার সেটলমেণ্ট ও রাজস্ব বিভাগে তিনি কাজ করেন। রাজস্ববিভাগ থেকে পরে অন্য দু-একটি বিভাগেও তিনি কাজ করেন। গায়কোবাড় শ্রীঅরবিন্দের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। অনেক সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী চিঠিপত্রের মুসাবিদার ভার তাঁর উপর অর্পিত হতো।

একবার গায়কোবাড়ের কাশ্মীর ভ্রমণকালে শ্রীঅরবিন্দ অল্প কিছুকাল তাঁর সেক্রেটারী রূপে কাজ করেন। দক্ষতার সঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ সে কাজ করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন লাজুক প্রকৃতির লোক। লোকমান্য হবার জন্য কিংবা নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতির আশায় গায়কোবাড়ের সান্নিধ্যলাভের জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না। প্রয়োজন না হলে তিনি দরবারে হাজিরও হতেন না। কখনো কখনো মহারাজকে প্রকাশ্যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দিতে হলে মহারাজা শ্রীঅরবিন্দকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করতেন এবং শ্রীঅরবিন্দ বক্তৃতাটি লিখে দিতেন। শিক্ষাবিভাগের কাজই যে শ্রীঅরবিন্দের রুচির ও প্রকৃতির অনুকূল তা বুঝতে বুদ্ধিমান গায়কোবাড়ের বিলম্ব হলো না। শেষে শ্রীঅরবিন্দের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁকে শিক্ষাবিভাগেই স্থায়িভাবে নিযুক্ত করা হয়। শিক্ষাবিভাগে যোগ দেবার পূর্বে প্রথমে তিনি বরোদা কলেজে ফরাসী ভাষার অধ্যাপনা করেন; পরে শিক্ষাবিভাগে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হবার পর ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনার ভার তাঁর উপর অর্পিত হয়। ক্রমে কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। তাঁর অধ্যাপনার কুশলতার জন্য এবং তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বের জন্য তিনি যে তাঁর ছাত্রদের শ্রদ্ধা বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা তাঁর কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের লেখা থেকে জানা যায়।

সংস্কৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়

পূর্বেই বলা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের জীবনে পূর্ব ও পশ্চিমের জ্ঞানধারার অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল। কিন্তু বিলাত থেকে তিনি কেবল পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম হয়ে আসেন; তখন পর্যন্ত প্রাচ্য জ্ঞানধারার সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন পরিচয় ছিল না—সংস্কৃত বা ভারতীয় কোন ভাষাই তিনি জানতেন না। বরোদায় এসে তাঁর জ্ঞানের এই ত্রুটি তিনি দূর করেন। এখানে তিনি সংস্কৃত ভাষা শেখেন। ইংরেজী, লাতিন, গ্রীক, জার্মান প্রভৃতি বিভিন্ন "আর্য" ভাষা তিনি খুব ভাল করে জানতেন বলে সংস্কৃত শেখা তাঁর পক্ষে নিজের চেষ্টায়ই, কোন পণ্ডিতের সাহায্য ব্যতিরেকেই, সম্ভব হয়েছিল। ভাষা শিখবার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ ছিল। কেবল সংস্কৃত ভাষাই যে তিনি ভাল করে শিখেছিলেন তা নয়; সংস্কৃত সাহিত্যের ও শাস্ত্রের সকল শাখায়ই তিনি গভীরভাবে প্রবেশ করেছিলেন। কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের তিনি ইংরেজী অনুবাদ

করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দকৃত গীতা, উপনিষৎ, ও বেদের ব্যাখ্যা তাঁর গভীর সংস্কৃত জ্ঞান এবং হিন্দু অধ্যাত্মশাস্ত্রসমূহের সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয়ের প্রমাণ। স্মরণ রাখতে হবে বরোদায় থাকা কালে তিনি বেদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না; পণ্ডিচেরী থাকা কালে তিনি মূল বেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদ প্রভৃতি বেদের সংহিতাভাগ পড়েন। তাঁর 'The Life Divine' গ্রন্থে বেদের সংহিতাভাগ থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি আমাদের শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা প্রচলিত ব্যাখ্যা থেকে ভিন্ন। কিন্তু একথাই বোধ হয় ঠিক যে সাধক শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনলব্ধ জ্ঞানের আলোতে গীতা উপনিষদাদির যে ব্যাখ্যা করেছেন তা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। আধুনিক কালের পাশ্চাত্য জ্ঞানধারার সঙ্গে পরিচিত শিক্ষিত লোকদের পক্ষে শ্রীঅরবিন্দের ঐসব ব্যাখ্যাই বিশেষ উপযোগী, লেখকের ইহাই স্থির বিশ্বাস।

বাংলা ভাষা শিক্ষা

বরোদায় থাকা কালেই শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃতপক্ষে বাংলা শেখেন। আমরা দেখেছি বিলাত যাবার পূর্বে পিতৃগৃহে তাঁর বাংলা শেখার সুযোগ ছিল না। বিলাতবাসের শেষের দিকে তাঁর বাংলা শেখার একটু সুযোগ অল্প কিছুকালের জন্য হয়েছিল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষানবিসদের ভারতের কোন একটি প্রাদেশিক ভাষা শিখতে হতো। স্থায়িভাবে সিভিল সার্ভিসে গৃহীত হবার পরে ভারতের যে প্রদেশে তারা কর্মে নিযুক্ত হতেন সে প্রদেশের ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা বিলাতেই সুরু হতো। শ্রীঅরবিন্দের পিতৃবন্ধু Sir Henry Cotton-এর চেষ্টায় স্থির হয়েছিল বঙ্গদেশেই হবে শ্রীঅরবিন্দের ভাবী কর্মক্ষেত্র। তদনুসারে Mr. Towers নামক ভারতের একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ জজ সাহেব শ্রীঅরবিন্দকে বাংলায় পাঠ দিতে আরম্ভ করেন। সাহেবের বাংলা জ্ঞানের পরিচয় নিম্নের ঘটনাটি থেকেই পাওয়া যায়। একদিন শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের একখানা বইয়ের অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন। সাহেবের বাংলাজ্ঞান 'বোধোদয়' জাতীয় কয়েকটি সংস্কৃত-ঘেঁষা পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাটা কিছুক্ষণ পড়ে সাহেব নাকি বলেন: "ইহা তো বাংলা নয়।" শ্রীঅরবিন্দ শেষ পর্যন্ত সিভিল সার্ভিসে গৃহীত হলেন না; বাংলাশিক্ষাও অল্পকাল পরেই বন্ধ হয়। তাই বিলাতে শ্রীঅরবিন্দ বাংলা বিশেষ কিছু শেখেন নি। তাঁর ভগ্নী সরোজিনী

দেবী বলেছেন বটে যে বিলাতে নাকি শ্রীঅরবিন্দকে বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তক কিছু পড়তে হয়েছিল। ১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারীতে শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফেরেন; ১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সনের ১৬ই জুলাই। মনে হয় দেশে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন।

বরোদায় এসে তিনি নিজে নিজেই বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। বাংলা পুস্তকের অর্থ বুঝতে পারলেও বাংলা কথা বলতে তিনি অক্ষম ছিলেন। পরে ১৮৯৮ সনে, অর্থাৎ দেশে ফেরার কয়েক বছর পরে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত সুলেখক দীনেন্দ্রকুমার রায় মশাইকে শ্রীঅরবিন্দের মাতুল তাঁর নিকট প্রেরণ করেন; এবং তিনি দুবছর বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বাস করেন। দীনেন্দ্রবাবু বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ বুঝতেন, কিন্তু ঐসব গ্রন্থের চল্‌তি কথা বুঝতে পারতেন না। তাঁর কাজ ছিল শ্রীঅরবিন্দের বাংলা কথ্য ভাষার জ্ঞান-বৃদ্ধি করা এবং বাংলা কথা বলতে তাঁকে সাহায্য করা। শ্রীঅরবিন্দ দীনেন্দ্রবাবুর নিকট নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করতেন না। তাঁর যেটুকু বাংলা-জ্ঞান ছিল তা স্বচেষ্টারই ফল বলতে হবে। তিনি আগ্রহের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন ও বিবেকানন্দের লেখা পড়তেন। তবে কোনদিনই তিনি ভাল বাংলা বলতে শেখেন নি, বাংলায় বক্তৃতা দিতেও পারতেন না। বাঙালী শ্রোতাদের নিকট ইংরেজীতে বলতে হতো বলে তাঁর মনে যথেষ্ট কুণ্ঠা ছিল; এবং নিতান্ত বাধ্য না হলে সভাসমিতিতে সাধারণত তিনি কিছু বলতেন না। বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর 'কারাকাহিনী' পুস্তকখানা এবং জেল থেকে মুক্ত হবার পর তাঁর দ্বারা প্রকাশিত "ধর্ম" নামক বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা প্রবন্ধগুলি তাঁর বাংলা জ্ঞানের প্রমাণ। তবে একথা ঠিক তাঁর বাংলা পুস্তক ও লেখা ভাষার দিক থেকে তাঁর ইংরেজী লেখার মতন উচ্চ শ্রেণীর নয়; তাঁর বাংলা সংস্কৃত-ঘেঁষা। পণ্ডিচেরী যাবার পর তিনি আর বাংলা ভাষার চর্চা করতেন না। পত্রাদি লেখা ও কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা বাংলা ভাষার মাধ্যমে না হয়ে ইংরেজীতে হতো। বস্তুত ইংরেজীই ছিল যেন তাঁর মাতৃভাষা।

কেবল সংস্কৃত আর বাংলা নয়, আরো দুটি ভারতীয় ভাষা তিনি বরোদায় শিখেছিলেন। বরোদা রাজ্যের প্রজাসাধারণের ভাষা গুজরাটী; কিন্তু রাজবংশের ও রাষ্ট্রের ভাষা ছিল মারাঠী। রাজকার্যের প্রয়োজনেই শ্রীঅরবিন্দকে

ঐ দুটি ভাষা মোটামুটি শিখতে হয়েছিল। হিন্দী শেখবার জন্য তাঁকে সময় দিতে হয় নি ; তবে হিন্দী পুস্তক ও পত্রিকা পড়ে বুঝতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হতো না। তাঁর জানা ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে তাঁর সংস্কৃতের জ্ঞানই ছিল সুগভীর ; আর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যিকের লেখার তিনি প্রকৃত মর্মগ্রাহী ছিলেন

জ্ঞান-তপস্বী শ্রীঅরবিন্দ

দীনেন্দ্রকুমার রায় মশাই তাঁর লেখা "অরবিন্দ প্রসঙ্গে" নামক পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের বরোদা-জীবনের বিবরণ দিয়েছেন। ঐ পুস্তক থেকে আমরা শ্রীঅরবিন্দের জ্ঞান-তপস্যার সুন্দর চিত্র পাই। দীনেন্দ্রবাবু শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন : "তাঁহাকে পুস্তকের উপর বদ্ধ-দৃষ্টি অবস্থায় একই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া উপবিষ্ট দেখিতাম যোগমগ্ন তপস্বীর ন্যায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঘরে আগুন লাগিলেও বোধহয় তাঁর হুশ হইত না। তিনি এইভাবে প্রতিদিন রাত্রি জাগরণ করিয়া ইউরোপের নানা ভাষার কত কাব্য উপন্যাস ইতিহাস ও দর্শন পড়তেন তাহার সংখ্যা ছিল না। অরবিন্দের পাঠাগারে ইউরোপের নানা ভাষার গ্রন্থ স্তূপীকৃত ছিল। ফরাসী, জার্মান, রাশিয়ান, ইংরেজী, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি কত ভাষার কত রকমের পুস্তক ছিল তাহা আমার জানা ছিল না।" উপরের বর্ণনা থেকে আমরা শ্রীঅরবিন্দের কেবল বিদেশীয় সাহিত্যের চর্চার কথাই পেলাম। স্মরণ রাখতে হবে বরোদায় থাকা কালেই শ্রীঅরবিন্দ সংস্কৃত ভাষা ও ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রভৃতি আয়ত্ত করেন। সেই সঙ্গে রাত্রি জেগে ইউরোপীয় সাহিত্য ইতিহাসাদিও যে তিনি অতি নিবিষ্টচিত্তে পড়তেন তার কথাও শোনা গেল। মোটকথা পূর্ব ও পশ্চিম জ্ঞানের এই দুই ক্ষেত্রেই তিনি সমভাবে বিচরণ করতেন। ভারতে এসে একদিকে ভারতীয় ভাষা ও শাস্ত্রাদির তিনি যেমন চর্চা করতেন, অপরদিকে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে, তার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর মাহিয়ানার একটা বড় অংশ ব্যয় হতো নতুন নতুন পুস্তক ক্রয় করতে। পুস্তক বিক্রেতাদের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ ছিল নতুন ভাল কোন পুস্তক প্রকাশিত হওয়া মাত্রই যেন তাঁকে জানানো হয়।

সাহিত্য-সৃষ্টি

জ্ঞান-তপস্যার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টিও চলতো। পূর্বেই বলা হয়েছে বিলাতে থাকা কালেই শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজীতে কবিতা রচনা করতেন। বরোদায় এবং পরে

স্বদেশীযুগে কলকাতায়ও তিনি কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ সাবিত্রীর রচনা সম্ভবত সুরু হয় বরোদায়; এবং মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পূর্বে তিনি সাবিত্রী কাব্যের রচনা ও সংশোধন শেষ করেছিলেন। বস্তুত সারাজীবন ধরে কাজের অবসরে তিনি কাব্য রচনা করতেন। বরোদায় তিনি তাঁর প্রথম কবিতা পুস্তক 'Songs to Myrtella' প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকের অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছিল বিলাতে; বাকী কয়টি বরোদায় রচিত। পুস্তকখানা ছাপা হয়েছিল বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণের জন্য, বাজারে বিক্রয়ের জন্য নয়। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কতকগুলি ইংরেজী কবিতা রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমার রায় মশাই যা লিখেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন: গায়কোবাড়ের নিমন্ত্রণে সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত মশাই একবার বরোদায় যান—পরে অবশ্য দত্তমশাই তিন বছর কাল বরোদার মন্ত্রীরূপে কাজ করেন। দত্তমশাই ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষায়ই সুলেখক ছিলেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের কোন কোন অংশ ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করেছিলেন; এবং সেজন্য বিলাতে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতিও হয়েছিল। বরোদায় তিনি শুনলেন শ্রীঅরবিন্দ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের কবিতাগুলি চেয়ে নিয়ে পড়লেন। দীনেন্দ্রবাবু লিখেছেন যে দত্তমশাই শ্রীঅরবিন্দের কবিতাগুলি পড়ে শ্রীঅরবিন্দকে বলেন, "তোমার এই-সব কবিতা দেখিয়া রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে আমি কেন পণ্ডশ্রম করিয়াছি ভাবিয়া দুঃখ হইতেছে। তোমার কবিতাগুলি আগে দেখিলে আমি আমার লেখা কখনও ছাপাইতাম না। এখন মনে হইতেছে আমি ছেলে-খেলা করিয়াছি।" উচ্চ প্রশংসা সন্দেহ নেই। দীনেন্দ্রবাবু লিখেছেন যে এই উচ্চ প্রশংসা শ্রীঅরবিন্দ অতি সহজ ভাবে গ্রহণ করলেন, তাঁকে বিন্দুমাত্র উৎফুল্ল দেখা গেল না। বস্তুত গীতার আদর্শ, সুখে উৎফুল্ল আর দুঃখে উদ্বিগ্ন না-হওয়া, শ্রীঅরবিন্দের জীবনে মূর্ত হয়েছিল। সুখে দুঃখে সমচিত্ততাকে গীতায় যোগ বলা হয়েছে। যোগী শ্রীঅরবিন্দ জীবনের সকল অবস্থাতেই শান্ত ও অবিচলিত থাকতেন। এর আরো অনেক প্রমাণ আমরা পাবো।

শ্রীঅরবিন্দের সরল জীবন-যাত্রা

দীনেন্দ্রবাবুর পুস্তকে আমরা শ্রীঅরবিন্দের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর যে বিবরণ পাই তা অতি সরল ও অনাড়ম্বর। শ্রীঅরবিন্দ জ্ঞান-তপস্বী ছিলেন; জীবনও

তাঁর অনাড়ম্বর তপস্বীর জীবন ছিল। বিলাত থেকে ভারতে এসে শ্রীঅরবিন্দ অশনে বসনে ও চালচলনে সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়েছিলেন। বরোদায় যাবার আগে দীনেন্দ্রবাবু ভেবেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের জীবন অন্য পাঁচজন বিলাত-ফেরত উচ্চপদস্থ ব্যক্তির জীবনের মতই হবে। কিন্তু বরোদায় এসে তিনি যা দেখলেন তা-তে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি লিখেছেন, যার হিমালয় সম্বন্ধে সত্য ধারণা আছে তাকে যদি একটা ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিয়ে বলা হয় 'এই হিমালয়' তবে তার মনে যেরূপ বিস্ময়ের সঞ্চার হয়, শ্রীঅরবিন্দকে দেখে দীনেন্দ্রবাবুর মনেও তেমনি বিস্ময় জন্মেছিল। তিনি দেখলেন শ্রীঅরবিন্দের গায়ে একটা সাধারণ মেরজাই—পশ্চিম ভারতের গরীব লোকদের গায়ে যেমন সচরাচর দেখা যায়। শ্রীঅরবিন্দের পায়ে অল্পদামের নাগরা জুতা। শয়ন তাঁর একটা সাধারণ লোহার খাটের উপর। শীতকালে রাত্রে অল্পদামের একখানা কম্বল তাঁর শীত নিবারণ করে; একখানা অতি সাধারণ "গরম কাপড়" ছিল তাঁর শীতবস্ত্র। খাওয়া সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন চিরদিন উদাসীন, যা পেতেন তা-ই খেতেন। রান্না ভাল না হলেও কোনদিন অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। খাওয়া সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত ছিল এই যে, শরীর সুস্থ রাখার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যেরই প্রয়োজন, রুচিকর খাদ্য অত্যাবশ্যক নয়। স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ অনাবশ্যক কৃচ্ছ্রসাধনার পক্ষপাতী ছিলেন না। সৌন্দর্য-চর্চার, আর্টের মূল্য তাঁর কাছে যথেষ্ট ছিল। তাঁর পণ্ডিচেরী আশ্রম ফুলে ফলে সুশোভিত। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের বেতন ভালই ছিল, এবং অর্থের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। তবে তিনি কেন জীবনযাত্রার মান এত নীচু রেখেছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় তাঁর স্ত্রীর নিকট লেখা একখানা পত্রে। স্মরণ রাখতে হবে বরোদা থাকাকালে ১৯০১ সনে শ্রীঅরবিন্দ বিবাহ করেন। ১৯০৫ সনের ৩০শে আগস্ট তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে দীর্ঘ পত্রখানা লিখেছিলেন তা-তে আছে: "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা ও যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন সবই ভগবানের; যাহা পরিবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার; যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরত দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর।......ভগবানকে ফেরত দেওয়ার অর্থ ধর্মকার্যে ব্যয় করা। পরোপকার ধর্ম, আশ্রিতকে রক্ষা করা

মহাধর্ম।······কিন্তু শুধু আশ্রিত ভাইবোনকে দিলে হিসাবটা চোকে না। এই দুর্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত; আমার ত্রিশকোটি ভাইবোন এই দেশে আছে; তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে; তাহাদের হিত করিতে হয়। কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্মিনী হইবে? কেবল সামান্য লোকের মত খাইয়া পরিয়া, যাহা সত্যি সত্যি দরকার তাহাই কিনিয়া, আর সব ভগবানকে দিব, এই আমার ইচ্ছা। তুমি মত দিলেই, ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলেই আমার অভিসন্ধি পূর্ণ হইতে পারে।" দেশের অধিকাংশ লোকই দীনদরিদ্র, অন্নবস্ত্রের অভাবে পীড়িত; সেই কথা স্মরণ করে গান্ধীজী কটিবস্ত্র ধারণ করেছিলেন; প্রায় অনুরূপ কারণেই কী শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বরোদার জীবনযাত্রার মান এত নীচু রাখেন নি, বিলাসিতা সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি?

শ্রীঅরবিন্দের বিবাহ

পূর্বেই বলা হয়েছে বরোদায় থাকাকালে ১৯০১ সনে শ্রীঅরবিন্দ বিবাহ করেন। শ্রীঅরবিন্দের পত্নী মৃণালিনী দেবী ছিলেন ভূপালচন্দ্র বসু নামক এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর কন্যা। ভূপালচন্দ্র বসু মশায়ের পৈতৃক বাসস্থান ছিল যশোর জেলায়। পরে তিনি রাঁচিতে স্থায়িভাবে বাস করেন। শ্রীঅরবিন্দের বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর শ্যালক, রাঁচির ডাক্তার শিশিরকুমার বসু মশাই বলেছেন যে পাত্রীর সন্ধানে শ্রীঅরবিন্দ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। কলকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু মশাই ছিলেন ভূপালবাবুর বন্ধু। গিরিশবাবুর গৃহে শ্রীঅরবিন্দ কনেকে দেখে পছন্দ করেন; এবং গিরিশবাবুর মধ্যস্থতায় শ্রীঅরবিন্দের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। বিবাহের সময় শ্রীঅরবিন্দের বয়স ছিল উনত্রিশ আর মৃণালিনী দেবীর বয়স চোদ্দ। বিবাহ হয়েছিল হিন্দুমতে। শ্রীঅরবিন্দের পিতা ও মাতামহ ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লোক; আর মৃণালিনী দেবী ছিলেন বিলাত-ফেরত পিতার কন্যা। তাই বিবাহের পূর্বে বর ও কন্যা উভয়কেই হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল—একথা বলেছেন ডাঃ শিশির কুমার বসু। তবে প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল নামমাত্র। প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ মাথা-মুড়ানো। শ্রীঅরবিন্দ তা করতে রাজী হলেন না। শেষে পুরোহিত "কাঞ্চন-মূল্য" অর্থাৎ কিছু অর্থদানকে প্রায়শ্চিত্তের মাথা-মুড়ানোর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বিধান দেন।

ব্রাহ্মসমাজের বয়স্থা শিক্ষিতা কন্যার পরিবর্তে হিন্দুসমাজের অল্পবয়স্কা একটি স্কুলের ছাত্রীকে কেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে দেখে পছন্দ করে বিবাহ করেন—এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। এতে প্রমাণ হয় এই সময় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ অপেক্ষা হিন্দুসমাজের আদর্শে শ্রীঅরবিন্দের অনুরাগ অধিক ছিল। শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েকবছর আগে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "ভারতের ভবিষ্যৎ কংগ্রেস বা ব্রাহ্মসমাজের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত যুবকদের উপর।" মোটকথা বরোদায় থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ মনেপ্রাণে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং অনেক হিন্দু আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। বরোদায় থাকাকালে তিনি দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বগলার একটি স্বর্ণমূর্তি তাঁর গৃহে নাকি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এক ব্রাহ্মণের দ্বারা নাকি সেই বগলা-মূর্তি নিয়মিত পূজা করাতেন। আর একথাও সত্য যে তিনি এক সময়ে প্রত্যুষে স্নান করে চণ্ডীপাঠ করতেন। তাঁর রচিত 'The Mother' পুস্তিকাখানা "চণ্ডীতত্ত্বের এক সুললিত ব্যাখ্যা"—একথা বলেছেন 'চণ্ডী'র এক অনুবাদক (রামকৃষ্ণমিশনের স্বামী জগদীশ্বরানন্দের চণ্ডীর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকা—৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে, (এবং আমরা তাঁর দার্শনিক মত আলোচনা কালে দেখবো) যে শ্রীঅরবিন্দ কেবল শক্তি-তত্ত্বে নয়, ব্রহ্ম ও শক্তি এই উভয় তত্ত্বেই বিশ্বাস করতেন; তন্ত্রের শক্তি-পূজা ও বেদান্তের ব্রহ্মবাদ উভয়েরই তিনি সমাদর করতেন। মোটকথা শ্রীঅরবিন্দের অল্পবয়স্কা এক হিন্দুকুমারীর বিবাহের মূলে ছিল তাঁর হিন্দু আদর্শের প্রতি অনুরাগ। স্ত্রীর কাছে লিখিত পত্রের নানা স্থানেই তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীঅরবিন্দের বিবাহিত জীবন

বিবাহের পর মৃণালিনী দেবী স্বামী ও ননদ সরোজিনী দেবীর সঙ্গে কিছুকাল বরোদায় বাস করেন। কিন্তু বরাবর স্বামীর সঙ্গে বাস করবার সুযোগ-সুবিধা মৃণালিনী দেবীর ভাগ্যে জোটে নি; মাঝে মাঝেই স্বামীর কাছ থেকে তাঁকে দূরে থাকতে হতো। বরোদা ত্যাগ করার পর শ্রীঅরবিন্দ যখন বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে ব্যাপৃত, তখন সময় সময় মৃণালিনী দেবীকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেওঘরে কিংবা কলকাতায় পিতৃবন্ধু গিরিশবাবুর গৃহে বাস করতে হতো। স্ত্রীকে যে শ্রীঅরবিন্দ উপেক্ষা করতেন, তা নয় বরং স্ত্রীকে

নিজের উপযুক্ত সহধর্মিনী, নিজের কাজের সহযোগিনী ও সহায়রূপে গড়ে তুলতে তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনী দেবীকে যেসব পত্র লিখেছিলেন তা থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শ্রীঅরবিন্দ যখন মেদিনীপুর কনফারেন্স ও কংগ্রেসের কাজ নিয়ে বিব্রত, তখন এক পত্রে তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখেছিলেন: "যখন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার ভাগ্যে এই দুঃখ অনিবার্য; মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হইবেই, কারণ আমি সাধারণ বাঙালীর মত পরিবার ও স্বজনের সুখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না। এই অবস্থায় আমার ধর্মই তোমার ধর্ম; আমার নির্দিষ্ট কাজের সফলতায় তোমার সুখ না ভাবিলে তোমার অন্য উপায় নাই।" ঐ পত্রেই তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখেছিলেন: "আমার এখন বড় দুর্ভাবনার সময়······পাগল হইবার কথা। এই সময় তুমি অস্থির হইলে আমারও চিন্তা ও দুর্ভাবনার বৃদ্ধি হয়। তুমি উৎসাহ ও সান্ত্বনাময় চিঠি লিখিলে আমার বিশেষ শক্তিলাভ হইবে।" এই পত্র লেখার দুবছর আগে, অর্থাৎ বিবাহের চার বছর পরে, ১৯০৫ সনের ৩০শে আগস্ট মৃণালিনী দেবীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের পত্রখানা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ঐ দীর্ঘ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ স্ত্রীকে তাঁর জীবনের আদর্শের কথা খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন। ঐ পত্রের এক স্থানে তিনি লিখেছিলেন: "তুমি বোধহয় এর মধ্যে টের পেয়েছ যার ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জড়িত সে বড় বিচিত্র ধরনের লোক। এই দেশে আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্মের ক্ষেত্র, আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক এই সকল ভাবকে পাগলামি বলে।······পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমঙ্গল, কারণ······পাগল তার স্ত্রীকে সুখ দিবে না, দুঃখই দেয়।········· পাগলকে বিবাহ করেছ সে তোমার পূর্বজন্মার্জিত কর্মদোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল।····· তুমি কি কোণে বসিয়া কাঁদিবে মাত্র, না··· পাগলের উপযুক্ত পাগলী হইবার চেষ্টা করিবে, যেমন অন্ধ রাজার মহিষী চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া নিজেই অন্ধ সাজিলেন?" উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায় স্ত্রীকে উপেক্ষা করা দূরে থাকুক শ্রীঅরবিন্দ স্ত্রীকে নিজের কাজে সহযোগিনী রূপেই পেতে চেয়েছিলেন। ঐ পত্রেই এক স্থানে (পৃষ্ঠা ১০) শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "স্ত্রী স্বামীর শক্তি, মানে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিজের প্রতিমূর্তি দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি পাইয়া

দ্বিগুণ শক্তি লাভ করে।" শ্রীঅরবিন্দ স্ত্রীর কাছে তা-ই পেতে চেয়েছিলেন এবং সেইভাবেই তাঁকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

একথা ঠিক শ্রীঅরবিন্দের দেশ-সেবার অতি উন্নত আদর্শই তাঁকে একজন সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাপন করতে দেয় নি। তাঁর দেশ-সেবার আদর্শ তাঁর 'Bankim-Tilak-Dayananda' নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানায় (p.-12) তিনি যা লিখেছিলেন তা থেকে জানা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানদের আদর্শ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন: "Whoever loves self or wife or child or goods more than his country is a poor and imperfect patriot; not by him shall the great work be accomplished." একথা আনন্দমঠের সন্তানদের সম্বন্ধে যেমন সত্য, শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। সন্তানগণ ছিলেন বৈরাগী, সন্ন্যাসী। যতদিন দেশমাতার মুক্তি না আসবে ততদিন তারা স্ত্রী-পুত্রাদির নিকট থেকে দূরে থাকবেন এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করার, বাইরে বৈরাগী সাজার পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কিত সন্তানদের আদর্শের মতনই উচ্চ ছিল। দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়েই শ্রীঅরবিন্দ দেশসেবা-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছিল; তাঁর স্ত্রীকেও সাধারণ স্ত্রীদের সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। এই ব্রতের এই-ই ফল। তবে মহান স্বামীর মহান আদর্শের অংশভাগিনী হয়ে মৃণালিনী দেবীও নাকি স্বামীর অনুগামী হতে চেষ্টা করতেন। তার একটি প্রমাণ এখানে উল্লেখ করা গেল। শ্রীঅরবিন্দর ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ লাভ করেছিলেন বারীন্দ্রকুমারের সহযোগী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। অবিনাশ ভট্টাচার্য শ্রীঅরবিন্দের গৃহকর্মও দেখাশোনা করতেন। তিনি বলেছেন: কলকাতায় এক সময় শ্রীঅরবিন্দ এক সন্ন্যাসী গুরুর উপদেশে খাওয়া পরা সম্বন্ধে অতিরিক্ত উদাসীন হয়ে পড়েন, এবং মৃণালিনী দেবীও স্বামীর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালতে থাকেন। মৃণালিনী দেবীও ঐ সন্ন্যাসীর উপদেশে একটু আধটু যোগ অভ্যাস করতে প্রবৃত্ত হন। তখন একদিন অবিনাশ ভট্টাচার্য শ্রীঅরবিন্দের স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত হয়ে মৃণালিনী দেবীর কাছে প্রতিবাদ করেন। মৃণালিনী দেবী তাঁকে বলেন: "কী করবো ভাই, আমি পিছটান হতে চাই না। ওঁর পিছু পিছু চলতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো।" (গল্পভারতী পৌষ ১৩৫৭ সন)

বিবাহের পর মাত্র ৯ বছর পরে, ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীঅরবিন্দ চিরদিনের জন্ত কলকাতা ত্যাগ করেন। তারপর আর শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর দেখা হয় নি। ১৯১৮ সনে শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনী দেবীকে পণ্ডিচেরী যাবার অনুমতি দেন; মৃণালিনী দেবীও যাবার জন্ত প্রস্তুত হচ্ছিলেন; এমন সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে কলকাতায় মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩১ বছর। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী গমনের পর মৃণালিনী দেবী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্মিনী সারদা দেবীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। স্বামীর দৃষ্টান্ত ও উপদেশে এবং সারদা দেবীর পুণ্য সংস্পর্শে মৃণালিনী দেবী আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ

ভারতের জাতীয় জাগরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসের ধারা

শ্রীঅরবিন্দের বরোদার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা হলো। এখন শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। ভারতের জাতীয় জাগরণে শ্রীঅরবিন্দের অবদান কী তা আমাদের দেখতে হবে। সেজন্য ভারতের জাতীয়তাবোধের উন্মেষের ইতিহাস সম্বন্ধে দুচারটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতে জাতীয়তা-বোধের ক্রমশ উন্মেষ হচ্ছিল। সেই ইতিহাসের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় উনিশ শতকের প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন রায়ই প্রথমে এদেশে জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন; এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগে রাজা রামমোহন থেকে বিশ শতকের প্রথম দশকে জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত জাতীয়তাবোধের এক নিরবচ্ছিন্ন ধারার সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মতে দেশকে রাজনৈতিক চেতনায় প্রথম উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন রামমোহন। রাজা রামমোহনের দেশ-প্রীতি সুবিদিত, এবং আঠারো শতকের শেষভাগের ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের আদর্শ দ্বারা তিনি

অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ইউরোপ যে জাতীয়তা-বোধের ও গণতন্ত্রের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ভারতের ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর সে আদর্শ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৬১ সনের রাজনারায়ণ বসুর "জাতীয় গৌরব-সম্পাদনীসভা" এবং ১৮৬৭ সনের নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা' বাঙালীর জাগ্রত জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক। ঐ দুটির প্রতিষ্ঠা শ্রীঅরবিন্দের জন্মের যথাক্রমে ১১ বছরের ও ৫ বছরের আগেকার ঘটনা। শ্রীঅরবিন্দের জন্মের ৪ বছর পরে ১৮৭৬ সনে কলকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই তাঁর 'A Nation in Making' পুস্তকে বলেছেন কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানটির নাম কেউ কেউ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন না রেখে বেঙ্গল এসোসিয়েশন রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার ইংরেজী-শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ তখন ম্যাটসিনি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে এক সংঘবদ্ধ ভারতের ছবি দেখতেন; অর্থাৎ প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে উঠে তাঁরা জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন। তারপর ১৮৮৫ সনে সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের জন্ম। শ্রীঅরবিন্দ তখন বিলাতে। তখন তাঁর বয়স ১৩ বছর, এবং তিনি সবে লণ্ডনের সেণ্টপলস্ স্কুলে প্রবেশ করেছেন। ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। ১৮৯৪ সনে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ভারতের জাতীয়তা-আকাশের অপর উজ্জ্বলতম নক্ষত্র স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু হয় ১৯০২ সনে। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদার রাজকর্মচারী; এবং ইতিপূর্বেই ১৮৯৩ সনে তিনি কংগ্রেসের কর্মপন্থার ত্রুটি দেখিয়ে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তারপর ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ ও বাংলার তথা ভারতের স্বদেশী আন্দোলন, এবং আন্দোলনের পুরোভাগে শ্রীঅরবিন্দের স্থান। দেখা গেল রাজা রামমোহন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় জাতীয়তা-বোধের অগ্রগতি হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ: কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপন্থার নিন্দা

বিলাত থেকে ফেরার ছয়মাসের মধ্যেই শ্রীঅরবিন্দের 'New Lamps for Old' শীর্ষক প্রথম রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি বের হয় পুণার 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক একখানা Anglo-Maratha পত্রিকায়। 'ইন্দুপ্রকাশে'র

সম্পাদক কেশবরাও দেশপাণ্ডে ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের কেম্ব্রিজের এক সতীর্থ; এবং তাঁরই অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ প্রবন্ধটি লেখেন এবং পরপর ঐ নামে আরো সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন বরোদার রাজকর্মচারী, তাই নিজ নামে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বিতর্কে যোগ দেওয়া সমীচীন নয় বলে প্রবন্ধগুলি বেনামীতে প্রকাশিত হয়। তবে প্রবন্ধগুলির লেখক যে শ্রীঅরবিন্দ একথা অনেকেরই জানা ছিল। প্রবন্ধগুলিতে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের লক্ষ্য, কর্মপন্থা ও কংগ্রেসের গঠন-পদ্ধতির সমালোচনা করেন, এবং কংগ্রেসকে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে তিনি আহ্বান করেন। তাই প্রবন্ধগুলির নাম 'New Lamps for Old'। সেকালে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র—ছিটেফোঁটা শাসন-সংস্কার লাভ। যথা, অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের সরকারী চাকরিতে নিয়োগ, বিলাতে ও ভারতে উভয়ত্র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণ, যাতে অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয় যুবকগণ সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করবার সুযোগ পেতে পারে, আর যেসব প্রদেশে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অপ্রচলিত সেসব প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন দ্বারা প্রজাদের স্বল্পকালস্থায়ী বন্দোবস্তের অনিশ্চয়তা দূরীকরণ; বিচার ও শাসন বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ দ্বারা বিচার-বিভ্রাটের সম্ভাবনা হ্রাস করা ইত্যাদি। কংগ্রেস এই সকল ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যেই তার লক্ষ্য সীমাবদ্ধ রেখেছিল। বিলাত থেকেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করবার সংকল্প নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ দেশে ফেরেন; তাঁর নিকট যে কংগ্রেসের এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য সমর্থনের অযোগ্য বিবেচিত হবে তা তো সহজেই বোঝা যায়।

কংগ্রেসের কর্মপন্থা শ্রীঅরবিন্দের কাছে ভ্রান্ত ও সমর্থনের অযোগ্য মনে হয়েছিল। প্রতিবছর একবার বড়দিনের ছুটির সময় তিনচারদিনের জন্য কংগ্রেসের অধিবেশন হতো। প্রতি অধিবেশনে বছরের পর বছর এক ধরনের কতকগুলি প্রস্তাব পাস হতো, এবং প্রস্তাবগুলি গভর্নমেণ্টের নিকট পেশ করা হলেই কংগ্রেসের কর্তব্য শেষ হতো। এককথায় গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদনই ছিল কংগ্রেসের একমাত্র কর্মপন্থা।

কংগ্রেসের গঠন-রীতির নিন্দা

কংগ্রেসের গঠন-রীতিও ছিল বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ, এবং সেখানেই ছিল কংগ্রেসের প্রধান দুর্বলতা। কংগ্রেস নামে ছিল ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতি, কিন্তু কাজে ছিল কেবল ইংরেজী-শিক্ষিত মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি

নিয়ে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। উকিল, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, পত্রিকা-সম্পাদক, চাকরিজীবী প্রভৃতি ইংরেজ আমলে সৃষ্টি ভুইফোঁড় ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান ছিল এই "জাতীয়" মহাসমিতি। এঁরা কেউ জনসাধারণের প্রতিনিধি নন। সেকালে কংগ্রেসের নেতারা মনে করতেন দেশের অশিক্ষিত চাষা-ভুষাদের অর্থাৎ জনসাধারণের মঙ্গলচিন্তা করা কংগ্রেসের কাজ, আর জনসাধারণের দাবি-দাওয়া সরকারের গোচরে আনার দায়ও শিক্ষিত লোকদের—অর্থাৎ কংগ্রেসের। কংগ্রেসের নেতারা মনে করতেন যতদিন জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা না জাগবে ততদিন জনসাধারণের সঙ্গে যোগস্থাপন অনাবশ্যক। ফলে কংগ্রেসের পিছনে জনমতের সমর্থন না থাকায় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করা গভর্নমেণ্ট প্রয়োজন মনে করতো না।

শ্রীঅরবিন্দের মতে কংগ্রেসের কী করা উচিত

ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশিত 'New Lamps for Old' শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেস-নেতাদের ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে বলেন তাঁদের উচিত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ত্যাগ করা, এবং আত্মমর্যাদাহীন আবেদন-নিবেদন নীতির পরিবর্তে আত্ম-বিশ্বাস অবলম্বন করা, ভয় ত্যাগ করে নির্ভয়ে দেশের মঙ্গলকাজে প্রবৃত্ত হওয়া। জনসাধারণের সম্বন্ধেও তিনি কংগ্রেসকে তার নীতি পরিবর্তন করতে অনুরোধ করেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বিত্তহীন অশিক্ষিত জনসাধারণেরই উপর। মুষ্টিমেয় ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর নয়। একটি উপমা দিয়ে তিনি বলেন শিক্ষিত লোকেরা যেন সমুদ্রের উপর-তলের বুদ্বুদ; বুদ্বুদ ওঠে আর মিলিয়ে যায়, তার শক্তি কিছু নয়। কিন্তু জনসাধারণ হলো সমুদ্রের গভীর জলরাশি; সমুদ্রের বিপুল আলোড়নের মূলে থাকে তলাকার গভীর জলরাশি। ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাস শ্রীঅরবিন্দ ভাল করেই জানতেন। আঠারো শতকের ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস ছিল তাঁর নখদর্পণে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের রাশিয়ার বৃহত্তর কম্যুনিস্ট বিপ্লব অবশ্য পঁচিশ বছর পরেরকার ঘটনা; কিন্তু রাশিয়ায় রাজা-প্রজার মধ্যে যে দীর্ঘ বিরোধ চলে আসছিল তা শ্রীঅরবিন্দ লক্ষ্য করেছিলেন। ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশিত 'New Lamps for Old' পর্যায়ের ৭ম প্রবন্ধে (৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৯৩ সন) শ্রীঅরবিন্দ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে যদি জনসাধারণ চিরদিন উপেক্ষিত থাকে তবে একদিন ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের অনুরূপ বিপ্লব এদেশে দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়। তিনি বলেন মাত্র পাঁচ বছরে ফ্রান্সের

অশিক্ষিত জনসাধারণ তের শতাব্দীর অত্যাচার মুছে ফেলেছিল (blotted out in five years the accumulated oppression of thirteen centuries)। তাই তিনি বলেন জনসাধারণের সঙ্গে যোগস্থাপন, তাদের অবস্থার উন্নয়ন কংগ্রেসের প্রথম ও পবিত্র কর্তব্য।

শ্রীঅরবিন্দ ও গণ-সংযোগ

আজকাল এদেশে গণ-সংযোগ ডিমক্রেসি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রভৃতি কথা আমরা শুনে থাকি। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায় যে ১৮৯৩ সনে যখন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'New Lamps for Old' পর্যায়ের প্রবন্ধে জনসাধারণের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তখন দেশের নেতারা কেউ সেই বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার দশ এগার বছর পরে স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সনে "ভাণ্ডার" নামক একটি পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে রাজনৈতিক আন্দোলনে সফলতা লাভ করতে হলে জনসাধারণকে যুক্ত করা দরকার। কথাটা সুরেন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি বাংলার তৎকালীন নেতারা সমর্থন করেন বটে; কিন্তু তার পরেও বহুদিন পর্যন্ত গণ-সংযোগের গুরুত্ব কংগ্রেস-নেতারা তেমন উপলব্ধি করেন নি। পরে মহাত্মা গান্ধীজী নূতন নেতৃত্ব দিলেন; ১৯২১ সনে গান্ধীজী বলেন "জনসাধারণকে বাদ দিলে, তাদের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা না জাগালে স্বরাজ লাভ হতে পারে না।" একথা ঠিক যে বহুপূর্বে ১৮৯৩ সনে ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ যে গণ-সংযোগের কথা বলেছিলেন কর্মপন্থা হিসাবে তা গ্রহণ করেই কংগ্রেস সত্যিকার জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়; এবং ভারতে জাতীয় আন্দোলন যে জয়যুক্ত হয় তা নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের জনসাধারণের সহযোগিতা লাভেরই ফল। ইন্দুপ্রকাশের 'New Lamps for Old' পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তবে একথা ঠিক যে 'ইন্দুপ্রকাশে' রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে তিনি কংগ্রেসকে তার কর্মপন্থা পরিবর্তন করাতে সক্ষম হলেন না—তার একটু ইতিহাস আছে।

রানাডে ও শ্রীঅরবিন্দ

ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশিত 'New Lamps for Old' শীর্ষক প্রবন্ধগুলির ভাষা যেমন জোরালো ছিল যুক্তিও ছিল তেমনি অকাট্য। স্বভাবতই ঐসব প্রবন্ধ অনেক শিক্ষিত যুবকের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের মনে কংগ্রেসের

লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে সংশয় জন্মে। প্রথম দুটি প্রবন্ধ প্রকাশের পরই কংগ্রেসমহলে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সেকালে বোম্বাই হাইকোর্টের স্বনামধন্য জজ মহামতি মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ছিলেন বিদ্যাবুদ্ধি ও চরিত্রের মহত্ত্বের জন্য মহারাষ্ট্রের সর্বজনমান্য নেতা। তিনি ছিলেন দেশভক্ত; এবং কংগ্রেস দেশের কাজ করে বলে কংগ্রেসের একজন পরম হিতৈষী। তিনি ইন্দুপ্রকাশের সম্পাদকের নিকট আশঙ্কা প্রকাশ করলেন শ্রীঅরবিন্দের ঐসব জোরালো প্রবন্ধের জন্য ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনীত হবার সম্ভাবনা। সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর ভাষার সুর একটু নরম করতে অনুরোধ করলেন। অনিচ্ছার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দকে রাজী হতে হয়। কথিত আছে রানাডে ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এক সাক্ষাৎকার ঘটে। রানাডে শ্রীঅরবিন্দের যুক্তি খণ্ডন করতে অসমর্থ হন; কিন্তু তিনি অনুরোধ করলেন শ্রীঅরবিন্দ যেন তাঁর লেখার দ্বারা দেশের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের শক্তি ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বলেন শ্রীঅরবিন্দ যেন কংগ্রেসের কোন একটি লক্ষ্য সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। রানাডে নাকি কংগ্রেসের অন্যতম লক্ষ্য কারাসংস্কার নিয়ে কাজ করতে শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রস্তাব করেন। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য রানাডের ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না—তিনি চান ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের কারা-সংস্কার নয়। তিনি বুঝলেন তাঁর নিজের ও কংগ্রেসের লক্ষ্যের ও কর্মপন্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। এর পরও তিনি 'New Lamps for Old' পর্যায়ের আরো ছয়টা প্রবন্ধ লেখেন; কিন্তু কংগ্রেসের সমালোচনায় ক্ষান্ত ছিলেন। ঐ পর্যায়ের তাঁর অষ্টম ও শেষ প্রবন্ধ বের হয়েছিল ১৮৯৪ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। তারপর তিনি রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতে আর উৎসাহ বোধ করলেন না। দেশের স্বাধীনতালাভের আশায় অন্য কর্মপন্থা অবলম্বন করা তিনি স্থির করেন এবং সেজন্য নীরবে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দের বরোদা থাকাকালেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের অপর একটি পরম হিতকর যোগাযোগের সূত্রপাত হয়। পুণার 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদক পুরুষসিংহ তিলকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মিলন ঘটে। 'ইন্দুপ্রকাশে'র প্রবন্ধগুলির প্রতি তিলকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন লেখক একজন অসাধারণ লোক—তাঁর পাণ্ডিত্যও যেমন অগাধ, আদর্শও তেমনি

উচ্চ। তিলকও ছিলেন একজন অসাধারণ বিদ্বান ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তি। দেশ-সেবা করতে গিয়ে গভর্নমেণ্টের হাতে তিলককে যে নির্যাতন ভোগ করতে হয় স্বভাবতই তা শ্রীঅরবিন্দের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ফলে দুজনেই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। সেকালে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের কাজে প্রকাশ্যে কোন অংশ গ্রহণ না করলেও কংগ্রেসে উপস্থিত থাকতেন। ১৯০২ সনে আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তিলক কংগ্রেস-মণ্ডপের বাইরে এসে খোলাখুলি ভাবে অনেকক্ষণ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলাপ করেন। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির ব্যর্থতা সম্বন্ধে এবং স্বাবলম্বন-নীতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উভয়েই একমত হন। শ্রীঅরবিন্দ বুঝলেন দেশের অগ্রগামী যুবকদের নেতা হবার একমাত্র উপযুক্ত লোক হলেন তিলক। সুরু হলো ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐ দুই মহান দেশসেবকের সহযোগিতা।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধ

ইন্দুপ্রকাশে 'New Lamps for Old' পর্যায়ের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি শেষ হলে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পরপর সাতটি প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৮৯৪ সনের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনমাস পরে ঐ সনের জুলাই মাসে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; এবং ঐ সনের ২৭শে আগস্ট তারিখে সপ্তম ও শেষ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ঐ সাতটি প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা, চাকরি-জীবন, সাহিত্য-সাধনা, দেশের জন্য তাঁর অবদান এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার সশ্রদ্ধ আলোচনা করেন। আনন্দমঠের অনুরূপ ভবানীমন্দির নামক একটি আশ্রমের পরিকল্পনা একসময় শ্রীঅরবিন্দের মনে হয়েছিল; এবং তিনি "ভবানীমন্দির" নামক একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকাও বরোদা ত্যাগের অল্প পূর্বে লিখেছিলেন। আনন্দমঠের ন্যায় ভবানীমন্দিরও দেশসেবকদের নিভৃত সাধনার স্থলরূপে পরিকল্পিত হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের ভাই বারীন্দ্রকুমার একসময় উৎসাহের সঙ্গে ভবানীমন্দিরের পরিকল্পনা কার্যকরী করতে চেষ্টা করেন; এবং তিনি ভবানীমন্দিরের উপযোগী একটি নিভৃতস্থানের সন্ধানে শোণ ও নর্মদার তীরে কাইমুর পাহাড় অঞ্চলে কিছুকাল ঘোরাঘুরিও করেন, এবং তার ফলে "পাহাড়ীজ্বরে" আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন ভোগেন। বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙালীকে মাতৃরূপে দেশকে পূজা করতে শিখিয়েছিলেন—এটাই ছিল শ্রীঅরবিন্দের মত; এবং তাঁর মতে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত যুবকদের উপর, কংগ্রেসের

উপর নয়, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তার ভিত্তি ছিল ধর্ম; শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তার ভিত্তিও ধর্ম। এখানেই দুজনের মধ্যে মিল।

শ্রীঅরবিন্দের চোখে দেশ

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ দেশকে কী চোখে দেখতেন তার উল্লেখ প্রয়োজন। আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশকে মা রূপে কল্পনা করেছিলেন এবং দেশ-মাতার বিভিন্ন মূর্তি তিনি দেখেছিলেন; যথা মা যা ছিলেন অর্থাৎ দেশমাতার অতীতের গৌরবময়ী মূর্তি বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনা-নেত্রে দেখতে পেয়েছিলেন; মা যা হয়েছেন, অর্থাৎ পরাধীন দেশমাতার দীনা মূর্তি; আর মা যা হবেন অর্থাৎ ভবিষ্যতের দেশমাতার মহিমময়ী মূর্তি। শ্রীঅরবিন্দের নিকটও দেশ ছিলেন মা। ১৯০৫ সনের ৩০শে আগস্ট তারিখে শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনী দেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে আমরা জানতে পারি কী চোখে শ্রীঅরবিন্দ দেশকে দেখতেন। ঐ পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "অন্য লোক স্বদেশকে একটা জড়পদার্থ, কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বনপর্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে; সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, আঠার বৎসর বয়সে প্রতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল হইয়াছিল।" দেখা গেল শ্রীঅরবিন্দের দেশভক্তি তাঁর মজ্জাগত। বিলাতে স্কুলে থাকা কালেই তাঁর মনে দেশপ্রীতি জেগেছিল; কেম্ব্রিজে যাবার পর তাঁর এই দেশপ্রীতি দৃঢ় ও অচল হয়; এবং শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস জন্মে যে ভারতকে স্বাধীন করা, পতিত ভারতকে উদ্ধার করা, তাঁর ঈশ্বর-দত্ত ব্রত।

শ্রীঅরবিন্দের মতে স্বাধীনতালাভ সম্ভব

সেকালের কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল শাসন-সংস্কার, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য স্বাধীনতা। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ১৯০৩ সন থেকে ১৯১০ সন পর্যন্ত যখন তিনি বাংলার রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল দেশের লোকের মনে স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা জাগানো। তাঁর মত ছিল এই যে কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসবে না, স্বাধীন হতে হলে দেশকে একদিন বিদেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিরোধের জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। প্রবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দুর্বল নিরস্ত্র ভারতবাসীর সশস্ত্র বিরোধ। এ-ও কী সম্ভব? অনেক "সুবুদ্ধি" লোক মনে করতেন ইহা ভাবাও পাগলামি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তা মনে করতেন না। তিনি জানতেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সহজ নয়, এবং দীর্ঘকালের জন্য প্রস্তুত হতে না পারলে তা কখনও সম্ভব হবে না। কিন্তু তাঁর আশা ছিল অন্তত ত্রিশ বছর ধরে প্রস্তুত হবার পর ভারতের স্বাধীনতা-অর্জন সম্ভব হবে। আজ ভারতের স্বাধীনতালাভের স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে; কিন্তু তা হয়েছে ত্রিশ বছরের নয়, প্রায় পঞ্চাশ বছরের আন্দোলনের পর। ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতা আদায় করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব হবে শ্রীঅরবিন্দের এই বিশ্বাসের মূলে ছিল তাঁর এসব ধারণা:

প্রথমত সেকালের অস্ত্রশস্ত্র আজকের অস্ত্রশস্ত্রের ন্যায় মারাত্মক ও সর্ববিধ্বংসী ছিল না। বিমান তখনও আবিষ্কৃত হয় নি এবং বিমানযুদ্ধ তখন ছিল কল্পনাতীত। স্মরণীয় যে বিমান আবিষ্কৃত হয় ১৯০৮ সনে এবং ১৯১৪ সনের পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিমানযুদ্ধের প্রচলন হয়। এটম্ বোমার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্। স্থলযুদ্ধে রাইফেলই ছিল সেকালে যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র; এবং রাইফেলের ব্যবহার শেখা খুবই সহজ।

দ্বিতীয়ত ভারতবাসী সহযোগিতা করে বলেই মুষ্টিমেয় ইংরেজের পক্ষে ত্রিশকোটী ভারতবাসীকে শাসন করা সম্ভব হয়। দেশে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগলে পরাধীন ভারতবাসী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে নারাজ হবে, এবং ইংরেজের পক্ষে দেশ শাসন করা অসম্ভব হবে।

তৃতীয়ত ভারতীয় সিপাহীদের তুলনায় গোরা সৈনিক সংখ্যায় অল্প। জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগালে সিপাহী যোদ্ধাদের অনেকে দেশবাসীর স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টায় যোগ দেবে, এই আশা অমূলক নয়।

মোটকথা স্বাধীনতালাভের পক্ষে যথেষ্ট বাধা আছে সত্য; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলতেন 'difficulties are made to be overcome'—বাধার সৃষ্টি তো বাধাকে অতিক্রম করবারই জন্য।

শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থার পর্যায়সমূহ

ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থা ছিল কংগ্রেসের কর্মপন্থা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—আবেদন-নিবেদনের পরিবর্তে আত্মনির্ভর, সরকারের সঙ্গে অসহযোগ এবং দূর ভবিষ্যতে সশস্ত্র বিরোধের জন্য দেশের প্রস্তুতি। এই কর্মপন্থার পরপর অনুষ্ঠেয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ধাপ ছিল। প্রথম ধাপ হবে গুপ্তসমিতি গঠন করা এবং যেসব যুবক স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করবে তাদের সংঘবদ্ধ করা। এইরূপে ভবিষ্যতে সশস্ত্র অভিযানের জন্য সুস্থ, সবল এবং সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত একদল যুবক প্রস্তুত হবে। অবশ্য গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি এড়াবার জন্য গুপ্তসমিতিগুলির প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হবে নির্দোষ কোন কাজ; যথা শরীর-চর্চা ও ব্যায়াম, সমাজ-সেবা, কিংবা সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোচনার জন্য সভা-সমিতি। কোন কোন সমিতির সভ্যগণ লাঠিখেলা কুস্তি ব্যায়াম প্রভৃতি শিখবে। অন্য কোন সমিতির সভ্যরা প্রধানত সমাজ-সেবা এবং বিপদে-আপদে লোকের উপকার নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে। গুপ্তসমিতির সভ্যদের মধ্যে বাছা বাছা যুবকদের ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, শিবাজী, প্রতাপসিংহ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বিখ্যাত বীর ও বিপ্লবীদের চরিতালোচনায় উৎসাহ দেওয়া হবে।

গুপ্তসমিতিগুলির লক্ষ্য হবে কেবল যুবকদের আনুকূল্য লাভ নয়; দেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই এবং শেষে জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ তাদের লক্ষ্য হবে। আর জনসাধারণের ভয়-ভাঙানোর ব্যবস্থাও দরকার। তাই পত্রিকা-প্রচার ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হবে কর্মপন্থার দ্বিতীয় ধাপ।

কর্মপন্থার তৃতীয় ধাপ হবে সরকারের সঙ্গে অসহযোগ সুরু করা। দেশের বর্তমান অবস্থায় নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) প্রকৃষ্ট পন্থা। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ গান্ধীজীর ন্যায় পুরোপুরি অহিংসবাদী ছিলেন না। স্বাধীনতালাভের জন্যও কোন অবস্থায়ই সশস্ত্র বিরোধ সংগত নয়—এই হলো গান্ধীজীর মত। শ্রীঅরবিন্দ তা বলতেন না। (এ বিষয়ে পরে আমাদের আরো আলোচনা করতে হবে।) অসহযোগ সুরু করবেন প্রথমে অল্পসংখ্যক এমন একদল লোক যাদের সরকারের হাতে

নির্যাতন ভোগ করবার সাহস ও সামর্থ্য থাকবে। কিন্তু এই অসহযোগীদের দৃষ্টান্তে এবং বিদেশীয় সরকারের নির্মম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলে, ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় ভারতবাসী সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকবে, স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। এইরূপে বিদেশীয় শাসনের ভিত্তি দুর্বল হতে থাকবে।

এইরূপে বিদেশীয় শাসনের ভিত্তি দুর্বল হলে এবং দেশ প্রস্তুত হলে কর্মপন্থার পরবর্তী বা চতুর্থ ধাপ হবে দেশে গ্যারিলা যুদ্ধ সুরু করা। তখনও অবশ্য দেশ শক্তিশালী ইংরেজ সৈন্যদলের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করবার মত শক্তি অর্জন করবে না, কিন্তু সফলতার সঙ্গে অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা শত্রুপক্ষের বল ক্ষয় করা দেশের গ্যারিলাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হবে। গ্যারিলা যুদ্ধ যে কী পরিমাণে শত্রুকে কাবু করে স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। আমাদের দেশের ইতিহাসেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হবার পর দীর্ঘকাল প্রতাপসিংহ এভাবেই প্রবল মোগলের বলক্ষয় করেছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের পরিকল্পিত কর্মপন্থার পঞ্চম বা শেষ ধাপ হবে বিদেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সশস্ত্র অভিযান এবং বলপূর্বক স্বাধীনতা আদায়। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ও ইংরেজ চরিত্র শ্রীঅরবিন্দ ভালভাবেই জানতেন। নিতান্ত বাধ্য না হলে ইংরেজজাতি স্বেচ্ছায় কিছুমাত্র অধিকার ত্যাগ করবে না, ভারতবাসীকে শাসন অধিকার দেবে না এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস। এক সময়ে এদেশে কারো কারো বিশ্বাস ছিল যে স্বাধীনতা-প্রিয় ইংরেজজাতি স্বেচ্ছায় ভারতবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে, শ্রীঅরবিন্দ তাদের ভ্রান্ত মনে করতেন। বহুপূর্বে ১৮৯৩ সনে ইন্দুপ্রকাশে তাঁর 'New Lamps for Old' পর্যায়ের পঞ্চম প্রবন্ধে তিনি একথা বলেছিলেন। তবে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস থেকে এবং ইংরেজ চরিত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জেনেছিলেন যে ইংরেজ যখন দেখবে শাসন-ব্যাপারে অধিকাংশ ভারতবাসীর সহযোগিতা-লাভ আর সম্ভব নয় এবং ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জনে কৃতসংকল্প, তখন ইংরেজ ভারতবাসীর সঙ্গে আপস রফা করতে প্রস্তুত হবে। শ্রীঅরবিন্দের মতে ১৯১৮ সনের মণ্টেগু-চেলম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রস্তাবে ইংরেজদের এই মনোভাবের কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, এবং দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের সময় ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাবে ইংরেজের ভারতবাসীর সঙ্গে আপসের প্রস্তাবের মধ্যে এই মনোভাবের আরো পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ তার বহু আগেই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন থেকে যে সরে দাঁড়িয়েছেন, একথা স্মরণ রাখতে হবে। মোটকথা শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীকে বলপূর্বক স্বাধীনতা আদায় করতে দেওয়া হয়ত ইংরেজ ভ্রান্ত নীতি মনে করবে; বরং ভারতবাসীর বন্ধুতা চিরদিনের জন্য না হারিয়ে ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখাই সমীচীন মনে করবে; এবং হয়ত স্বাধীনতালাভের জন্য ভারতবাসীর পক্ষে সশস্ত্র অভিযানের প্রয়োজন হবে না। ইংরেজ স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াবে। ইংরেজের শাসন-সংস্কার প্রস্তাবসমূহ এবং শেষে ভারতের শাসন-ভার ভারতবাসীর হস্তে অর্পণ শ্রীঅরবিন্দের এই বিশ্বাসকে সত্য প্রমাণ করেছে।

বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা

ভারতের স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ হিসাবে ১৯০২ সনে (অর্থাৎ দেশে ফেরার প্রায় দশ বছর পরে এবং বরোদা ত্যাগের চার বছর আগে) শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিপূর্বে উনিশ শতকের শেষ দশকে ইউরোপের দৃষ্টান্তে পশ্চিম ভারতের বোম্বাই অঞ্চলে এবং বাংলা দেশে কতকগুলি গুপ্তসমিতি ও আধা-গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ পশ্চিম ভারতের গুপ্তসমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, এবং পশ্চিম ভারতের ও পূর্ব ভারতের গুপ্তসমিতির মধ্যে যোগস্থাপনে সচেষ্ট হন। এই সমিতিগুলির ইতিহাস একটু আলোচনা দরকার।

পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে যে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ঠাকুর রামসিংহ নামক উদয়পুরের এক সর্দার ছিলেন তার নেতা। এই সমিতির লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত সময়ে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানের জন্য প্রস্তুত হওয়া। এই উদ্দেশ্যে ঠাকুরসাহেব ভারতের সিপাহী সৈন্যদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাতেন। তাঁর প্রচারের ফলে কয়েকটি সৈন্যদলের দেশীয় সেনানায়কগণ স্বাধীনতা-যুদ্ধ বাধলে সাহায্য করতে রাজী হন। শ্রীঅরবিন্দও নাকি কোন কোন সেনানায়কের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও গোপনে আলাপ-আলোচনা করেন। শ্রীঅরবিন্দ পশ্চিম ভারতের গুপ্তসমিতির শপথ গ্রহণ করেছিলেন; এবং এক সময় ঠাকুর রামসিং বিদেশে গেলে তিনি পশ্চিম ভারতের গুপ্তসমিতির নেতা অর্থাৎ পরিচালকসভার প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন।

বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী সরলা দেবী একটি এবং ব্যারিস্টার পি. মিত্র অপর একটি সমিতি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সরলা দেবীর প্রতিষ্ঠিত সমিতির উদ্দেশ্য ছিল দেশের যুবকদের বলশালী ও আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তোলা। দেশের তখনকার অবস্থায় তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে, বিশ শতকের প্রথম দিকে স্বদেশী-আন্দোলন আরম্ভ হবার আগে পথে-ঘাটে, রেলে-ষ্টিমারে সাম্রাজ্য-গর্বিত গোরাদের অত্যাচার ছিল সাধারণ ঘটনা। স্বাধীনতা-আন্দোলন তখনও গড়ে ওঠে নি ; কিন্তু গোরাদের অত্যাচারে দেশের লোকের জাতীয় মর্যাদা-বোধে আঘাত লাগতো। দেশের লোকদের ব্যায়াম, কুস্তি শিক্ষা দিয়ে তাদের আত্মরক্ষায় সক্ষম করে তোলবার জন্য দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামক দুই মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণযুবক পুণাতে এক ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বোম্বাইয়ের একজন জেলা-জজ। তাঁর ভাগিনেয়ী সরলা দেবী তাঁর নিকট বেড়াতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের ব্যায়াম-সমিতির পরিকল্পনা দ্বারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন, দেশে ফিরে এসে তিনি তাঁর বালিগঞ্জের পিতৃগৃহে এক ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বাংলার বালক ও যুবকেরা উৎসাহের সঙ্গে লাঠি খেলতো, কুস্তি করতো ও ছোরা-তলোয়ারের ব্যবহার শিখতো। সরলা দেবী ছিলেন বিদুষী এবং ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা। এই সময় তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে ; এবং প্রবন্ধটির নাম থেকেই তাঁর ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বোঝা যায়। প্রবন্ধটির নাম ছিল "বিলাতী ঘুষি বনাম দেশী কিল"—বিনা প্রতিবাদে গোরার অত্যাচার-অপমান সহ্য না করে অপমানের পরিবর্তে অপমান ফিরিয়ে দিতে হবে, এই ছিল প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথও যা বলেছিলেন তা স্মরণীয়। স্বামীজী তাঁর এক লেখায় বলেছিলেন : "তোমাকে কেহ এক চড় মারলে তুমি যদি দুই চড় ফিরিয়ে না দাও তবে তুমি কিসের মানুষ ?" আর রবীন্দ্রনাথের কথা "মার খাইয়া বিনা প্রতিবাদে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা।" তাঁর একটি কবিতার প্রসিদ্ধ অংশ :

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে ॥

সরলা দেবীর আর একটি কাজও উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রে প্রচলিত "বীরাষ্টমী"

ব্রতের অনুরূপ একটি প্রথার প্রচলন তিনি এদেশে করেছিলেন। দুর্গা পুজার সময় অষ্টমী তিথিতে অস্ত্রপুজার অনুষ্ঠান সরলা দেবীর উৎসাহে কয়েক বছর কলকাতায় পালিত হয়েছিল। স্বদেশীযুগে বাংলাদেশ সারা ভারতকে জাতীয়তাবোধ শিখিয়েছিল ; কিন্তু এ ধরনের জাতীয়তাবোধের প্রথম উন্মেষ হয় মহারাষ্ট্রে। জাতীয়তাবোধের দ্বারা প্রণোদিত তিলক মহারাষ্ট্রে শিবাজী-উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর অনুকরণে বাংলাদেশেও সরলা দেবী প্রমুখ অনেকের উৎসাহে শিবাজী-উৎসব প্রবর্তিত হয়েছিল। কয়েক বছর খুব উৎসাহ ও সমারোহের সঙ্গেই শিবাজী-উৎসব পালিত হয়। এক শিবাজী-উৎসবে রবীন্দ্রনাথ টাউন্ হলে তাঁর 'শিবাজী' নামক বিখ্যাত কবিতাটি পড়েছিলেন। বাংলার বীর প্রতাপাদিত্য ও তাঁর পুত্র উদয়াদিত্যের স্মরণেও উৎসব কয়েকবার পালিত হয়। দেশের যুবকেরা বীর ও বলশালী হয়ে উঠুক, তাদের মনে স্বদেশ-প্রীতি জাগুক, এই ছিল সরলা দেবীর কাম্য। দেশের স্বাধীনতা অর্জন সরলা দেবীর কর্মপন্থার অন্তর্গত ছিল না ; বস্তুত সে সময়ও তখন হয় নি। আর সরলা দেবীর ব্যায়াম-সমিতিকে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসমিতির অনুরূপ একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি বলা চলে না। তার মধ্যে গোপন করবার কিছু ছিল না।

১৯০২ সনে শ্রীঅরবিন্দের গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার পুর্বে ১৮৯৭ সনে ব্যারিস্টার পি. মিত্র মশাই একটি সমিতি স্থাপন করেন। তা-ই ছিল পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ অনুশীলন সমিতির সূচনা। পি. মিত্র মশাই বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়ার সময় ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডির আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক যে শ্রীঅরবিন্দই প্রথম ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনকেই স্থির লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ সনে বরোদা ত্যাগ করে কলকাতায় নিজ কর্মক্ষেত্র স্থাপন করবার পুর্বে পুজার ছুটিতে প্রতি বছর শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় আসতেন। তিনি পি. মিত্র মশায়ের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পশ্চিম ভারতের গুপ্তসমিতির সংবাদ তাঁকে দেন। পশ্চিম ও পুর্ব ভারতের দুই দলের একযোগে কাজ করারও চেষ্টা হয় এবং পি. মিত্র মশাই হন পুর্ব ভারতের গুপ্তসমিতির নেতা।

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম গুপ্তসমিতির ইতিহাস

এইবার বাংলায় শ্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসমিতির ইতিহাস—তার প্রতিষ্ঠা, প্রসার ও পতনের কথা আলোচনা করা যাক্। ১৯০২ সনে

শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবককে গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলায় প্রেরণ করেন। ছয় মাস পরে যতীন্দ্রনাথকে সাহায্য করবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকে বরোদা থেকে কলকাতায় পাঠান। শ্রীঅরবিন্দের সহযোগী এই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় নিম্নরূপ :

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম বর্ধমান জেলার চান্না নামক গ্রামে। এলাহাবাদ কায়স্থ পাঠশালা কলেজে যখন প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মশাই ছিলেন অধ্যক্ষ, তখন যতীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্র ছিলেন। রামানন্দবাবু যতীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও নির্ভীক চরিত্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করবেন, বাঙালী যে ভীরু নয় একথা প্রমাণ করবেন, এই ছিল যতীন্দ্রনাথের স্থির সংকল্প। সেকালে বাঙালীদের ইংরেজ সরকারের বা দেশীয় রাজ্যের সৈন্যদলে নেওয়া হতো না এই অজুহাতে যে বাঙালী যোদ্ধা-জাত নয়। প্রতাপাদিত্য ও চাঁদ রায়-কেদার রায়ের কার্যকলাপ এবং স্বদেশীযুগে নির্ভয়ে ফাঁসিমঞ্চে জীবন দান এই অপবাদের যথোচিত উত্তর কি দেয় নি? সেকথা যাক্। যতীন্দ্রনাথের সংকল্প ছিল যুদ্ধবিদ্যা শেখা। তিনি উত্তর প্রদেশের গ্রাম অঞ্চলের লোকদের হালচাল, কথাবার্তা নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করেন। নিজের নাম ভাঁড়িয়ে যতীন্দর উপাধ্যায় এই নাম গ্রহণ করেন; উত্তর প্রদেশের গ্রাম অঞ্চলের একজন অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-যুবক বলে নিজের পরিচয় দেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কোথাও সৈন্যদলে ভর্তি হতে পারলেন না। শেষে ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটা লোটা ও লম্বা লাঠি সম্বল করে যতীন্দ্রনাথ বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের বাসগৃহে উপস্থিত হন। শ্রীঅরবিন্দ যতীন্দ্রনাথের সাহস ও অধ্যবসায়ের পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন। বরোদা সরকারের সৈনিক বিভাগের উচ্চ কর্মচারী মাধবরাও যাদব ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের বন্ধু। শেষে শ্রীঅরবিন্দের অনুরোধে তিনি যতীন্দর উপাধ্যায়কে বরোদার অশ্বারোহী সৈন্যদলে ভর্তি করে নেন। কার্যদক্ষতাগুণে যতীন্দ্রনাথ গায়কোবাড়ের শরীর-রক্ষী দলে উন্নীত হন। যতীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে অন্য দেশে উপযুক্ত সুযোগ পেলে যতীন্দ্রনাথ একজন বীর বলে খ্যাত হতেন।

যতীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের চিঠি নিয়ে কলকাতায় আসেন; পরে বারীন্দ্রকুমার এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁরা কলকাতায় অনেক নূতন সমিতি গড়ে তোলেন। পুরানো সমিতির অনেক সভ্যও এই সব নতুন সমিতিতে যোগ

দেয়। কলকাতার কয়েকটি স্থানে লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, ঘোড়ায় চড়া শেখবার জন্য আখড়া স্থাপিত হয়। যুবকদের নিকট স্বাধীনতার বাণী প্রচারের ব্যবস্থাও হয়—ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডি প্রতাপসিংহ শিবাজী প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীরদের জীবনী আলোচিত হতো। কেবল তা-ই নয়, দেশের ইতিহাস, ইংরেজ শাসনে দেশের অর্থশোষণ ও তার ফলে ভারতবাসীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, ইংরেজ কর্তৃক সুচিন্তিত নীতি অনুসারে ভারতের বাণিজ্য-ধ্বংস প্রভৃতি ভারতের আর্থিক ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় প্রভৃতির আলোচনা হতো। উদ্দেশ্য দেশের ইতিহাস ও ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সুপরিচিত একদল যুবক "মিশনারী" বা প্রচারক সৃষ্টি করা। তাদের কাজ হবে দেশের কথা সর্বত্র দেশবাসীর নিকট প্রচার করা; এবং ভবিষ্যতে সরকারের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্র এবং বিরোধের জন্য প্রস্তুত যুবকদল সৃষ্টি করা। এই প্রচারের ভার নেন প্রথমে বারীন্দ্রকুমার; ক্রমে দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা), হেমচন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পর্কে বারীন্দ্রকুমারের মাতুল) প্রভৃতি অনেকে বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে যোগ দেন।

যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমার পি. মিত্র ও আরো কারো কারো কাছে তাঁদের কাজে সাহায্য পান। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দের আইরিশ শিষ্যা নিবেদিতা (Miss Margaret Elizabeth Noble)। ইংল্যাণ্ডে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে পরিচিত হবার পূর্বে নিবেদিতা ছিলেন একজন মহাবিদুষী শিক্ষাব্রতী এবং আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক। নিবেদিতা ছিলেন স্বাধীনতার উপাসিকা; এবং ভারতের স্বাধীনতাও তিনি মনে প্রাণে কামনা করতেন। একবার আমন্ত্রিত হয়ে বরোদায় গিয়ে নিবেদিতা কয়েকটি বক্তৃতা দেন। স্টেশনে নিবেদিতাকে অভ্যর্থনার ভার শ্রীঅরবিন্দের উপর অর্পিত হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা উভয়েই 'Kali the Mother' নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। একে অন্যের বই পড়ে খুশী হয়েছিলেন। বরোদায় নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে বলেছিলেন যে তিনি শুনেছেন শ্রীঅরবিন্দ "believed in strength and was a worshipper of Kali"। শ্রীঅরবিন্দ নিবেদিতার এই কথার অর্থ করেছেন এই বলে যে নিবেদিতা জানতে পেরেছেন শ্রীঅরবিন্দ একজন revolutionary অর্থাৎ বিপ্লব-পন্থী। বরোদায় শ্রীঅরবিন্দ ও নিবেদিতা

প্রসঙ্গে নানা ভুল কথার প্রচার হয়েছে। নিবেদিতার কাছে নাকি শ্রীঅরবিন্দ স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের বইখানার কথা প্রথম শোনেন এবং যোগের দিকে শ্রীঅরবিন্দ আকৃষ্ট হন। শ্রীঅরবিন্দের কথা "My relations with Sister Nivedita were purely in the field of politics. Spirituality or Spiritual matters did not enter into them. (Sri Aurobindo on Himself and on the Mother p.-115)। তবে একথা ঠিক যে বরোদায়ই সিস্‌টার নিবেদিতা ও শ্রীঅরবিন্দ পরস্পর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। স্বভাবতই যতীন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমার যখন বাংলায় গুপ্তসমিতি গঠন করেন তখন ভারতের স্বাধীনতাকামী নিবেদিতার কাছে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য পান। নিবেদিতা তাঁদের অনেক পুস্তক দিয়ে সাহায্য করেন, এবং সমিতিগুলির পরিচালনাভার যে সমিতির উপর অর্পিত ছিল নিবেদিতা সেই সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

গুপ্তসমিতির দ্রুত প্রসার হতে থাকে। কলকাতার যুবকেরা দলে দলে সমিতিতে যোগ দেয়; কেবল তা-ই নয়; বয়স্ক লোকেদের মধ্যেও অনেকের সমিতির প্রতি সহানুভূতি ছিল। শ্রীঅরবিন্দ পূজার ছুটিতে বরোদা থেকে বাংলায় এসে তাঁর সমিতির খোঁজখবর নিতেন। ১৯০২-১৯০৪ সনের মধ্যে পূজার সময় ব্যতীত অন্য সময়ও তিনি সমিতির কাজে দুবার বাংলায় আসেন; এবং একবার মেদিনীপুরে হেমচন্দ্র দাসের গৃহে সন্ধ্যাকালে গীতা ও অসি হাতে দিয়ে হেমচন্দ্রকে দীক্ষা দেন। হেমচন্দ্র বলেছেন শ্রীঅরবিন্দের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য শ্রীঅরবিন্দের প্রতি হেমচন্দ্রের ও মেদিনীপুরের অন্যান্য অনেক যুবকের ভক্তি ছিল অসীম।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের গুপ্তসমিতি দুই বছরের অধিক কাল স্থায়ী হলো না। সমিতির মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দলাদলি দেখা দিল। যতীন্দ্রনাথের মেজাজ নাকি ছিল একটু "জাদ্রেলী" ধরনের—সহকর্মীদের নাকি তিনি আমল দিতেন না। বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতিও যতীন্দ্রনাথের মেজাজ বরদাস্ত করবার লোক ছিলেন না। একে অন্যের বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিকট অভিযোগ করতে লাগলো। হন্তদন্ত হয়ে বরোদা থেকে শ্রীঅরবিন্দ এলেন তাঁর দলের বিরোধ মেটাবার জন্য। পি. মিত্র, সিস্‌টার নিবেদিতা প্রভৃতি পাঁচ ব্যক্তিকে নিয়ে এক পরিচালকসভা গঠিত হলো, এবং সমিতির পরিচালনাভার গ্রহণ করলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন ফল হলো না। শেষে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ

সমিতি থেকে বহিষ্কৃত হলেন। এরপর যতীন্দ্রনাথ ক্ষোভে সন্ন্যাস নিলেন এবং সমিতির সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক ছিন্ন হলো। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তিনি বিখ্যাত সোংহং স্বামীর সঙ্গে সাধনায় মগ্ন হলেন। সন্ন্যাস আশ্রমে তাঁর নাম হয়েছিল নিরালম্ব স্বামী। কিন্তু এরপরেও সমিতিকে রক্ষা করা সম্ভব হলো না। বাংলা দেশ তখনও বিপ্লবের জন্য, স্বাধীনতা-আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয়, এই মনে করে ১৯০৪ সনে অর্থাৎ সমিতি-প্রতিষ্ঠার দুবছর পরেই শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার বরোদায় ফিরে গেলেন। বরোদায় এই সময় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগ-সাধনা সুরু করেন ; এবং তিনি রইলেন তাঁর অধ্যাপনা ও যোগ-সাধনা নিয়ে। বারীন্দ্রকুমার দেশের ইতিহাস ও রাজনীতির চর্চায় ডুবে রইলেন। কীভাবে দুবছর পরে আবার শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গুপ্তসমিতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন সে কথা পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলায় শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব—লর্ড কার্জনের জিদ

১৯০৪ সনে দলাদলির ফলে শ্রীঅরবিন্দের প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসমিতি ভেঙ্গে যায়। শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমারের মনে হলো বাংলাদেশ স্বাধীনতা-আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত নয়। কিন্তু এক বছর পরই ১৯০৫ সনে বাংলায় এমন এক পরিস্থিতি দেখা দিল যার ফলে বাংলাই হয়ে উঠল স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। ঝুনো সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন তখন ভারতের বড়লাট। তিনি লক্ষ্য করলেন ভারতের, বিশেষভাবে বাংলাদেশের শিক্ষিত লোকদের মনে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দিন দিন বেড়ে উঠছে। তাঁর মনে হলো 'discontented B. A's অর্থাৎ ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরাই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শান্তির পক্ষে প্রধান বিঘ্ন। তাই উচ্চশিক্ষার প্রসার রোধ করা হলো তাঁর লক্ষ্য। আর তিনি ইহাও লক্ষ্য করেছিলেন যে সেযুগে কী শিক্ষায়, কী রাজনৈতিক চেতনায় বাঙালীই ছিল ভারতে অগ্রগামী। আজ বাঙালী ভারতে তার শ্রেষ্ঠত্বের আসন হারিয়েছে সত্য, কিন্তু সেকালে বাঙালীই ছিল ভারতের চিন্তানায়ক। মারাঠী নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি: "What Bengal thinks to-day, India will be thinking to-morrow week." "বাঙালী আজ যা চিন্তা করে এক সপ্তাহ পরে সমস্ত ভারতবাসী তাই চিন্তা করে।" লর্ড কার্জন বাঙালী জাতির ঐক্য নাশ করে বাঙালীকে শক্তিহীন করতে চাইলেন। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করা হোক্—পূর্ববাংলা আসামের সঙ্গে যুক্ত হোক্, আর পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ হোক্। লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের অজুহাত হলো শাসনকার্যের সুবিধা; তাঁর আসল উদ্দেশ্য পূর্ববঙ্গে হিন্দু-বিরোধী একটি মুসলমান রাজ্য সৃষ্টি করে বাঙালীর ঐক্য-নাশ ও শক্তিনাশ।

বাঙালী লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের ঘোর প্রতিবাদ করে। প্রথম বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব করা হয় ১৯০৩ সনে। ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ

কংগ্রেসের সভাপতি লালমোহন ঘোষ মশাই বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পরের বছর বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন আসামের ইংরেজ শাসনকর্তা ভারতহিতৈষী Sir Henry Cotton. তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন বাংলার জনমত উপেক্ষা করে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতা ও অবিবেচনার কাজ হবে। দিন যেতে লাগলো, এদিকে গভর্নমেণ্ট একেবারে চুপ; দেশের লোক ভাবলো তবে বুঝি গভর্নমেণ্ট দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর বলে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব ত্যাগ করেছে। কিন্তু নিজের জিদ ত্যাগ করা কিংবা বাঙালীকে শক্তিহীন করার সাধু সংকল্প ত্যাগ করা, কোনটাই লর্ড কার্জনের মনঃপূত হলো না। ১৯০৫ সনের জুলাই মাসে বিলাতের গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করলে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছে। শুনে বাঙালীর রোষের ও অসন্তোষের সীমা রইল না। বঙ্গ-ভঙ্গ মেনে নেওয়া হবে না, এই হলো বাঙালীর স্থির সিদ্ধান্ত। বাঙালী কবি গাইলেন :

বিধির বাঁধন ভাঙবে তুমি, তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙা-গড়া তোমার হাতে, তোমার এমনি অভিমান।

গভর্নমেণ্টের জুলাই ঘোষণার দিন কয়েকের মধ্যেই অর্থাৎ বঙ্গদেশ আইনত দ্বিখণ্ডিত হবার পূর্বেই ১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট কলকাতার টাউন হলে এক বিরাট সভায় বিলাতি পণ্য বর্জন করার অর্থাৎ বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশের সর্বত্র স্থানে স্থানে জনসভায় বাঙালী বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরে এই বয়কট প্রস্তাব প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট বাঙালীর জীবনে এক নতুন চেতনার জন্ম হয়, বাঙালী যেন দেড়শত বছরের ঘুম-ঘোর থেকে জেগে ওঠে।" ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয়—পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার-উড়িষ্যা দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়। বাঙালী এই ১৬ই অক্টোবর দিবসটি জাতির শোক-দিবস হিসাবে পালন করে। সেদিন বাঙালীর ঘরে ঘরে অরন্ধন। আর একটি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে বঙ্গ-ভঙ্গ যে বাঙালী মেনে নেবে না এই সংকল্প ব্যক্ত করে। আমাদের দেশে রাখি-বন্ধন প্রথাটি সুপ্রাচীন ও সুন্দর প্রথা। প্রথাটি ভ্রাতৃত্ব-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রতীক। কেউ কারো হাতে রাখি বাঁধলে তার অর্থ হয় এই যে তাদের দুজনের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপিত হলো, তারা

দুজন ভাই ভাই হলো। ১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর দিবসটি বাঙালী রাখিবন্ধন-দিবস রূপে পালন করলো। ঐদিন স্নানান্তে বাঙালী একে অন্যের হাতে রাখি বেঁধে এই কথাটাই ব্যক্ত করতে চাইলো যে গভর্নমেণ্ট বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করলেও সকল বাঙালী এক, সকল বাঙালী ভাই ভাই।

লর্ড কার্জন বাঙালী বা ভারতীয়দের হিতৈষী ছিলেন না কিন্তু তিনি ভারতের হিতকারী হলেন, ভারতের মহা উপকার করে গেলেন।' বাংলার ঐক্যবোধের জন্য বাঙালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর নতুন জাতীয় চেতনা উন্মেষের জন্য, লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় একটা প্রচণ্ড আঘাতের প্রয়োজন ছিল। ঐ আঘাতের ফলে বাংলায় দেশপ্রেমের বন্যা বয়ে গেল; এবং তার ঢেউ সর্বভারতে প্রসারিত হতেও বিলম্ব হলো না। বরোদায় থেকে শ্রীঅরবিন্দ বুঝলেন লর্ড কার্জনের আঘাত বাঙালীর পক্ষে শাপে বর হবে, এবং এইবার বাঙালী স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিপুল সাড়া দেবে। তিনি তাঁর কলকাতার অনুচরদের—হেমচন্দ্র কানুনগো, দেবব্রত বসু প্রভৃতিকে, নতুন উৎসাহে আবার কাজে প্রবৃত্ত হতে বললেন। নিজে বরোদা ত্যাগের পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ গুপ্তসমিতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও পত্রিকা প্রকাশ করে দেশবাসীর নিকট স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য বারীন্দ্রকুমারকে কলকাতায় পাঠালেন। ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে বা তার কাছাকাছি কোন সময় বারীন্দ্রকুমার বাংলায় এসে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশ করেন। বারীন্দ্রকুমারের বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন যুগান্তর পত্রিকা সম্পাদনায় বারীন্দ্রকুমারের যোগ্য সহযোগী। আর শ্রীঅরবিন্দও বুঝলেন বাংলাই হবে স্বাধীনতা-আন্দোলনের কেন্দ্র এবং বাংলাই এখন তাঁর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র। তিনি বরোদার চাকরি ছেড়ে কলকাতায়ই তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থাপন করা স্থির করলেন।

'No Compromise' ও ভবানী-মন্দির

শ্রীঅরবিন্দের রচিত 'ভবানী-মন্দির' পুস্তিকার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বরোদায় তিনি ঐ পুস্তিকাখানা লেখেন। ১৯০৫ সনের শেষভাগে, বরোদা ত্যাগের অল্প আগে শ্রীঅরবিন্দ 'No Compromise' নামে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকাও লেখেন। No Compromise কথাটির অর্থ আপসহীন প্রতিবাদ। এই পুস্তিকায় "জাগ্রত বাংলার বিরুদ্ধে লর্ড কার্জনের জঘন্য ষড়যন্ত্রের স্বরূপটি শ্রীঅরবিন্দ জাতির চক্ষে খুলে ধরেছিলেন।" বাঙালী যেন বঙ্গ-ভঙ্গ মেনে না

নেয় ঐ পুস্তিকায় শ্রীঅরবিন্দ এই মত দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন। পুস্তকখানা ছিল বেনামী। গভর্নমেণ্টের নির্যাতনের ভয়ে কোন ছাপাখানাই পুস্তকখানা ছাপাতে রাজী হলো না। শেষে অনেক আয়াসে ১৯০৬ সনের প্রথম ভাগে বারীন্দ্রকুমার কলকাতায় পুস্তকখানা ছাপাতে সক্ষম হন। কলকাতার গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা প্রেসে—অবশ্য প্রেসের কর্তাদের অনুমতি নিয়ে—গোপনে গভীর রাত্রে পুস্তকখানা ছেপে ফেলা হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট পুস্তকের কপি প্রেরিত হয়। সেকালে প্রসিদ্ধ 'Bengalee' পত্রিকার সম্পাদক বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ছিলেন—বাংলার 'মুকুটহীন রাজা' অর্থাৎ বাংলাদেশে তাঁর প্রভাব ছিল অসামান্য। বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর সহযোগী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য Bengalee অফিসে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা সুরেন্দ্রবাবুকে 'No Compromise'-এর একখানা কপি দিয়ে পুস্তকখানা একটু দেখতে অনুরোধ করেন। কত পুস্তকই তো সাংবাদিকের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হয়ে থাকে, কর্মব্যস্ত সম্পাদকের পক্ষে তা সব সময় কী দেখা সম্ভব? এবং এই পুস্তকখানার মধ্যেও হয়ত অসাধারণ কিছু নেই তাই তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন, এই ভেবে সুরেন্দ্রনাথ বারীন্দ্রকুমারদের পুস্তকখানা রেখে যেতে বলেন। শেষে বারীন্দ্রকুমারের বিশেষ অনুরোধে পুস্তকখানা একটু উল্টিয়ে দেখবেন বলে সুরেন্দ্রনাথ পুস্তকখানা পড়তে সুরু করেন। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করে পুস্তকখানা শেষ পর্যন্ত না পড়ে সুরেন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হতে পারলেন না। সুরেন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন ইংরেজী ভাষায় সুলেখক ও সুবক্তা এবং ইংরেজী সাহিত্যের নামজাদা অধ্যাপক। পুস্তকের ভাষা, লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় ও অকাট্যযুক্তির বহর সুরেন্দ্রনাথকে একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত করে। তিনি বললেন কোন বাঙালীর পক্ষে ঐরূপ ইংরেজী লেখা সম্ভব নয়। তিনি লেখকের নাম জানতে চাইলেন। যখন শুনলেন লেখক অরবিন্দ ঘোষ, তখন তিনি বললেন "হাঁ। তিনিই কেবল এমন পুস্তক লিখতে পারেন।" এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে। স্বদেশীযুগে বর্তমান পুস্তকের লেখক ছিলেন রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজের) ছাত্র। সেই সময় লেখক দেখেছেন, শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধ লিখতেন তা সুরেন্দ্রনাথ ও কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকদের বিস্মিত করতো। সুরেন্দ্রনাথ বলতেন "দৈনিক বন্দেমাতরম্"-এ যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তা এতই চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্যের

পরিচায়ক যে উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার "ধীরে সুস্থে" লেখা প্রবন্ধের সঙ্গেই কেবল তার তুলনা হতে পারে ; দিনের পর দিন ঐরূপ বের করা এক বিস্ময়কর ব্যাপার।"

এখানে 'ভবানী-মন্দির' পুস্তকখানার বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ এবং ভবিষ্যতে ভারতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর করবার জন্য গভর্নমেণ্টের পক্ষে কী করা দরকার সেই বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য বিলাতের এক জজ্ রাউলাট সাহেবের সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। এই রাউলাট কমিটি ভবানী-মন্দির পুস্তকখানাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। এই পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভ করতে হলে শক্তির সাধনাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য-ব্রত নিয়ে বিশ্বজননী ভবানীর পূজা দ্বারা কী করে স্বাধীনতা লাভ করতে হবে, শ্রীঅরবিন্দ এই পুস্তকে তা দেখিয়েছেন। স্মরণ রাখতে হবে মারাঠা জাতির স্বাধীনতার স্রষ্টা শিবাজীও ছিলেন ভবানীর উপাসক ; আর শ্রীঅরবিন্দ "ধর্ম ও জাতীয়তা" নামক পুস্তকে বলেছেন, "প্রায়ই যাঁহারা জাতি-রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায় প্রভৃতি সকলেই শক্তি-উপাসক বা তান্ত্রিক-যোগীর শিষ্য ছিলেন।" আনন্দমঠের সন্তানদের ন্যায় দেশসেবার জন্য একদল সর্বত্যাগী যুবক তৈয়ার করার কথাই ভবানী-মন্দিরে বলা হয়েছিল। যুবকেরা দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য।

বরিশাল কন্‌ফারেন্স

১৯০৬ সনের মার্চ মাসে বরোদা কলেজের গ্রীষ্মের ছুটির সময় শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় এলেন। এপ্রিল মাসের ১৪ই তারিখে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স আহূত হয়েছিল। বরিশালের ঐ কন্‌ফারেন্সটি বিশেষ স্মরণীয়। বাংলাদেশে তখন মহা উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল—বাঙালী যেন তখন দেশপ্রেমে একেবারে মাতোয়ারা। দেশপ্রেমের মন্ত্র বন্দেমাতরম্। সকলের মুখেই বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্ মন্ত্র বাঙালীর জীবনে যেন এক নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল। সভাসমিতিতে, ধর্মকর্মের স্থলে, এমন কি শ্মশান-যাত্রায়ও শোনা যেত বন্দেমাতরম্। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের প্রভাব দেখে ফুলার সাহেবের পূর্ববঙ্গ গভর্নমেণ্ট ইতিপূর্বেই প্রকাশ্যে পথেঘাটে বন্দেমাতরম্-ধ্বনি নিষিদ্ধ করেছিল। বিনা অনুমতিতে সভাসমিতি করাও ছিল নিষিদ্ধ। এদিকে দেশে তখন

বিলাতী ও বিদেশী লবণ, কাপড় ও চিনির বয়কট পুরোদমে চলছিল; এবং বরিশালে বয়কট আন্দোলন আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছিল। তার মূলে ছিল বরিশালের জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত মশায়ের প্রভাব। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বরিশাল ছিল "স্বদেশীর পীঠস্থান।" এই পরিবেশের মধ্যে এপ্রিল মাসে বরিশালের কনফারেন্স আহূত হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই কনফারেন্সে যোগ দেন।

নেতারা স্থির করেছিলেন বিনা অনুমতিতে সভা করার আদেশ অগ্রাহ্য করা হবে, ফল যা-ই হোক্; অর্থাৎ প্রয়োজন হলে নির্যাতন সহ্য করতে হবে। সভাপতির মিছিল সভামণ্ডপের দিকে চলেছে। মিছিলের পুরোভাগে রয়েছেন স্থরেন্দ্রনাথ, অমৃতবাজারের মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ। শ্রীঅরবিন্দও তাঁদের মধ্যে ছিলেন। নেতাদের পুলিস বিনা বাধায় যেতে দেয়। নেতাদের পেছনে আসছিলেন কলকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের ডেলিগেটগণ (প্রতিনিধিগণ) ও স্বেচ্ছাসেবকগণ। পুলিস তখন বিনা অপরাধে রেগুলেশন লাঠি দিয়ে ডেলিগেট ও স্বেচ্ছাসেবকদের প্রহার করতে স্থরু করে। কয়েকজন ডেলিগেট আহত হন। স্বেচ্ছাসেবকদের উপরই অত্যাচার বেশী। তারাও যথেষ্ট সাহস এবং ধৈর্যের পরিচয় দেয়। সেকালের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের সহযোগী মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র বালক চিত্তরঞ্জন বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। পুলিসের আঘাতে জর্জরিত হয়েও রক্তাক্ত দেহে বালক চিত্তরঞ্জন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করতে বিরত হলেন না। সংবাদ পেয়ে নেতারা ব্যস্ত হয়ে সভামণ্ডপ ছেড়ে বেরিয়ে এসে এই দৃশ্য দেখলেন।

গোলমাল থামলে সভার কাজ আরম্ভ হয়। সভাপতি ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার আবদুর রসুল। পুলিস সভাপতির কাছে প্রতিশ্রুতি চায় সভাশেষে পথে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি না করার। সভাপতি ঐরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন। তখন পুলিস জোর করে সভা ভেঙ্গে দেয়। শ্রীঅরবিন্দের মেসো সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মশাই পুলিসের এই জুলুমের কাছে মাথা নত করতে রাজী না হয়ে বলেছিলেন, পুলিস যদি গুলি চালায় চালাক্, তিনি সভামণ্ডপ ত্যাগ করবেন না। নেতারা অনেক অনুরোধ করে শেষে তাঁকে সভা ত্যাগ করতে রাজী করান। সভাভঙ্গের পূর্বে সেকালের অন্যতম নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু মশাই বললেন, "আজ থেকে ভারতে ইংরেজ-শাসনের অবসানের সূচনা হলো।" বাংলার স্বদেশী আন্দোলন

ভারতের স্বাধীনতা-অর্জনের এবং ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সূচনা যে করেছিলেন তাতে সন্দেহ কী ?

বরিশালে কনফারেন্সের পর শ্রীঅরবিন্দ প্রসিদ্ধ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মশাইয়ের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ সফরে যান। দেশের অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া ছিল শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্য। তারপর দিনকয়েকের জন্য শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় ফিরে যান, এবং ১৯০৬ সনের ১২ই জুন থেকে ১৯০৭ সনের ১১ই জুন পর্যন্ত বিনা বেতনে একবছরের ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন। কলকাতায়ই তাঁর স্থায়িভাবে থাকবার ব্যবস্থা হয়। পরবর্তী চার বছর কাল কলকাতাই ছিল তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র। এখন থেকে তিনি স্বাধীনতা-আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। তবে আড়াল থেকে কাজ করাই তিনি পছন্দ করতেন ; অন্যকে সম্মুখে রেখে কাজ করতেন, নিজে নেতৃত্ব করতেন না।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ

প্রধানত বাংলার ছাত্রগণের উৎসাহেই বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সফল হয় ; ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের কলওয়ালাদের অবস্থা কাহিল হয়। ইংরেজের পকেটে হাত পড়াতে ভারত গভর্নমেণ্টের টনক নড়ে ; এবং গভর্নমেণ্ট রাজনৈতিক সভাসমিতিতে ছাত্রদের যোগদান নিষিদ্ধ করে 'সার্কুলার জারী' করে। জাতীয় আন্দোলনের ঐ উত্তেজনার ক্ষণে বহু স্কুল ও কলেজের ছাত্র এই নিষেধ অমান্য করে, ফলে তারা স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়। বিদেশী সরকারের দায় তো কেবল দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, বিতাড়িত ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা ভাবা তারা প্রয়োজন মনে করল না ; কিন্তু দেশের নেতারা ঐ সব ছাত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন হলেন। স্কুল কলেজ থেকে বিতাড়িত ছাত্রদের শিক্ষার কী ব্যবস্থা হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনার জন্য ১৯০৫ সনের ৯ই নভেম্বর কলকাতায় এক বিরাট সভা হয়। সভায় সভাপতি হন স্বনামধন্য জাতীয়বাদী নেতা জমিদার সুবোধচন্দ্র মল্লিক মশাই। সভায় এক জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সুবোধবাবু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ১ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় মহা উৎসাহের সঞ্চার হয়। সুবোধবাবুর এই রাজোচিত দানের জন্য দেশের লোক তাঁকে "রাজা" উপাধি দেয়, এবং এর পর থেকে সরকারের দেওয়া রাজা খেতাব না থাকলেও তিনি রাজা সুবোধ মল্লিক নামেই পরিচিত হন। বরোদা থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বর্গীয় চারুচন্দ্র দত্ত মশায়ের বাসগৃহে মাঝে মাঝে যেতেন।

দত্ত মশাই ছিলেন একজন উচ্চ সরকারী কর্মচারী—জেলার জজ। তিনি ছিলেন "রাজা" সুবোধচন্দ্র মল্লিকের ভগ্নীপতি ; এবং দত্ত মশায়ের গৃহে সুবোধ মল্লিকের সহিত শ্রীঅরবিন্দের প্রথম পরিচয় হয়। শ্রীঅরবিন্দের পাণ্ডিত্য ও স্বদেশপ্রীতি সুবোধবাবুকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিনি ক্রমে শ্রীঅরবিন্দের একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং দেশের কাজে তাঁর সহযোগী হয়ে ওঠেন। সুবোধবাবুর অভিপ্রায় ছিল শ্রীঅরবিন্দকে বরোদা থেকে কলকাতায় আনা এবং বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত করা।

১৯০৬ সনের ১১ই মার্চ তারিখে বাংলার জননায়কেরা কলকাতায় Land-Holders' Association বা "জমিদারী সভা"র গৃহে সমবেত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করেন। পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলার জমিদারদের কেউ কেউ অকুণ্ঠিতভাবে অর্থসাহায্য করেছিলেন। রাজা সুবোধ মল্লিকের দানের কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। আর যে দুজন জমিদারের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মশাই ও মুক্তাগাছার স্বনামধন্য মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী। ব্রজেন্দ্রবাবু পাঁচ লক্ষ টাকা আর মহারাজা সূর্যকান্ত নগদ আড়াই লক্ষ ও একখানা জমিদারি শিক্ষা-পরিষৎকে দান করে দেশের লোকের অশেষ প্রশংসা অর্জন করেন।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ যে কেবল দেশের লোকের শুভকামনা আর জমিদার ও ধনীদের নিকট অর্থ সাহায্য করেছিল তা নয় ; বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিও বিপুল ত্যাগ-স্বীকার করে শিক্ষা-পরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম উল্লেখ করতে হয় শ্রীঅরবিন্দের। শ্রীঅরবিন্দ ৭৫০৲ টাকা বেতনের বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে মাত্র ১৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দের পরেই যে ত্যাগী কর্মীর নাম করতে হয় তিনি ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ Dawn Society-র প্রতিষ্ঠাতা ও Dawn পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মশাই। এই চিরকুমার ত্যাগীপুরুষ ছিলেন একজন আদর্শ চরিত্র শিক্ষক। বাঙালী যুবকদের হিতসাধনকেই তিনি তাঁর জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন ; এবং শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তাঁর Dawn Society ও Dawn পত্রিকার দ্বারা বাংলার বহু যুবক বিশেষ উপকৃত হয়েছিল। শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পর মুখোপাধ্যায় মশাই পরিষদের কাজে সম্পূর্ণভাবে

আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে পরিষদের পরিচালনা ব্যাপারে তাঁকেই প্রধান অংশ গ্রহণ করতে হয়। পরিষদের অন্য কর্মীদের মধ্যে বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার প্রমুখ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও পরবর্তীকালের যশস্বী লেখকগণ পরিষদের ছাত্রদের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর এইসব সহকর্মী ছাত্রদের সম্মুখে ত্যাগের ও মহান-চরিত্রের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

বিপুল উৎসাহের মধ্যে জাতীয় পরিষদের কাজ আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাংলার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বহু জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। ছাত্রসংখ্যাও প্রথমে বহু ছিল। ক্রমে আদর্শ নিয়ে মতভেদ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে রাতারাতি একটা বড় গাছ জন্মান যায় না—গাছকে তার স্বাভাবিক নিয়মে ছোট থেকে বড় হতে দিতে হয়। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের কর্তৃপক্ষ রাতারাতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনুরূপ একটা সর্ব-অঙ্গ-সম্পন্ন বৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়বার চেষ্টা করে ভুল করলেন। তার প্রমাণ এই যে কিছুকাল পরেই কলকাতার বাইরের জাতীয় বিদ্যালয়গুলি একে একে লোপ পেতে লাগল। দেশের অন্তরের সঙ্গে যদি এই বিদ্যালয়গুলির সত্যিকার যোগ থাকত এবং তাদের দ্বারা যদি দেশের প্রকৃত কোন প্রয়োজন সাধিত হতো তবে গভর্নমেণ্টের বিরূপ দৃষ্টি বা অন্য কোন বাধাই তাদের অস্তিত্ব লোপ করতে পারত না। ছাত্রাভাবে কলকাতার মূল প্রতিষ্ঠানটির 'কলাবিভাগ' (Arts Department) উঠে গেল; কিন্তু বিজ্ঞান বিভাগটি অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি বিভাগটি টিকে রইল—কারণ তা দেশের একটি সত্যকার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। ঐ বিভাগের অধ্যাপকগণ—তাদের অনেকেই পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র—বিদেশে বিজ্ঞানে ও ফলিত বিজ্ঞানে উচ্চতম শিক্ষা লাভ করে পরিষদের অবশিষ্ট এই বিভাগটিকে যথার্থ ই সফল করে তোলেন। সর্বভারতে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। পরে স্বাধীন ভারত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের এই বিভাগটিকে প্রথমে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃতি নেয়। শেষে ভারত সরকার কয়েক বছর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন; জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ দেশে এক গৌরবময় স্থান লাভ করেছে; বোধহয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের কল্পনারও অতীত ছিল। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রথম অবস্থায়

যাঁরা শিক্ষা-পরিষৎ গড়ে তোলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের অবদান সামান্য ছিল না। সেকালে যেসব ছাত্র পরিষদে যোগ দেয় তাদের অনেকেই যে শ্রীঅরবিন্দের চরিত্র-মাহাত্ম্য এবং গভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল সেকথা সত্য। কিন্তু মাত্র এক বৎসর কাল শ্রীঅরবিন্দ পরিষদের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর কেন তিনি পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তা বুঝতে হলে কলকাতায় তাঁর অন্যান্য কার্যকলাপের কথা জানতে হবে।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকা

আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থার প্রথম ধাপ ছিল গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করে দেশের যুবকদের সংঘবদ্ধ করা। আর শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থার দ্বিতীয় ধাপ ছিল পত্রিকা প্রকাশ করে দেশের জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগান ও তাদের মনের ভয় ভাঙান। ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে বারীন্দ্রকুমার বরোদা থেকে কলকাতায় আসেন। কলকাতায় এসে বারীন্দ্রকুমার দ্বিতীয়বার গুপ্তসমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং যুগান্তর নামক একখানা বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করে খোলাখুলিভাবে স্বাধীনতার বাণী, গ্যারিলা-যুদ্ধের নিয়ম-কানুন প্রভৃতি প্রচার করতে থাকেন। যুগান্তরে শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি প্রবন্ধ নাকি বের হয়। অল্প পরেই শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা এসে ইংরেজী পত্রিকার সাহায্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের পূর্ণ সুযোগ লাভ করেন। ১৯০৬ সনের আগস্ট মাসে, অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা আসার অল্প পরেই প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল মশাই বন্দেমাতরম্ নামক একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক বের করেন এবং ঐ পত্রিকা পরিচালনায় শ্রীঅরবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করেন। শ্রীঅরবিন্দও রাজী হন।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বিপিনবাবুর জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা দরকার। এক সময় তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য হিসেবে এবং ব্রাহ্ম সমাজেরই Comparative Religion বা তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা। তিনি বিলাতে, আমেরিকায় ভারতের ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। কথিত আছে আমেরিকায় তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয় তার ফলে বিপিনবাবুর আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। আমেরিকায় একদিন বক্তৃতা-অন্তে আমেরিকার এক ভদ্রলোক নাকি তাঁর করমর্দন করে তাঁকে বলেন যে যতদিন না ভারত পরাধীনতার পাশ কাটিয়ে জগতের উন্নত দেশগুলির মধ্যে সম্মানের আসন লাভ

করবে, :ততদিন সভ্যদেশে ভারতের ধর্মের বাণী কেউ গ্রহণযোগ্য মনে করবে না। কথাগুলি বিপিনচন্দ্রের মর্ম স্পর্শ করে এবং পরাধীনতার গ্লানি তিনি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেন। তিনি বুঝলেন বিদেশে ভারতের ধর্মপ্রচার অপেক্ষা দেশে জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারের প্রয়োজন অধিক। তাই দেশে ফিরে ১৯০২ সনে তিনি New India নামক একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। পত্রিকাখানা ১৯০৭ সন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর ঐ পত্রিকায় তিনি কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র প্রতিবাদ করতেন এবং আত্মনির্ভরতা ও জাতীয়তাবাদ প্রচার ছিল তাঁর লক্ষ্য।

কিছুকাল পরে স্বদেশীযুগে দেশে এল বন্দেমাতরম্ মন্ত্র ও দেশপ্রেমের বন্যা। বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর সহযোগীদের 'যুগান্তর' আর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' নামক পত্রিকা দুটি বাংলায় এবং বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা ইংরেজীতে প্রচার করতে লাগল যে স্বাধীনতাই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য। অল্পদিন পরেই বন্দেমাতরম্ পত্রিকাটি 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও নীরদচন্দ্র মল্লিকের অর্থসাহায্যে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বন্দেমাতরম্ তখন থেকে দৈনিকরূপে বের হতে থাকে। বিপিনবাবু রইলেন সম্পাদক আর শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন পত্রিকার একজন প্রধান প্রবন্ধ-লেখক। শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত আরো কয়েকজন সুলেখক বন্দেমাতরম্ সম্পাদক-সংঘে যোগ দেন; তাঁরা হলেন পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ব্যারিস্টার বিজয়চন্দ্র চ্যাটার্জি (বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার সুযোগ্য কৌন্সিলী বি. সি. চ্যাটার্জি) ও বাংলার সুপরিচিত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মশাই।

কী উদ্দেশ্য নিয়ে বন্দেমাতরম্ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তা জানা যায় পত্রিকার বর্ষপূর্তি দিবসে লিখিত শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রবন্ধ থেকে। ঐ প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছিলেন তার মর্ম এই—দেশের এক সংকট মুহূর্তে দেশের একান্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। দেশবাসীর নিকট বন্দেমাতরম্ পত্রিকা একটি নতুন পথের সন্ধান দিতে চায়—কোন বাধাই তাকে একাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। বন্দেমাতরম্ পত্রিকার দাবি যে ঐ পত্রিকা দেশবাসীর প্রকৃত আশা ও আকাঙ্ক্ষাকেই ভাষা দিয়েছে।

পত্রিকা প্রকাশের কয়েকমাস পরে পত্রিকা পরিচালনা ব্যাপারে আর পত্রিকার Policy বা লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় বিপিনচন্দ্র সম্পাদক-পদ

ত্যাগ করেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন অসুস্থ এবং শ্রীঅরবিন্দ চান নি যে বিপিনচন্দ্র পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের অগোচরেই বন্দেমাতরমের পরিচালক ও সংঘ কর্তৃক বিপিনচন্দ্রের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় এবং পরদিন পত্রিকার সম্পাদকরূপে শ্রীঅরবিন্দের নামও বের হয়। শ্রীঅরবিন্দ তখনও বরোদা কলেজ থেকে পদত্যাগ করেন নি, বিনাবেতনে ছুটি নিয়েছেন মাত্র। বিশেষত তিনি কোন প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণ না করে আড়াল থেকেই কাজ করাই পছন্দ করতেন। তাই তিনি বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছেন, এই মর্মের বিজ্ঞপ্তি তাঁর বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়; এবং তাঁর নির্দেশে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁর নাম আর দ্বিতীয়বার বের হতে পারে নি। তবে একথা কারো অজ্ঞাত ছিল না যে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বন্দেমাতরম্ পত্রিকার প্রকৃত কর্ণধার।

এই সময় শ্রীঅরবিন্দ বাংলার যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন প্রাণসঞ্চার করেন। কিছুদিন যাবত কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে অনেকে, বিশেষত যুবক-সম্প্রদায়ের অনেকে, কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের কর্মপন্থার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁরা একটি সুসম্বদ্ধ দলরূপে গড়ে ওঠেন নি; বিচ্ছিন্নভাবে তাঁরা নেতাদের বিরোধিতা করতেন। কলকাতা এসে শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রথম ও প্রধান কাজ হলো দেশের যুবকদের সংঘবদ্ধ করা। তিনি কলকাতার যুবকদের এক সভায় আহ্বান করেন এবং এই পরামর্শ দেন যে তাঁদের উচিত একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করা এবং মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদীদের সহযোগে ও তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই কংগ্রেসের প্রবীণ নেতাদের বিরোধিতা করা। বাংলার যুবকগণ উৎসাহের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বন্দেমাতরম্ পত্রিকা তাঁদের দলের মুখপাত্র হিসেবে গৃহীত হয়।

বন্দেমাতরমের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে, এই দেখে পত্রিকার পরিচালক-সংঘ ১৯০৭ সনের ২রা জুন তারিখ থেকে বন্দেমাতরমের একটি সাপ্তাহিক সংস্করণ বের করতে থাকেন। এই সাপ্তাহিক সংস্করণে বন্দেমাতরমের মূল প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হওয়ায় সর্বভারত বন্দেমাতরমের বাণীর সঙ্গে পরিচিত হয়। ফলে ভারতের সর্বত্র বন্দেমাতরম্ একটি প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, আর স্বভাবতই বন্দেমাতরম্ পত্রিকা গভর্নমেন্টের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে।

নরম-গরম দল

ইতিমধ্যে দেশে রাজনীতির লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নিয়ে দুই দল দেখা দিয়েছে। একদলকে বলা হতো মডারেট বা নরম দল ; গরম দল বা জাতীয়তাবাদী বা ন্যাশানেলিস্ট বলে অপর দল পরিচিত হয়। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইয়ের ফিরোজ শা মেহতা, পুণার গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি কংগ্রেসের প্রাচীন সেবকগণ ছিলেন মডারেট দলের বিশিষ্ট লোক। পুণার বালগঙ্গাধর তিলক, পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন জাতীয়তাবাদীদের নেতা। অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ তখনও প্রকাশ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি। দুই দলের মধ্যে মতভেদ ছিল বিপুল। প্রথমে মডারেটগণের লক্ষ্য ছিল দেশের শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার-সাধন—ছোটখাট রাজনৈতিক অধিকার লাভ। পরে তাঁরা ক্যানেডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশের লোকেরা যে প্রকার স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে তাকেই তাঁদের চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। স্মরণ রাখতে হবে বিশ শতকের প্রথম দশকে ক্যানেডা প্রভৃতি উপনিবেশ যে স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতো, তা ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশকে Statute of West Minister পাস হবার পর সেই স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অনেক প্রসার হয়—উপনিবেশগুলি কার্যত স্বাধীন হয়। কিন্তু আমরা এখন বিশ শতকের প্রথম দশকের কথা বলছি। তখন ভারতের মডারেট নেতাগণ—সেই সময়ে প্রচলিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকেই তাঁদের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার চরম আদর্শ বলে গ্রহণ করতেন। অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদীগণ মডারেটদের ন্যায় শাসন-সংস্কার, কিংবা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন না। তাঁরা শুধু শাসন-সংস্কার চান না, তাঁরা চান দেশের শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন—আমুল পরিবর্তন অর্থাৎ দেশের শাসন-ব্যবস্থার উপর পুর্ণ কর্তৃত্ব। শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মারফত দেশের লোকের কাছে পুর্ণ স্বাধীনতার বাণীই প্রচার করতেন। দ্বিতীয়ত মডারেটদের কর্মপন্থা ছিল বৈধ আন্দোলন, অর্থাৎ আইন ভঙ্গ না করে গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন। ইংরেজ সরকারের ন্যায়-পরায়ণতায় এবং আবেদন-নিবেদনের সার্থকতায় মডারেটদের আস্থা ছিল অসীম। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের কতকগুলি প্রবন্ধের লক্ষ্যই ছিল মডারেটদের এই আস্থা যে ভ্রান্ত তা প্রতিপন্ন করা। অপরদিকে জাতীয়তা-বাদীগণ বৈধ আন্দোলনের মধ্যেই তাঁদের কর্মপন্থা সীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন না।

প্রয়োজন হলে আইন ভঙ্গ করাই উচিত, এই ছিল জাতীয়তাবাদীদের মত—যথা বিদেশী সরকার যদি স্বাধীনতালাভের বিঘ্নস্বরূপ কোন আইন প্রণয়ন করে সে ক্ষেত্রে বিবেকের অনুরোধে সেই আইন ভঙ্গ করাই উচিত। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা বক্তৃতায়, বিশেষভাবে দেশবাসীর নিকট তাঁর খোলা চিঠিতে জাতীয়তাবাদীদের কর্মপন্থা বিবৃত করেছেন। (শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত খোলা চিঠিখানার আলোচনা এই অধ্যায়ের সপ্তম পরিচ্ছেদে করা হবে।) এই খোলা চিঠিতে জাতীয়তাবাদীদের কর্মপন্থার বৈশিষ্ট্য হিসাবে Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় অহিংস প্রতিরোধ কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠক তার ব্যাখ্যা যথাস্থানে পাবেন। মোট কথা রাজনৈতিক আদর্শ আর কর্মপন্থা দুই দলের ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং শেষে দেশ মডারেটদের আদর্শ ও কর্মপন্থার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠে; কিন্তু সে অনেক পরের কথা। দেশকে নিজেদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে জাতীয়তাবাদীদের অনেক দুঃখ বরণ করতে হয়েছিল।

কলকাতা কংগ্রেস—চারটি দাবি

১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসের কলকাতা কংগ্রেস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আগের বছর বেনারস কংগ্রেসেই বোঝা গিয়েছিল কংগ্রেসের মধ্যে মডারেট ও জাতীয়তাবাদী এই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসন্ন হয়ে আসছে। ১৯০৬ সনের কংগ্রেসে কাকে প্রেসিডেন্ট করা যায় এই হলো মডারেটদের সমস্যা। শেষে মডারেটগণ 'Grand Old Man of India' নামে সম্মানিত প্রবীণ পার্শী রাজনীতিক দাদাভাই নৌরজীকে কলকাতা কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট হবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। দাদাভাই নৌরজী ছিলেন দেশের সর্বজনমান্য কংগ্রেসকর্মী—তিনি তখন বিলাতে ছিলেন। গরম বা নরম কোন দলের সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন না। তাঁর প্রেসিডেন্ট হওয়া নিয়ে কোন দল থেকেই আপত্তি উঠল না, তিনিও আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ১৯০৬ সনের কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তিনি দুই দলের মধ্যে একটা রফার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে দেশে একটা নতুন কথার প্রচলন হয়েছে—স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন। স্বরাজ কথাটির একটি ইতিহাস আছে তা এখানে উল্লেখ করা দরকার। সখারাম গণেশ দেউস্কর নামে বাংলা-প্রবাসী এক মারাঠা ব্রাহ্মণ ছিলেন বাংলা ভাষায় একজন সুলেখক এবং বাংলা হিতবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদক। তিনি তাঁর বিখ্যাত শিবাজী-চরিত নামক বাংলা বইখানাতে 'স্বরাজ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন; এবং

জাতীয়তাবাদীগণ আগ্রহের সঙ্গে এই স্বরাজ কথাটিকে তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের বাংলা দৈনিক "সন্ধ্যা" পত্রিকা স্বদেশীযুগে "স্বরাজ" কথাটিকে খুব জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে। দাদাভাই নৌরজীর পরামর্শে মডারেটগণও স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনকেই তাঁদের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। কলকাতা কংগ্রেসেই প্রথম কংগ্রেসের তরফ থেকে স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়; আর স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয়শিক্ষা এই চারিটিকে কংগ্রেসের মূলনীতি বলে গ্রহণ করা হয়। এইখানেই কলকাতা কংগ্রেসের গুরুত্ব।

স্বরাজ, স্বদেশী প্রভৃতি মূলনীতির ব্যাখ্যা

স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয়শিক্ষা প্রভৃতি নীতি হিসেবে কংগ্রেসে গৃহীত হবার মূলে ছিল তিলক, বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রচেষ্টা। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি; বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিলেন। স্বরাজ কথার অর্থ এবং স্বদেশী ও বয়কটের প্রসার ও দৌড় কতদূর তা নিয়ে মডারেট ও জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে মূলগত মতভেদ ছিল। আমরা এখানে শ্রীঅরবিন্দের লেখা ও বক্তৃতাদি থেকে ঐসব কথার তিনি কী অর্থ করেছিলেন তা বুঝতে চেষ্টা করবো।

(১) **স্বরাজ**

স্বরাজ বলতে দাদাভাই নৌরজী বুঝেছিলেন এবং মডারেটগণ বুঝতেন ক্যানেডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশগুলির ন্যায় স্বায়ত্তশাসন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নিকট স্বরাজ কথাটির অর্থ ছিল পূর্ণ-স্বাধীনতা—ইংল্যাণ্ডের ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রজারা যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে সেরূপ স্বাধীনতা।

On the eve of the Calcutta Congress Sri Aurobindo in Bandemataram re-affirmed that nothing short of complete freedom, absolute autonomy free from British Control, would satisfy the political aspiration of India.

অতি উচ্চভূমি থেকে শ্রীঅরবিন্দ স্বরাজ কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমত ইংরেজশাসন কুশাসন, ইংরেজের শাসনাধীনে শোষিত ভারত দিন দিন দরিদ্র হচ্ছে (কথাটা সত্য হলেও), এটাই শ্রীঅরবিন্দের স্বরাজদাবির হেতু নয়—তাঁর

স্বরাজদাবির মূল আরো গভীর। প্রত্যেক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যেমন সত্য, প্রত্যেক জাতিরও বৈশিষ্ট্য তেমনি সত্য—কোন দুই ব্যক্তি বা কোন দুই জাতি হুবহু এক নয়। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও চিরদিনের আদর্শ রক্ষা করে বাঁচবার অধিকার এবং নিজের আদর্শ অনুসারে দেশের শাসন-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করবার অধিকার প্রত্যেক জাতির জন্মগত অধিকার—তাতেই তারও কল্যাণ এবং সর্বজাতিরও কল্যাণ। সংক্ষেপে এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের স্বরাজদাবির পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি।

দ্বিতীয়ত বিদেশীয় শাসন যত ভালই হোক না কেন তা কখনও স্বায়ত্ত-শাসনের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। একথাটা তিনি নানাস্থানে নানাভাবে বলেছেন তাঁর নিজের কথা : "Even if an alien rule were benevolent and beneficient, that could not be a substitute for a free and healthy national life" (Sri Aurobindo—on Himself. p.-54) ভারতীয় সরকার বিদেশীয় সরকার, এদেশের প্রজাদের সম্মতি নিয়ে তা গঠিত হয় নি ; কিংবা এদেশের প্রজাদের সম্মতির উপরও তা নির্ভর করে না। ভারতের শাসন-ব্যবস্থা রচনায় ভারতবাসীর কোন হাত নেই। ভারতবাসীর নিকট নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ইংরেজ শাসকদের কোন দায়িত্বও নেই। তাই এই দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তে ভারতের দাবি স্বরাজ ; কেননা কেবল স্বরাজলাভের দ্বারাই ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের সার্থকতা সম্ভব হতে পারে। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ গ্রহণ করার অর্থ ভারতের স্বাধীনতার লক্ষ্যকে খর্ব করা। আর একথাও ঠিক ভারতবাসীর পক্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অনুরাগী হওয়া অবাস্তব, কেননা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে উপনিবেশগুলির যে সম্পর্ক ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবাসীর তা নয়। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা উপনিবেশে গিয়ে নতুন বাসভূমি সৃষ্টি করেছে এবং উপনিবেশেই তারা স্থায়িভাবে বসবাস করেছে ; কিন্তু ইংরেজ বাইরের থেকে এসে ভারত জয় করেছে ; এবং তাদের লক্ষ্য ভারত শাসন ও শোষণ করা এবং দেশে ফিরে গিয়ে ভারতে লব্ধ অর্থ ভোগ করা। উপনিবেশের লোকদের উপনিবেশগুলির প্রতি যে দরদ-বোধ, ইংরেজের ভারতের প্রতি সেই দরদ-বোধের অভাব।

তৃতীয়ত শ্রীঅরবিন্দের স্বরাজের আদর্শে কেবল ভারতের স্বাধীনতা ও কল্যাণের স্থান ছিল না, সর্বজাতির স্বাধীনতা ও কল্যাণও তার অন্তর্গত ছিল।

ভারতের জাতীয়তাবাদীদের তখনকার লক্ষ্য অবশ্য পরাধীনতার পাশ থেকে মুক্তি; তাঁদের শেষ লক্ষ্য সর্বজাতির ঐক্য ও সম্মেলন। সর্ব জগতের মিলন-প্রতিষ্ঠা হবে ভারতের চরম লক্ষ্য। সমানে সমানেই মিলন সম্ভব। যতদিন পৃথিবীর জাতিগুলি শাসক ও শাসিত, স্বাধীন ও পরাধীন, প্রভু ও তাঁবেদার এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকবে ততদিন পৃথিবীতে সর্বমানবের ঐক্যের আশা, পৃথিবীতে সর্বজগৎব্যাপী এক বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ-গঠনের আশা আকাশকুসুম মাত্র। তাই ভারতকে প্রথমে জগৎ-সভায় তার উপযুক্ত আসন লাভ করতে হবে—স্বাধীন হতে হবে। তবে স্বরাজলাভের পর দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর ভারত সাম্রাজ্যবাদীদের ন্যায় তার প্রভুত্ব কায়েম করতে চেষ্টা করবে না। তারপর তিনি এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলেছেন তা-ও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলতেন ভারতের স্বরাজলাভ অবশ্যম্ভাবী ও ভগবানের অভিপ্রেত। এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মনে কোন সংশয় ছিল না। তাঁর বোম্বাইয়ের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন 'God himself is behind us' এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই এই জাতীয় আন্দোলন চলছে; আর সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যে ভারত গভর্নমেন্টের আপ্রাণ চেষ্টা তা-ও ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়, কারণ তাঁর মতে দুঃখের দাহন ব্যতীত শক্তির বিকাশ হয় না। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় পুরাণের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা: 'when the Avatars came, there were also born the mightiest Daityas and Asuras to face the Avatars. God within us cannot grow without suffering'.

(২) স্বদেশী

শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশী কথাটির ব্যাখ্যাও অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেন ভারতবাসীকে যে স্বদেশীব্রত গ্রহণ করতে হবে একথাটি'র অর্থ এই নয় যে কেবল স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করলেই কিংবা দেশে প্রচুর পণ্য-উৎপাদন দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করলেই ভারতবাসীর স্বদেশীব্রত সাঙ্গ হবে। সর্ব বিষয়ে, দেশ-শাসনের সকল ব্যাপারেও ভারতবাসীকে স্বদেশী হতে হবে। বিদেশী সরকার তাদের মতে চলতে চায় তো চলুক; ভারতবাসীকে সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, নিজের ভাল-মন্দের দায় গ্রহণ করতে হবে। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নিজস্ব নীতি গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বদেশীর উপযোগী শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। সরকারের বিচারালয়ে না গিয়ে সালিসির দ্বারা

মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করতে হবে। তবেই ভারতবাসীর স্বদেশীব্রত সার্থক হবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ ও পাবনার বক্তৃতা

এখানে স্মরণীয় যে এরই অনুরূপ কথা ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে ১৯০৪ সনে বলেছিলেন এবং পরে ১৯০৮ সনে পাবনার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভাপতির ভাষণেও বলেন। রবীন্দ্রনাথের কথা: "আমরা সমাজে আত্মনির্ভরশীল হইব। ইংরেজ গভর্নমেণ্টের অধিকাংশ কাজ আমরা গভর্নমেণ্ট-নিরপেক্ষ হইয়া নিজেরাই করিব। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট একঘরে হইয়া যাইবে। যাহারা স্বদেশী সমাজের অবাধ্য হইয়া গভর্নমেণ্টের দিকে যাইবে আমরা সেই সকল দেশদ্রোহীর হুকা-নাপিত-ধোবা বন্ধ করিয়া সামাজিক বয়কট দ্বারা শাস্তি দিব। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট থাকে থাকুক, আমরা 'সমাজ গভর্নমেণ্ট' প্রতিষ্ঠা করবো।" ১৯০৮ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী পাবনায় রবীন্দ্রনাথ একথাই আরো পরিষ্কার করে বলেন। আমরা দেখবো পাবনার বক্তৃতার দুই মাস পরে ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জেও আমাদের পল্লীসমাজ আমরা কীভাবে গঠন করতে পারি সেকথা বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দও প্রায় রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কথাই বলেছিলেন।

(৩) বয়কট

'বয়কট' কথাটির একটু ইতিহাস আছে। আয়ারল্যাণ্ডের Captain Boycott নামক একব্যক্তি আয়ারল্যাণ্ডের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য শাসক ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে বয়কট নীতি প্রচলনের পরামর্শ প্রথমে দিয়েছিলেন; তাই তাঁর নামানুসারে এই নীতি বয়কট নামে প্রচলিত হয়ে আসছে। এই নীতির অর্থ বিরোধীদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক—সামাজিক ও বাণিজ্যিক—বর্জন। সারা দেশের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও লর্ড কার্জনের জিদের ফলে বঙ্গ-ভঙ্গ হলো; তাতে ক্ষুণ্ণ হয়ে বাঙালী ১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট তারিখে ইংরেজের পণ্য-বর্জনের নীতি গ্রহণ করে। ভারতে নিজের বাণিজ্যের স্বার্থ-রক্ষাই ইংরেজের প্রথম ভাবনা। বাঙালী ভাবলে ইংরেজের পকেটে হাত পড়লে অর্থাৎ বাণিজ্যের ক্ষতি হলে ইংরেজের টনক নড়বে। তাই বাঙালী বিলেতী কাপড়, লবণ ও যথাসম্ভব অন্যান্য পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করে। আর স্বদেশে পণ্য উৎপাদনের নীতিও এই সঙ্গে গৃহীত হয়; এবং দেশে স্বদেশী পণ্য উৎপাদন করতে হলে বিদেশী পণ্য বর্জন যে প্রয়োজন তা-ও বাঙালী উপলব্ধি করলো।

বয়কটের প্রসার কতদূর পর্যন্ত হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধেও শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মত স্পষ্ট করে বলেছেন। তিনি বলেছেন সকল প্রকার বিদেশী বিলাসের দ্রব্য অবশ্যই বর্জন করতে হবে। তবে একথা ঠিক যে এমন অনেক জিনিস আছে যা না হলে চলে না, কিন্তু দেশেও তার উৎপাদন সম্ভব নয়—যথা প্রয়োজনীয় ঔষধাদি। সেক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত সম্ভব হলে ইংল্যাণ্ড থেকে ঐসব জিনিসের আমদানি না করে যেসব বিদেশীয় রাজ্য ভারতের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, সেইসব দেশ থেকে ঐসব প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করা। তাঁর বক্তব্য বয়কট এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে ইংরেজের বাণিজ্যের উপর সত্যিকার চাপ পড়ে। তবে কেউ কেউ যথাসম্ভব ইংরেজী পণ্য বর্জন করার নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে "যথাসম্ভব" কথাটি বয়কট নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলে নীতিটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

স্বরাজের ন্যায় বয়কটের ব্যাখ্যাও তিনি উচ্চভূমি থেকেই করেছিলেন। ১৯০৭ সনের ৭ই আগস্ট তারিখে বয়কটের তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় তাঁর মতে বয়কট কথাটির প্রকৃত অর্থ কী তা তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন: "১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট বয়কট ঘোষণার দ্বারা এ কথাটাই বলা হয় যে ভারতবাসী এক পৃথক জাতি; এবং ভারতবাসী তাদের এই পৃথকত্ব ও স্বাধীনতার আদর্শ বজায় রাখার সংকল্পই গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজ জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, "আমরা পুনঃ পুনঃ বলেছি বয়কট দ্বারা আমরা ইংরেজকে বা অপর কাউকেও ঘৃণা করছি না; আমরা শুধু আমাদের স্বাধীনতা ও পৃথক জাতীয়তা ঘোষণা করছি।"

বয়কটের পেছনে যে মূলনীতি ছিল ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে শ্রীঅরবিন্দ তার ব্যাখ্যা করেছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরে আমেরিকাবাসীগণ ইংল্যাণ্ডের শাসন-পদ্ধতির একটি মূলনীতি ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। এই মূলনীতিটি হলো 'No taxation without representation', অর্থাৎ দেশবাসীদের প্রতিনিধিদের সম্মতি নিয়ে কর ধার্য করা ইংল্যাণ্ডের একটি মূলনীতি। স্বাধীনতা-সমরে আমেরিকাবাসীদের যুক্তি এই যে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে যখন আমেরিকার প্রতিনিধি নেই, তখন ঐ পার্লামেণ্টের আমেরিকাবাসীদের উপর কর ধার্যেরও কোন ন্যায়-সঙ্গত অধিকার নেই। শ্রীঅরবিন্দের মতে বয়কট প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারতবাসী বলতে চেয়েছিল 'No control, no co-operation'; অর্থাৎ যতদিন ইংরেজ শাসন-ব্যাপারে

দেশবাসীদের সত্যকার অধিকার না দেবে ততদিন ভারতবাসী ইংরেজ সরকারের সঙ্গে কোন প্রকারের সহযোগিতা করবে না; অর্থাৎ ইংরেজ সরকারকে বয়কট করবে। বিলেতী পণ্য বর্জন করে ইংরেজকে ভারতে অর্থ উপার্জন করতে সাহায্য করবে না; ইংরেজ সরকারের বিচারালয় ও বিদ্যালয় বর্জন করেও সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করবে।

(৪) জাতীয় শিক্ষা—

দেশের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি ও জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নিঃসন্দেহ ছিলেন। অধ্যাপকরূপে বহু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ছাত্রগণ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে না—তাদের বুদ্ধির প্রকৃত বিকাশ হয় না, তাদের চিন্তার দৈন্যেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বিশ্বাস প্রচলিত শিক্ষার ফলে ভারতীয় ছাত্রগণ তাদের স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তি হারিয়ে ফেলে। আমরা দেখব তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, দারিদ্র্য নয়, চিন্তাশীলতার হ্রাস। এর প্রতিকারের জন্য শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন জাতির শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর অপর অভিযোগ ছিল এই যে এই শিক্ষার উদ্দেশ্য যুবকদের মনে দেশপ্রীতির পরিবর্তে সরকারের প্রতি আনুগত্য জন্মানো, দাস-সুলভ মনোভাবের সৃষ্টি। তাঁর মতে জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 'to build up sons for the motherland to work and suffer for her'; অর্থাৎ ছাত্রদের এই শিক্ষা দেওয়া যে তাদের কর্তব্য দেশমাতার জন্য কাজ করা, প্রয়োজন হলে দেশের জন্য দুঃখবরণ করা।

স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত এই চারটি মূলনীতির শ্রীঅরবিন্দ কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা আমরা দেখলাম। তাঁর এই ব্যাখ্যা যে অতি উচ্চভূমি থেকে ব্যাখ্যা তা আমরা দেখলাম। এই ব্যাখ্যায় তিনি যেমন জাতীয় আদর্শ একটুও ক্ষুণ্ণ করেন নি; তেমনি একথাটাও স্পষ্ট করে জোর দিয়ে বলেছেন যে ভারতবাসীর লক্ষ্য জাতীয় উল্লাস এবং তার মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "জাতীয় উন্নয়ন" বিষয়ক প্রবন্ধে (ধর্ম ও জাতীয়তা ৭৩ পৃষ্ঠা) যা বলেছেন তা স্মরণীয়। সেখানে তিনি দেখিয়েছেন "আর্যশিক্ষার মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণার কোন স্থান নাই। নারায়ণ সর্বত্র। কাহাকে বিদ্বেষ করিব, কাহাকে ঘৃণা

করিব ...ইত্যাদি।" এরূপ উচ্চ আদর্শের কথাই বলেছেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ কথা দুটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে ইংরেজ তার মিত্র, শত্রু নয়, যদিও তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী; কারণ সত্যাগ্রহী কাউকেও ঘৃণা বা বিদ্বেষ করেন না। এখানে গান্ধীজী ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে মিল। তবে দুয়ের মধ্যে কর্মপন্থার মধ্যে যে প্রভেদ তা ভুললে চলবে না। গান্ধীজী অহিংসপন্থী—কোন অবস্থায়ই তিনি অহিংসনীতি ত্যাগ করতে নারাজ; কিন্তু প্রয়োজন হলে দেশের স্বাধীনতার জন্য অহিংস-নীতিতে স্থির না থেকে সশস্ত্র যুদ্ধই কর্তব্য—এই হলো শ্রীঅরবিন্দের মত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মামলার পটভূমিকা

বন্দেমাতরম্, যুগান্তর, সন্ধ্যা প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির জনপ্রিয়তা স্বভাবতই গভর্নমেণ্টের নিকট অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। গভর্নমেণ্ট পর পর জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা দায়ের করে। সন্ধ্যা পত্রিকার ভাষা ছিল অতি জোরালো। ১৯০৫ সনে প্রথমে সন্ধ্যার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে যুগান্তরের বিরুদ্ধে এবং আগস্ট মাসে বন্দেমাতরমের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়। বঙ্গ-ভঙ্গের পর দেশে আন্দোলন যখন তীব্র হয়ে উঠলো তখন বিশেষ ভাবে এদেশের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকাগুলির উস্কানিতে গভর্নমেণ্ট যে প্রকারেই হউক আন্দোলন দমন করতে কৃতসংকল্প হলো। গভর্নমেণ্ট তার লক্ষ্য স্থির করলো, এবং একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গৃহীত হলো। এই কর্মপন্থার একটি অঙ্গ হলো ছাত্রদলন; কারণ আন্দোলনের সফলতার মূলে ছিল ছাত্রদের উৎসাহ। আর গভর্নমেণ্টের দমন-নীতির দ্বিতীয় অঙ্গ ছিল আন্দোলনের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিদের বিনা বিচারে নির্বাসন। তার সূচনা এসময়েই হয়; এবং একদিন দেশবাসী সকালবেলা পত্রিকায় পড়লো পঞ্জাবের জনপ্রিয় নেতা লজপৎ রায় ও তাঁর এক সহযোগী অজিত সিংকে গভর্নমেণ্ট বিনা বিচারে নির্বাসন দিয়েছে। আগের দিন মধ্য রাত্রে শ্রীঅরবিন্দ যখন নিদ্রিত তখন তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে এক

টেলিগ্রাম তাঁর হাতে দেওয়া হলো—টেলিগ্রামে লালা লজপৎ রায়ের নির্বাসনের খবর ছিল। শ্রীঅরবিন্দ এক টুকরা কাগজ টেনে নিয়ে এক মহা উদ্দীপনা-পূর্ণ আবেদন পঞ্জাব তথা সমস্ত দেশের লোকদের উদ্দেশ্যে ছাপাবার জন্য কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে দিলেন। ঐ আবেদনে তিনি পঞ্জাবের লোকদের বললেন: "কাজের সময় এসেছে, গভর্নমেণ্টের অবিচার অত্যাচার নতশিরে মেনে নেবার সময় আর নেই। এখন পঞ্জাববাসীদের দেখতে হবে এক লজপৎ রায়ের স্থলে শত শত লজপৎ রায়ের উদ্ভব হবে; পঞ্জাবের লোকেরা যে সিংহ তার প্রমাণ দিতে হবে।"

গভর্নমেণ্টের নির্যাতন-নীতির তৃতীয় অঙ্গ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের দলন। নতুন আইন করে পত্রিকাগুলির নিকট অতি উচ্চহারে জামিন চাওয়া, পত্রিকায় প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ রাজদ্রোহকর মনে হলে যে প্রেসে পত্রিকা ছাপা হতো তা বাজেয়াপ্ত করা হলো গভর্নমেণ্টের সুনির্দিষ্ট নীতি।

গভর্নমেণ্টের ভেদনীতি; মোস্লেম লীগের প্রতিষ্ঠা

সবচেয়ে দেশের পক্ষে অনিষ্টকর হলো গভর্নমেণ্টের প্রবর্তিত ভেদনীতি; এবং তার ফল অতি সুদূরপ্রসারী হলো। গভর্নমেণ্টের একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা হলো হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টি, আর ছিটেফোটা শাসন-সংস্কার দিয়ে মডারেট বা নরম দলকে খুশী করে দেশের ঐক্যনাশ ও জাতীয়তাবাদী বা গরম দলের উচ্ছেদ। স্বদেশী আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করে হিন্দুগণ, অবশ্য অনেক শিক্ষিত মুসলমান জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন এবং শেষ পর্যন্ত অল্প-সংখ্যক মুসলমান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। মুসলমানদিগকে জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে রাখবার জন্যে মোস্লেম লীগ নামক একটি নতুন প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গভর্নমেণ্ট দাঁড় করায়। ১৯০৬ সনে যেসময় কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস-অধিবেশন চলতে থাকে সেই সময় ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে ঢাকা নগরীতে মোস্লেম লীগের প্রতিষ্ঠা হলো—রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা হলো। পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে যুক্ত এক নতুন প্রদেশ-সৃষ্টি যে মুসলমানদের স্বার্থের অনুকূল হবে, অনেক মুসলমানের মনে এই ধারণা জন্মে।

ভারতে এই নতুন আন্দোলনের প্রতি বিলাতের পত্রিকাগুলির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বিলাতের বিখ্যাত Manchester Guardian নামক উদারনৈতিক পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে Mr Nevinson নামক এক সাংবাদিক ভারতের

জাতীয় আন্দোলনের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্যে ১৯০৭ সনের অক্টোবর মাসে এদেশে আসেন, এবং দেশে ফিরে গিয়ে 'The New Spirit in India' নামক একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক লেখেন। ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদলের তখনকার নেতা Cair Hardie ঐসময় এদেশে আসেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় শ্রীঅরবিন্দ নাকি Spence's Hotel-এ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। কিন্তু দেশী পোশাকে কারো Hotel-এ প্রবেশের অধিকার নেই শুনে তিনি ফিরে আসেন। পরে Cair Hardie নাকি নিজে সঞ্জীবনী পত্রিকা অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

মোস্লেম লীগ প্রতিষ্ঠার অল্প পরে ১৯০৭ সনের মার্চ মাসে কুমিল্লায় এবং এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহের জামালপুর শহরে সুরু হয় হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণ। দেশের ইতিহাসের এই অধ্যায় ভুলে যাওয়াই ভাল; কিন্তু বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মামলা এবং শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা বলতে হলে ইতিহাসের এই অধ্যায়েরও একটু আলোচনা না করলে চলে না। একজন নিরপেক্ষ ইংরেজ সাংবাদিক Mr Nevinson তাঁর The New Spirit in India পুস্তকে কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা নিয়ে দেওয়া গেল: "In the first week of March (1907) The Nawab Salimulla of Dacca visited the small town of Comilla,…… By one means or another the report was circulated throughout the country that the Indian Government was favouring the Musalman population and would inflict no punishment for the looting of Hindu shops or the abduction of Hindu women, especially widows. Accordingly shops were looted, Hindu widows abducted and the cases of outrage upon women increased in number (p.-10)."

জামালপুর সম্বন্ধে ঐ পুস্তকে নেভিনসন সাহেব লিখেছেন: "In the third week of April further disturbances broke out at Jamalpur, another small town in East Bengal, where the Hindus during a festival were set upon by Mahommedan rowdies who desecrated a temple and maintained panic in the district for the next few days.

জামালপুরে বাসন্তীমূর্তি ভগ্ন হয়। শহরে যখন গুণ্ডার উপদ্রব তখন শহরের শান্তিরক্ষা যার দায় সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে গিয়ে বিপন্ন হিন্দুরা শুনলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শহরে অনুপস্থিত, সফরে গিয়েছেন। পূর্ববঙ্গে অশিক্ষিত গুণ্ডাপ্রকৃতি মুসলমানদের মধ্যে মুসলমান মৌলবীগণের অপপ্রচারে গভর্নমেণ্টের সহযোগিতা ছিল, এরূপ সন্দেহেরও যথেষ্ট কারণ আছে। এখানে স্বভাবতই ঐতিহাসিক H. G. Wells-এর একটি কথা মনে পড়ে। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ 'The Outline of History' নামক পৃথিবীর ইতিহাস-পুস্তকে (One Volume Edition p.-958) সাম্রাজ্যবাদীদের মারাত্মক ভ্রমের কথা "Tacit conspiracy between law and illegal violence' উল্লেখ করেছেন। গুণ্ডাদের গোপনে গভর্নমেণ্টের বিরোধীদের শায়েস্তা করতে, উৎসাহ দিয়ে যে সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ বপন করে থাকে, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস থেকে ওয়েলস্ সাহেব তার প্রমাণ দিয়েছেন। আর প্রমাণের জন্য দূরেই বা যেতে হবে কেন? আমরা এক জীবনেই গভর্নমেণ্টের প্রতি শ্রদ্ধা বিদ্বেষে পরিণত হতে কী দেখি নি? হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টির নীতি ভারতের যথেষ্ট অনিষ্ট করেছে সত্য; কিন্তু তা কী ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বাঁচিয়ে রাখতে পারলে? ঐ নীতির ফল ইংরেজের পক্ষেও কম ক্ষতিকর হয় নি। ইংরেজ হিন্দুদের শ্রদ্ধা হারায় নি কি?

কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনায় সকল দেশীয় পত্রিকায় গভর্নমেণ্টের আচরণের কঠোর সমালোচনা হয়। শ্রীঅরবিন্দও বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনা নিয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লিখেছিলেন: "পশু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে হিন্দুদের উচিত গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন না করে, ভয়-ভীরুতা ত্যাগ করে, আত্মরক্ষায় যত্নবান হওয়া", অপর এক স্থানে বলেন: "যদি বাঙালী জাতি সত্যিই এমন পক্ষঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকে যে দুর্বৃত্তদের দ্বারা তাদের স্ত্রীলোকেদের সতীত্ব নষ্ট হতে দেখেও প্রতিকারের জন্য বাধা না দেয়, দরকার হলে মরতে প্রস্তুত না হয়, তবে পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত না করে তারা যত শীঘ্র লুপ্ত হয় ততই মঙ্গল।" পশ্চিম ভারতে তিলক তাঁর "কেশরী" নামক মারাঠা পত্রিকায় এই আশা প্রকাশ করেন যে হিন্দুরা অবশ্যই ঐ আক্রমণের সমুচিত উত্তর দেবে। মোটকথা কুমিল্লা ও জামালপুরের ঘটনা সর্বভারতে নিন্দিত হয়।

যুগান্তর পত্রিকায় এই প্রসঙ্গে দুটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। ঐ প্রবন্ধে স্পষ্ট

ভাষায় একথা বলা হয় যে গভর্নমেণ্টই মুসলমানদের হিন্দুদের উপর লেলিয়ে দিয়েছে। এদেশের ইংরেজদের সম্বন্ধে যুগান্তর পত্রিকা বলে যে তারা মানুষ না দানব। যুগান্তরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়—গভর্নমেণ্টকে লোকচক্ষে হেয় করা হয়েছে, এই অভিযোগ আনা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন যুগান্তরের সম্পাদক-সংঘের অন্যতম সভ্য। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে তিনি প্রবন্ধ দুটি লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আদালতে মামলা উঠলে তিনি বলেন ঐ মোকদ্দমায় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন না, কারণ তিনি ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিচারালয়কে মানেন না। ১৯০৭ সনের ২৪শে জুলাই ভূপেন্দ্রনাথের এক বছরের জন্য জেল হয়।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ

যুগান্তর পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবার অল্প পরে ১৯০৬ সনের ১৬ই আগস্ট তারিখে গভর্নমেণ্ট বন্দেমাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনে, এবং বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ অভিযুক্ত হন। অভিযোগের উপলক্ষ্য বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় যুগান্তরের দুটি আপত্তিজনক প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ; তবে গভর্নমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দকে দোষী প্রমাণ করার জন্য ঐ দুটি প্রবন্ধ কোন কাজে লাগায় নি। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তিনি বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় অপরের লিখিত একখানা রাজদ্রোহকর চিঠি প্রকাশ করেছেন। চিঠিখানার শিরোনামা ছিল "ভারত ভারতীয়দের জন্য"। এই রাজদ্রোহকর চিঠি বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তাই পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী—এই ছিল গভর্নমেণ্টের প্রধান অভিযোগ।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সহযোগীত্রয় এমন সুকৌশলে পত্রিকার প্রধান প্রবন্ধগুলি লিখতেন যে প্রবন্ধগুলিতে গভর্নমেণ্টের তীব্র সমালোচনা করা হলেও, খোলাখুলি স্বাধীনতাই যে ভারতের লক্ষ্য একথা বলা হলেও, প্রবন্ধগুলি আইনের চোখে নির্দোষ ছিল এবং প্রবন্ধগুলির জন্য গভর্নমেণ্টের পক্ষে কাউকেও ধরা-ছোঁয়া সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গে কলকাতার Statesman পত্রিকা যা লিখেছিল তা এই: "They are too diabolically clever, crammed full of sedition between the lines, but legally unattackable because of the skill of language' অর্থাৎ প্রবন্ধগুলি এমন সুকৌশলে লিখিত যে তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ সুস্পষ্ট রাজ-

দ্রোহাত্মক হলেও আইনের চোখে লেখাগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি করবার কিছু ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সহযোগীরা জেলে যেতে চান নি, কিংবা তাঁদের জেল দেবার কোন সুযোগ গভর্নমেণ্টকে দিতে চান নি। শ্রীঅরবিন্দের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের লোকদের নিকট স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা, তাদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগানো। অসাবধানে লিখে আইনের খর্পরে পড়লে, কিংবা গভর্নমেণ্ট যদি পত্রিকা বন্ধ করবার সুযোগ পায় তা হলে, শ্রীঅরবিন্দের ঐ প্রধান উদ্দেশ্যই পণ্ড হবে। শ্রীঅরবিন্দ তা হতে দিতে চান নি। এই মামলার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী হলো; পুলিসকে তিনি গ্রেপ্তার করবার সুযোগ দেন নি; তিনি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন এবং জামিনের বলে খালাস হয়ে আসেন। মোটকথা তিনি রাজ-অতিথি হওয়া অর্থাৎ জেলে যাওয়া আদৌ পছন্দ করতেন না; কারণ তা হলে যে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কাজ করতে পারবেন না।

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা দায়ের হলে দেশে তার কী প্রতিক্রিয়া হয় তার একটু উল্লেখ এখানে করা যাক্। The Hindu Patriot পত্রিকা এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে লেখে: Mr Aurobindo Ghosh is no notoriety-hunter, is no demagogue who wants to become prominent by courting conviction for sedition. A man of very fine culture, his is a lovable nature; merry, sparkling with wit and humour, ready in refined repartee, he is one of those men to be in whose company is a joy, and behind whose exterior is a steadily growing fire of intense devotion to a cause.

রবীন্দ্রনাথের অরবিন্দ-প্রশস্তি

বন্দেমাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া হলো রবীন্দ্রনাথের। এই সময় তিনি তাঁর বিখ্যাত অরবিন্দ-প্রশস্তি কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের ত্যাগ, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও নির্ভীকতা রবীন্দ্রনাথকে বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত করে। কবিতার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তিনি শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে রচিত প্রশস্তিটি আরম্ভ করেন এই বলে:

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিদৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখেছিলেন "স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি" রূপে।

ঐ প্রশস্তিতে শ্রীঅরবিন্দকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"তোমা লাগি নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ;"

রবীন্দ্রনাথের মতে বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান হলো

"আপনার পুর্ণ-অধিকার······

চিরদিন মহত্তম মানবগণ বিধাতার এই শ্রেষ্ঠ দানের জন্যে তপস্যা করেছেন—দুঃখ-বরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়

"যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহাগীত, মহাবীর সবে
গিয়াছেন সঙ্কট-যাত্রায়";

শ্রীঅরবিন্দ সেই মহৎ অধিকারই চেয়েছেন

"দেশের হয়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরব-দৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বিধাতা আজ শ্রীঅরবিন্দের প্রার্থনা শুনেছেন, এবং শ্রীঅরবিন্দের

"······দক্ষিণ করে
তাই দিলেন আজি কঠোর আদরে
দুঃখের দারুণ দীপ?"

রবীন্দ্রনাথের মতে শ্রীঅরবিন্দকে বাধা দেবে এমন শক্তিমান কে?

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে?"

শাস্তি তো কেবল সেই ভীরুদের জন্য

"যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়;······
সেই ভীরু নতশির, চিরশাস্তি তা'রে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে।"

তাই কবি শ্রীঅরবিন্দের এই পীড়নে কোন দুঃখের কারণ দেখছেন না ; বরং

"বন্ধন পীড়ন দুঃখ, অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি, কর্ণে মোর বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান।"

উপসংহারে কবি সেই বিধাতাকে নমস্কার করছেন

"……যিনি ক্রীড়াচ্ছলে
গড়েন নূতন সৃষ্টি প্রলয় অনলে,
মৃত্যু হতে দেন প্রাণ, বিপদের বুকে
সম্পদেরে করেন লালন, হাসিমুখে
ভক্তেরে পাঠায়ে দেন কণ্টক কান্তারে।"

কবির শেষ কথা এই যে বিধাতা

"নানা কণ্ঠে কন নানা ইতিহাসে,
সকল মহৎ কর্মে পরম প্রয়াসে,
সকল চরম লাভে, 'দুঃখ কিছু নয়
ক্ষত মিথ্যা ক্ষতি মিথ্যা, মিথ্যা সর্ব ভয়।' "

এই সুন্দর প্রশস্তিটিতে আমরা পেলাম শ্রীঅরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন। আর তাঁর লেখায় নানা স্থানে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন— দুঃখ ব্যতীত কোন মহৎ কর্মই করা যায় না, সকল মহা লাভের জন্যই দাম দিতে হয়, এবং নির্ভীক স্বাধীন আত্মার নিকট কোন দুঃখই অসহনীয় নয়, সে কথাগুলিও এখানে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

পরিষদের অধ্যক্ষ-পদ ত্যাগ ও ছাত্রদের অভিনন্দন

১৯০৭ সনের আগষ্ট মাসে যখন শ্রীঅরবিন্দ রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে বিচারের প্রতীক্ষায় জামিনে মুক্ত, তখন তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যক্ষপদে ইস্তাফা দেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মের জন্য যেন পরিষদের কোন ক্ষতি না হয়—এটাই ছিল তাঁর পদত্যাগের কারণ। তবে একথাও ঠিক যে পরিষদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষার আদর্শ নিয়েও তাঁর মতবিরোধ ছিল। তাঁর শিক্ষার আদর্শ ছিল এই, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ছাত্রগণ জাতীয় ভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে, দেশের জন্য কাজ করবে। কিন্তু রাজনীতিতে পরিষদের ছাত্রগণ যোগ দেয়, পরিষদের কর্তৃপক্ষ এটা পছন্দ করতেন না ; তাঁদের ভয় ছিল তাতে গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে পরিষদের উপর নির্যাতনের সম্ভাবনা

ঘটবে। তাঁরা এই বিপদ এড়িয়ে চলতে চাইতেন। শ্রীঅরবিন্দ পরিষদের এই নীতি সমর্থন করতে পারতেন না।

শিক্ষা পরিষদের ছাত্রগণ যে তাদের ভক্তি-ভাজন অধ্যক্ষের পদত্যাগে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হবে তা বলাই বাহুল্য। তারা ২১শে আগষ্ট তারিখে এক সভায় সমবেত হয়ে শ্রীঅরবিন্দকে বিদায়-অভিনন্দন জানায়। এই অভিনন্দন পত্রে ছাত্রগণ শ্রীঅরবিন্দের ত্যাগ, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার প্রশংসা করে; এবং তাঁর বিপদে অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগের জন্য, তারা শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে। অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যা বলেন তা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। তিনি বলেন, তিনি বিপদে পড়েছেন একথা বলার কোন কারণ নেই, কিংবা তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করবারও কোন কারণ ঘটে নি। তিনি রাজদ্বারে অভিযুক্ত একথা সত্য। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তিনি জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছেন তার ফল যে এ-ই হবে তা তিনি জানেন; এবং প্রসন্নচিত্তেই তিনি তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে প্রস্তুত আছেন। তবে তিনি আশা করবেন তিনি যে ব্রত গ্রহণ করে, ছাত্রদের ভাষায়, বিপন্ন হয়েছেন সেই ব্রতের প্রতি ছাত্রদের চিরদিন সহানুভূতি থাকবে। তারপর ছাত্রদের উদ্দেশ করে যেকথা কয়টি তিনি বলেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য। তিনি ছাত্রদের বলেছিলেন: "ভারতকে তোমরা বড় করো। একদিন ভারত ছিল জগতের গুরু; তখন জগৎ ভারতের জ্ঞানের প্রতীক্ষায় থাকতো। আবার যেন ভারত আগের ন্যায় মাথা উন্নত করে জগৎ-সভায় দাঁড়াতে পারে। জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছাত্রদের শুধু জ্ঞানদান নয়, কিংবা জীবিকা অর্জনের জন্য ছাত্রদের যোগ্য করে তোলা নয়। তারা মাতৃভূমির জন্য কাজ করবে, দরকার হলে দুঃখ বরণ করবে—এমন সব মায়ের সন্তান তৈরী করাই জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য। দেশের ইতিহাসে এমন এক এক সময় আসে যখন দেশের সম্মুখে ভগবান একটিমাত্র কর্মের আদর্শ তুলে ধরেন—সে হলো দেশ-সেবার আদর্শ। তখন দেশ-সেবার কাছে জীবনের সকল কাজ তুচ্ছ। তোমাদের সম্মুখে আজ সেই সময় এসেছে। তোমরা দেশের জন্য কাজ করো; দরকার হলে দুঃখ বরণ করো, যেন তোমাদের দুঃখবরণ দ্বারা তোমাদের জন্মভূমি সুখী হতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্বামী বিবেকানন্দও একদিন দেশের যুবকদের অনুরূপ কথা শুনিয়েছিলেন। ১৮৯৭ সনে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে মাদ্রাজে এক বক্তৃতায় দেশের যুবকদের লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেন:

"আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরমজননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্য দেবী হন। অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই।" ১৯০৭ সনে শ্রীঅরবিন্দ যেন শিক্ষা পরিষদের ছাত্রদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেন।

মামলার প্রত্যক্ষ ফল

কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের এজলাসে বন্দেমাতরম্ মামলা ওঠে। বিচার্য বিষয় দুটি—প্রথমত পত্রিকায় আপত্তিজনক চিঠি "ভারত ভারতীয়দের জন্য" প্রকাশের দায়িত্ব কার। দ্বিতীয়ত বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি রাজদ্রোহকর কিনা। যদি রাজদ্রোহকর হয়, তবে গভর্ণমেণ্ট আইনানুসারে বন্দেমাতরম্ পত্রিকা বন্ধ করে দিতে পারবেন। কিংসফোর্ড সাহেব কড়া বিচারক ; স্বদেশী মামলায় লঘু পাপে গুরু দণ্ড দেন বলে তাঁর কুখ্যাতি ছিল। শ্রীঅরবিন্দ আদালতে এই বলে জবাব দিলেন যে তিনি বন্দেমাতরম্ পত্রিকার অন্যতম প্রবন্ধ লেখক মাত্র। পত্রিকার সম্পাদক তিনি নন ; এবং পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। পত্রিকায় কোন্ চিঠি প্রকাশিত হতো বা না-হতো সে সম্বন্ধে তিনি কিছু জানতেন না। তিনি নির্দোষ। তখন শ্রীঅরবিন্দই যে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক তা প্রমাণ করবার ভার পড়লো সরকার পক্ষের উপর ; এবং বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক কে সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিপিনচন্দ্র পাল মশাইকে তলব করা হলো। আজকের ন্যায় সেকালে পত্রিকার সম্পাদক কে, তা পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় উল্লেখ থাকতো না। পরে গভর্ণমেণ্ট আইন করে এরূপ উল্লেখ আবশ্যিক করেছেন। আমরা দেখেছি বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় মাত্র একদিনের জন্য শ্রীঅরবিন্দের নাম সম্পাদকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল ; দ্বিতীয় বার আর প্রকাশিত হয় নি।

এই মামলায় বিপিনবাবু দেশে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। আদালতের আদেশ শিরোধার্য করে বিপিনবাবু আদালতে উপস্থিত হলেন। যখন বিচারক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক কে, তখন বিপিনবাবু বিচারককে যথারীতি অভিবাদন করে বললেন যে বিবেকের অনুরোধে উপস্থিত মোকদ্দমায় কোন অংশ গ্রহণ করতে, বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অক্ষম। তিনি আরো বললেন তাঁর কাজে যদি আদালতের অবমাননা করা হয়ে থাকে—সাক্ষীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হওয়া আদালতের অবমাননা—

তবে তিনি দুঃখিত এবং সেজন্য আদালত তাঁকে যে শাস্তি দেবেন তা তিনি মাথায় পেতে নেবেন। আদালত অবমাননার জন্য বিপিনবাবুর ছয় মাস জেল হলো। কিন্তু বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক যে শ্রীঅরবিন্দ সে সম্বন্ধে সরকার পক্ষ কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারলেন না। ফলে শ্রীঅরবিন্দ খালাস পেলেন। আর কিংসফোর্ড সাহেবকেও স্বীকার করতে হলো বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি রাজদ্রোহকর নয়। সেগুলি যে অতি সুকৌশলে লিখিত তা আমরা দেখেছি। বন্দেমাতরম্ পত্রিকা আইনের খর্পরে পড়ে বন্ধ হলো না। দেশে বিপিনবাবুর কাজে নতুন নজির সৃষ্টি হলো। পরে গান্ধীজীর আমলে আদালতের কাজে কোন অংশ গ্রহণ না করার বহু দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বিপিনবাবুই তার প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মামলার পরোক্ষ ফল

একদিক থেকে বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মামলার ফল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীঅরবিন্দের ত্যাগ ও প্রতিভার কথা যাঁরা জানতেন তাঁরাই তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কিন্তু এতকাল তিনি সাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন না; আড়ালে থেকেই তিনি কাজ করতেন। খ্যাতি প্রতিপত্তির লোভ তাঁর কোন দিনই ছিল না। কিন্তু এই মামলার সময় স্বভাবতই সমস্ত দেশের দৃষ্টি তাঁর উপর নিবদ্ধ হয়। আসামীর কাঠগড়ায় তাঁকে দাঁড় করিয়ে গভর্ণমেণ্টই তাঁকে সর্বভারতের অন্যতম প্রধান জাতীয়তাবাদী নেতারূপে বিখ্যাত করে তোলে। এর পর আর আড়াল থেকে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব রইলো না। এখন থেকে সভা-সমিতিতে তাঁকে প্রকাশ্যে অংশ গ্রহণ করতে হতো। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বা বিপিনচন্দ্রের ন্যায় বাগ্মী ছিলেন না। বাংলায় বক্তৃতা দিতে তিনি পারতেন না; এবং বাঙালী শ্রোতাদের নিকট ইংরেজীতে বক্তৃতা করতে হতো বলে তাঁর মনে যথেষ্ট কুণ্ঠা ছিল। শান্তভাবে অকাট্য যুক্তির সাহায্যে তিনি সভা সমিতিতে ইংরেজীতে যা বলতেন তা শ্রোতাদের একেবারে হৃদয় স্পর্শ করতো। বস্তুত এই মামলার পর তাঁর রাজনৈতিক জীবনে যেন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। তিনি প্রকাশ্যে অন্যতম জাতীয়বাদী নেতার আসন গ্রহণ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মেদিনীপুরে প্রাদেশিক কনফারেন্স

আমরা দেখেছি ভারতে রাজনীতিকগণ মডারেট ও জাতীয়তাবাদী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দুই দলের মধ্যে আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে এত প্রবল মতভেদ দেখা দেয় যে দুদলের পক্ষে একযোগে কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে মেদিনীপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স, এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে সুরাট কংগ্রেসে দুই দলের এই বিরোধ চরমে ওঠে। মেদিনীপুরে দুইদল একযোগে কাজ করা অসম্ভব দেখে প্রত্যেক দলই স্বতন্ত্র সভায় মিলিত হয়; আর সুরাটে দ্বিতীয় কংগ্রেস ভেঙে যায়, এবং কয়েক বছরের জন্য সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পায়। মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে যে বিরোধ দেখা দেয় তা সুরাট কংগ্রেসের বিরোধেরই যেন পূর্বাভাস। মেদিনীপুরে কি ঘটেছিল দেখা যাক্।

কলকাতা থেকে মডারেটগণ সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে আর জাতীয়বাদীগণ শ্রীঅরবিন্দের নেতৃত্বে মেদিনীপুর কনফারেন্সে যোগ দেন। মেদিনীপুর ছিল জাতীয়তাবাদীদের একটি প্রধান কেন্দ্র; তবে সেখানে মডারেটদের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য ছিল না। কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন একজন স্থানীয় প্রধান মডারেট নেতা। মেদিনীপুরে মডারেটদের আচরণে জাতীয়তাবাদীরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হন। মডারেট নেতাদের ইঙ্গিতে নাকি পুলিস কয়েকজন জাতীয়তাবাদীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে তাঁরা সেই সময় কোন সভা-সমিতি বা মিছিলে যোগ দিতে পারবেন না। আর কনফারেন্সের প্রকাশ্য অধিবেশনে মডারেটগণের আমন্ত্রণে মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার মঞ্চোপরি প্রেসিডেণ্ট ও সুরেন্দ্রনাথের মধ্যস্থলে আসন গ্রহণ করেন। সভাতে জনগণের অপ্রিয় বিদেশীয় সরকারের পুলিশের উপস্থিতিতে জাতীয়তা-বাদীদের বিরক্তির সীমা রইলো না। তারপর গোল বাধলো বিষয়-নির্বাচনী কমিটির সভ্য-নির্বাচন নিয়ে। জাতীয়তাবাদীগণের প্রস্তাব ছিল সভায় ভোট দ্বারা সভ্যগণ নির্বাচিত হবেন। মডারেট প্রেসিডেণ্ট সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে মডারেটদের মনোমত কমিটির সভ্যগণের এক নামের তালিকা সভায় পেশ করেন, এবং ঐ তালিকা সমগ্রভাবে বিবেচনার জন্য জিদ করতে থাকেন।

তখন এই কনফারেন্স জাতীয় কনফারেন্সই নয়, পুলিশের সাহায্যে জাতীয়তা-বাদীদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্য মডারেটদের এক ঘরোয়া সভা মাত্র—একথা বলে জাতীয়তাবাদীগণ একযোগে সভা ত্যাগ করেন। এর পর সভামণ্ডপে মডারেটগণ বিনা বাধায় তাঁদের সভার কাজ শেষ করেন। সভায় ১৯০৫ সনের কলকাতা কংগ্রেসের গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়; তবে স্বরাজের অর্থ পূর্ণ-স্বাধীনতা একথা বলতে মডারেটগণ সাহস করলেন না; ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অর্থেই স্বরাজ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এদিকে জাতীয়বাদীগণ মেদিনীপুরে এক সভায় তাঁদের সভাত্যাগের কারণ বিবৃত করেন। এই সভায় পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্থেই স্বরাজ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এইরূপে মেদিনীপুরে মডারেট ও জাতীয়তাবাদীগণের পক্ষে একযোগে কাজ করা সম্ভব হলো না।

সুরাট কংগ্রেস

জাতীয়তাবাদীগণ ও মডারেটগণ বুঝলেন সুরাট কংগ্রেসে দুই দলের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষা হবে। দুই দলই শক্তি-পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব-গুলির শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ জাতীয়তাবাদীগণের ব্যাখ্যা বোম্বাইয়ের ফিরোজশা মেহতা প্রভৃতি মডারেটদের আদৌ মনঃপূত ছিল না; এবং এই মডারেট নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল সুরাটে কংগ্রেস-অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবগুলির পরিবর্তন-সাধন। এজন্যে তাঁরা নানা তোড়জোড় ও নানা কূটপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমে স্থির ছিল সে বছরের কংগ্রেসের অধিবেশন হবে নাগপুরে। কিন্তু নাগপুরে মারাঠা জাতীয়তাবাদীরা প্রবল; তাই ফিরোজশা মেহতা প্রভৃতি মডারেট নেতাদের চেষ্টায় সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে স্থির হয়। গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর অবশ্য গুজরাট জাতীয়তাবাদের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে; কিন্তু সেকালে গুজরাটের একটি অপ্রধান নগরী সুরাট ছিল জাতীয়তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; এবং সেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন ঘটানোর এই ছিল মডারেটগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বে বোম্বাইয়ে যে প্রাদেশিক কনফারেন্স হয়, সেই কনফারেন্সে নিতান্ত স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়ে নাকি ফিরোজশা মেহতা কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব দুটি ছেটে ফেলেছিলেন; এবং জাতীয়তাবাদীগণ তা লক্ষ্য করে স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

বাংলা থেকে দুই পক্ষই সদলবলে সুরাট রওয়ানা হলেন। বন্দেমাতরম্ মামলার ফলে শ্রীঅরবিন্দ তখন সর্ব ভারতে বিখ্যাত। তাঁর সুরাট-যাত্রা যেন এক বিজয়-যাত্রা হয়েছিল। তাঁকে দেখবার জন্য প্রত্যেক ষ্টেশনেই অসম্ভব ভিড় হয়। বারীন্দ্রকুমারও একজন ডেলিগেট হিসাবে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একই গাড়ীতে সুরাট যান; এবং বারীন্দ্রকুমারের লেখা ও কথা থেকে সুরাট কংগ্রেস এবং সেখানে শ্রীঅরবিন্দের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। বারীন্দ্রকুমার লিখেছেন সুরাট যাত্রা-পথে ফুলের মালায় ও নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যে রেলের কামরা ভর্তি হয়ে গেল। অনেকে আবার শ্রীঅরবিন্দকে দেখতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে যান। জাতীয়তাবাদীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা থেকে সুরাট যান তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। তাঁর মতন বিখ্যাত ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করবেন—অনেকেরই ছিল এ ধারণা। তাই ষ্টেশনে গাড়ী থামলে তারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতেই শ্রীঅরবিন্দকে খুঁজতে থাকে। এদিকে গাড়ীর সময় হওয়াতে গাড়ী ছেড়ে দেয়; তাদের আর শ্রীঅরবিন্দের দর্শনলাভ হলো না। সুরাটে ফিরোজশা মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মডারেট নেতাদের জন্য সকল প্রকার আরামের উপকরণসহ সুসজ্জিত তাঁবুর ব্যবস্থা ছিল; অপরদিকে তিলক ও অরবিন্দের স্থান হয়েছিল একটি মন্দির-সংলগ্ন দুটি অনাড়ম্বর গৃহে; এবং সেখানকার ব্যবস্থাও ছিল সাধাসিধা।

১৯০৬ সনের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের সভাপতির পদের জন্য প্রতিযোগিতা হতো না; অভ্যর্থনা কমিটি যাঁকে সভাপতি নির্বাচন করতো তিনিই কংগ্রেসের সভাপতি হতেন। তবে নিয়ম ছিল কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে, অভ্যর্থনা কমিটির নির্বাচিত সভাপতির নাম উপস্থিত সভ্যগণের অনুমতির জন্য প্রস্তাব করা হতো। সুরাট কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পদের জন্যে অভ্যর্থনা কমিটি কলকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ আইনজীবী ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করেছিল। জাতীয়তাবাদীগণের ইচ্ছা লালা লজপৎ রায় কিংবা তিলককে প্রেসিডেন্ট করা হউক। ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশনের দিন স্থির হয়েছিল। বাংলার ও মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদীগণ কংগ্রেসের নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই সুরাটে উপস্থিত হয়েছিলেন।

২৪শে ডিসেম্বর তারিখে সুরাটের এক জনসভায় শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ স্বদেশী প্রভৃতি প্রস্তাব চারটি যাতে অব্যাহত থাকে সে

বিষয়ে সতর্ক থাকতে জাতীয়তাবাদীগণকে অনুরোধ করেন। সভাতে খুব উৎসাহের সঞ্চার হয়। শ্রীঅরবিন্দ সভার সভাপতিরূপে মডারেট নেতাদের পত্র দিয়ে জানালেন কলকাতা কংগ্রেসে গৃহীত ঐ চারটি প্রস্তাব যদি সুরাট কংগ্রেসে বাদ দেওয়া হয় কিংবা প্রস্তাবগুলির রদ-বদলের চেষ্টা হয় তবে গোড়া থেকেই অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পদের জন্য কংগ্রেসে প্রস্তাব আনয়নের সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয়তাবাদীগণ বাধা দেবেন। শ্রীঅরবিন্দের ঐ পত্রের উত্তরে মডারেট নেতাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে কংগ্রেসের আলোচ্য কর্মসূচীতে ঐ প্রস্তাবগুলি রয়েছে। পত্র লেখক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। গান্ধীজীকে সেকালে ভারতবর্ষে বেশী লোক জানতো না। তিনি সেবার দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের ও ভারতী নেতাদের সমর্থন লাভের আশায় ভারতে এসেছিলেন। সুরাট কংগ্রেসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি কংগ্রেসের কোন একটি কাজে সাহায্য করবার অধিকার প্রার্থনা করেন; এবং তাঁকে কংগ্রেস সেক্রেটারীর অন্যতম সহকারীরূপে কাজ করতে দেওয়া হয়। তাই গান্ধিজী শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত পত্রের জবাব দেন। জাতীয়তাবাদীগণ নাকি কংগ্রেসের তরফে তৎকালে অজ্ঞাত অখ্যাত লোকটির জবাব পেয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। পরদিন ২৫শে ডিসেম্বর এক জনসভায় তিলক বললেন যদি উপরোক্ত প্রস্তাব চারটি অপরিবর্তিত অবস্থায় কংগ্রেসের কর্মসূচী থেকে বাদ দেওয়া না হয়, তবে জাতীয়তাবাদীগণ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচনে বাধা দেবেন না।

সুরাট কংগ্রেসের দক্ষ-যজ্ঞ

২৬শে ডিসেম্বর বেলা আড়াইটার সময় কংগ্রেসের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হলো। অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি ত্রিভুবন দাস মালবী তাঁর অভিভাষণ পাঠ করতে লাগলেন। সভাতে নেতৃগণ মঞ্চে উপবিষ্ট। গোখ্‌লে স্বহস্তে তিলকের হাতে কংগ্রেসের আলোচ্য প্রস্তাব সমূহের তালিকার এক কপি দিলেন। দেখা গেল কলকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাব চারটি তালিকায় রয়েছে রয়েছে সত্য; কিন্তু প্রস্তাবগুলি কলকাতা কংগ্রেসে যে আকারে পাস হয়েছিল তার পরিবর্তন করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদীগণের অসন্তোষের সীমা রইলো না। তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ স্থির করেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিপদে নির্বাচনে বাধা দেওয়া হবে।

যতক্ষণ নির্বাচিত সভাপতি আসন গ্রহণ না করেন ততক্ষণ অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতিকেই সভার কাজ চলাতে হয়। এইবার যথাবিধি সভাপতি নির্বাচনের পালা এলো। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মশাইয়ের নাম প্রস্তাব করবার জন্য দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ডেলিগেটগণ চারিদিক থেকে চীৎকার করে বলতে লাগলেন: Remember Midnapur, Remember Nagpur। গোলমাল আর থামে না। সুরেন্দ্রনাথের জোরালো কণ্ঠও গোলমালে চাপা পড়ে গেল। ত্রিভুবন দাস মালবী গোলমাল থামাবার জন্য বারবার ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন; কিন্তু তা-তেও কোন ফল হলো না। শেষে মালবী মশাই ঘোষণা করলেন কংগ্রেসের অধিবেশন সেদিনকার মতন ওখানেই শেষ হলো, এবং পরদিনের জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা হলো।

পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর নির্দিষ্ট সময়ে অধিবেশন সুরু হলো। ইতিমধ্যে তিলক জানিয়েছিলেন তিনি সভাপতি নির্বাচন-প্রস্তাবের এক সংশোধন-প্রস্তাব আনয়ন করবেন। কিন্তু মালবী মশাই তা-তে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করলেন না। তিনি এবং অন্যান্য মডারেট নেতারা ধরে নিলেন ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ যথাবিধি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন; এবং অধিবেশন আরম্ভ হলে ডাঃ ঘোষ তাঁর ছাপানো সভাপতির অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করলেন; কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হবার সুযোগ তিনি পেলেন না। তিনি সবেমাত্র বলেছেন Brother delegates, ladies, and gentlemen, এমন সময় তিলক গম্ভীরমুখে কিছু বলবার জন্য এগিয়ে এলেন। মালবী মশাই তিলককে বললেন, I declare you out of order (অর্থাৎ আপনার কাজ অবৈধ)। তিলক বললেন, I wish to move an amendment to the election of President (আমি সভাপতি নির্বাচন সম্বন্ধে এক সংশোধন-প্রস্তাব আনতে চাই)। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মশাই বললেন, I declare you out of order। তিলক বললেন, You have not been elected. I appeal to the delegates (আপনি এখনও সভাপতি নির্বাচিত হন নি; আমি উপস্থিত ডেলিগেটদের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করি)। তারপর সুরু হলো তাণ্ডব।

গুজরাটী এক ডেলিগেট নাকি একটা চেয়ার দ্বারা তিলককে আঘাত করতে উদ্যত হলে একটা মারাঠা চটি ধা করে ছুটে এলো। চটিটা নাকি সুরেন্দ্রনাথের

ঘাড়ের উপর পড়ে ছিটকিয়ে মেহতার গায়ে পড়ে। তখন শ্রীঅরবিন্দের ইঙ্গিতে যুবক মারাঠা ডেলিগেটগণ নেতাদের মঞ্চের উপর চড়াও হয়। নেতারা সব মঞ্চ থেকে প্রস্থান করলেন—সুরাট কংগ্রেসের এখানেই শেষ হলো। সুরাটের দক্ষ-যজ্ঞ ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ কী অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় তাঁরই নিজের কথায় "very few people know that it was I (without consulting Tilak) who gave the order that led to the breaking of the Congress and was responsible for the refusal to join the new-bangled Moderate Convention which were the two decisive happenings at Surat". (Sri Aurobindo on Himself and on the Mother p.-81).

সুরাটে কংগ্রেস ভেঙে গেলে জাতীয়তাবাদী ও মডারেট উভয় দলই নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করবার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে সমবেত হন। পূর্বোক্ত নেভিনসন সাহেব সুরাট কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয়বাদীগণ সুরাটে যে বৃহৎ সভায় সমবেত হন সে সভার সভাপতি হয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ আর তিলক ছিলেন বক্তা। সেই সভায়ও নেভিনসন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর নতুন পুস্তকে (The New Spirit in India) সেই সভার যে বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হিসাবে তা মূল্যবান। সেই পুস্তকে তিনি লিখেছিলেন : Grave and silent without saying a single word Mr. Aurobindo Ghose took the chair and sat unmoved with far-off eyes as one who gazes at futurity. In clear short sentences without eloquence or passion Mr. Tilak spoke till the stars shone, and someone kindled a lantern at his side. সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় এই যে প্রশান্তি তা-ই শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুরাটের কংগ্রেস সভার ঐ তাণ্ডবের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার—শ্রীঅরবিন্দের এক জন্মদিনে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সভায় বারীন্দ্রকুমার একথা বলেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মতন অল্পভাষী লোক বিরল। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁর কথা ছিল সরস ; এবং হাসি-তামাসাও তিনি বেশ করতেন।

এদিকে মডারেটগণও তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করেন। তারা মনে করলেন কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কর্মপন্থা পরিষ্কারভাবে নির্ণীত হওয়া দরকার।

এবং প্রত্যেক সভ্যকে এক অঙ্গীকার-পত্রে সই করে সেই লক্ষ্য ও কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে ; অঙ্গীকার-পত্রে সই না করলে কেউ কংগ্রেসের সভ্য হতে পারবে না। বলা বাহুল্য ঐ অঙ্গীকার-পত্রে বর্ণিত লক্ষ্য ও কর্মপন্থা জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য ও কর্মপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ; পূর্ণ-স্বাধীনতার কথা মুখেও আনা চলবে না ; ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসনই (তৎকাল প্রচলিত) হবে কংগ্রেসের স্থির লক্ষ্য ; আইন অমান্যের কথা ভাবাও চলবে না ; বৈধ উপায়ে আন্দোলন অর্থাৎ আবেদন নিবেদনই হবে কংগ্রেসের একমাত্র কর্মপন্থা।

গভর্নমেণ্টের দুমুখো নীতি ও জাতীয়তাবাদীদের সমস্যা

গভর্নমেণ্ট কংগ্রেস ভেঙে যাওয়াতে বিশেষ খুশী হলো, এবং উগ্র জাতীয়তাবাদীদের নিষ্পিষ্ট করার স্বর্ণ সুযোগ পাওয়া গেল ভেবে উল্লসিত হলো। গভর্নমেণ্ট এখন দুমুখো নীতি গ্রহণ করা স্থির করলো—সামান্য কিছু শাসন-সংস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে মডারেটদের নিজের দলে টানা, আর জাতীয়তাবাদীদের, ভারতের স্বাধীনতা কর্মীদের, চিরদিনের জন্য বিনাশ করা। লালা লজপৎ রায় নির্বাসন থেকে সদ্য মুক্ত হয়ে সুরাট কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি তিলক ও শ্রীঅরবিন্দকে বললেন যে নির্ভরযোগ্য সূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন জাতীয়তাবাদীদের বিনাশ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিলোপ গভর্নমেণ্টের স্থির সংকল্প। ইতিপূর্বেই ছাত্র-বিতাড়ন, সংবাদপত্র দলন, বিনাবিচারে নির্বাসন প্রভৃতি নির্যাতননীতি গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেছে ; এখন কংগ্রেসের ঐক্যনাশের সুযোগে নির্যাতনের মাত্রা ভীষণভাবে বৃদ্ধি করার নীতিই গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করবে। এ অবস্থায় জাতীয়তাবাদীদের কর্তব্য কী, তা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। কঠোরতর নির্যাতনের ফল দেশের উপর কী হবে ? দেশ কী তা সহ্য করতে পারবে, না নির্যাতনের ফলে আন্দোলনই দেশ থেকে বিলুপ্ত হবে ? জাতীয়তাবাদীদের সম্মুখে এই সমস্যা দেখা দিল।

শ্রীঅরবিন্দ বললেন আসুক নির্যাতন ; দেশ তা মাথায় পেতে নেবে এবং তার ফলে আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি হবে। পরে এক বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, সরকারের নির্যাতন হোল the hammer of God—হাতুড়ির ঘায়ে যেমন নরম লোহাকে শক্ত করা হয় তেমনি নির্যাতনের সম্মুখীন করে ভগবান দুর্বল মানুষকে পিটিয়ে ঋজু করে তোলেন। তিলক প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন দুঃসহ নির্যাতন সহ্য করবার মতন মনোবল দেশের লোকের নেই ; নির্যাতনের মাত্রা অতিরিক্ত হলে দেশ

থেকে আন্দোলনই লোপ পাবে। তাই তিলকের প্রস্তাব দেশের এই সংকটে দেশের ঐক্যনাশ হতে দেওয়া ঠিক হবে না। তিনি বললেন জাতীয়তাবাদীদের উচিত হবে মডারেটদের প্রস্তাবিত অঙ্গীকার-পত্রে সই করে কংগ্রেসে প্রবেশ করা, দেশে জাতীয়তাবাদীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে; এবং সংখ্যাধিক্যের জোরে ক্রমে জাতীয়তাবাদীদের হাতেই কংগ্রেসের কর্তৃত্ব আসতে বাধ্য। কিন্তু জাতীয়তা-বিরোধী অঙ্গীকার-পত্রে সই করতে শ্রীঅরবিন্দ রাজী হলেন না। একবার যে আদর্শ—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন নয়. পুর্ণ-স্বাধীনতা—গ্রহণ করা হয়েছে তার অন্যথা কিছুতেই করা নয়—এই হলো শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য। শেষে তিলক শ্রীঅরবিন্দের মতই গ্রহণ করলেন; এবং জাতীয়তাবাদীরা মডারেটদের থেকে পৃথক পথে চলাই স্থির করলেন।

এখানে একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নেভিনসন সাহেব বলেছেন তিলকের বৈশিষ্ট্য তাঁর রাজনৈতিক চাতুর্য, আর শ্রীঅরবিন্দের বৈশিষ্ট্য তাঁর ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস। কথাটা ঠিকই, দুই বন্ধুর মধ্যে গভীর মিল থাকা সত্ত্বেও অমিলও কিছু ছিল। দুজনই অসাধারণ পণ্ডিত; উভয়েই গীতাবাদী। তিলকের গীতার ব্যাখ্যাও—"শ্রীমদ্ভগবদগীতা রহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র"—গান্ধিজীর মতে জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় তিলককে উদ্দেশ করে বলেছিলেন "One who always sat by my side and was associated in my work etc."। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে এই দুই বন্ধুর পুর্ণ সহযোগিতার পালা সাঙ্গ হয় যখন শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপরও তিলক চেষ্টা করেছিলেন শ্রীঅরবিন্দকে রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ আর ফেরেন নি। ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর কর্মের সন্ধান তিনি তখন পেয়ে গেছেন।

সুরাটের পর কংগ্রেস

সুরাটের বিপর্যয়ের পর কংগ্রেস নামে রইলো মডারেটদের অধিকার। মডারেটগণ আবার কংগ্রেস নাম পরিবর্তন করে Moderate Convention এই "new-fungled" বা নবকল্পিত অসার নাম চালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু কংগ্রেস নামই শেষ পর্যন্ত বহাল থাকে। ১৯০৮ সনের ডিসেম্বরে অর্থাৎ সুরাট বিপর্যয়ের পরের বছর মডারেটগণ লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করেন। জাতীয়তাবাদীগণ অবশ্য অঙ্গীকার-পত্রে সই না করায় সেই কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন নি। অল্প লোকই লাহোরের ঐ কংগ্রেসে যোগ

দিয়েছিলেন এবং জাতীয়তাবাদীগণ উপহাস করে ঐ কংগ্রেসের নাম দিয়েছিলেন "মেহ্‌তা মজলিস"। শ্রীঅরবিন্দ তখন আলিপুর জেলে এবং তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে মান্দালয়ের জেলে সাড়ে ছয় বছরের জন্যে কারারুদ্ধ। কয়েক বছর জাতীয়তাবাদীদের কংগ্রেসে স্থান ছিল না। শেষে ১৯১৬ সনে প্রধানত তিলক ও থিয়োসফিষ্ট সোসাইটির নেতৃ এনি বেশান্ত মহাশয়ার চেষ্টায় জাতীয়তাবাদী-গণ আবার কংগ্রেসে যোগ দেন। ততদিন দেশের লোক মডারেট আদর্শের প্রতি আস্থা হারিয়ে জাতীয়তার আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে। মডারেট মতবাদ দেশ থেকে লোপ পেতে থাকে। শেষে আর একবার লাহোরে কংগ্রেসে ১৯২৯ সনে স্বাধীনতাই ভারতের লক্ষ্য, কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ যে পুর্ণ-স্বাধীনতার আদর্শ প্রথম প্রচার করেন এতদিনে কংগ্রেস তাকেই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে। অবশ্য তখন শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে পণ্ডিচেরীতে সাধনায় নিমগ্ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলের নিকট শিক্ষা

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক কর্ম ও আধ্যাত্মিক সাধনা এক সঙ্গে চলতো। এখন শ্রীঅরবিন্দের সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁর সাধনা স্বরু হয়। কয়েক বছর প্রাণায়াম অভ্যাসের পর শ্রীঅরবিন্দ অনুভব করলেন সাধন-পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য একজন সাধক গুরুর উপদেশ প্রয়োজন। বারীন্দ্রকুমার সেকালের একজন প্রসিদ্ধ যোগীকে জানতেন। এই যোগীর নাম বিষ্ণু ভাস্কর লেলে। তিনি ছিলেন গোয়ালিয়রের একজন মারাঠা ব্রাহ্মণ। লেলে মহারাজ ছিলেন একজন গৃহস্থ যোগী অর্থাৎ তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন না, তাঁর বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশে বারীন্দ্রকুমার লেলে মহারাজকে বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। সুরাট থেকে শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় যান; এবং সেখানে ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে, ২৮শে ও ৩০শে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কোন সময়ে বরোদায় লেলে মহারাজের সংগে শ্রীঅরবিন্দের দেখা হয়।

সুরাট কংগ্রেসের পর শ্রীঅরবিন্দের বরোদা যাওয়া প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ বরোদায় আসছেন শুনে বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ এই হুকুম জারী করেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত; তাই কলেজের ছেলেরা যেন তাঁকে কোন প্রকার সম্বর্ধনা না জানায়। অধ্যক্ষের এই আদেশ ছেলেরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ যে করে নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন শ্রীঅরবিন্দের গাড়ি কলেজের নিকট পৌছাল। কলেজের ছেলেরা অধ্যক্ষের আদেশ অমান্য করে কলেজ থেকে বের হয়ে এলো, এবং গাড়ির ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরা তাদের প্রিয় অধ্যাপকের গাড়ি টেনে নিয়ে চললো।

বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের উপস্থিতি শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। শহর-সুদ্ধ লোক তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর মুখের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুল হলো। শ্রীঅরবিন্দ একদিন মহারাজ গায়কোয়াড়ের সঙ্গে দেখা করলেন; এক প্রকাশ্য সভায় নাকি তাঁকে একবার দেখা গেল। তারপর আর কেউ তাঁর খোঁজ পেল না। তিনি তখন বরোদায় এক নির্জন গৃহে যোগী লেলের সংগে ধ্যানে মগ্ন।

লেলে মহারাজ জানতে চাইলেন শ্রীঅরবিন্দ কী উদ্দেশ্যে যোগ-পথে অগ্রসর হতে চান এবং সে পথে তিনি কতদূর অগ্রসর হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "I told him that I wanted to do yoga for work, for action, not for sannyasa and Nirvana—but after years of spiritual effort I had failed to find the way and it was for that I had asked to meet him. His first answer was, 'It would be easy for you as you are a poet.' (Sri Aurobindo On Himself p.-294); ঐ পুস্তকের ১২৬ পৃষ্ঠায় 'লেলে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সাধনায় কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন সে কথাও বলেছেন। তাঁর কথা: "After four years of Pranayam and other practices of my own, with no other result than an increased health and out-flow of energy, a great out-flow of poetic creation, a limited power of subtle sight (turminous patterns and figures etc.) mostly with the waking eye, I had a complete arrest and was at a loss." আর লেলে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাতের কয়েক মাস আগে ১৯০৭ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনী দেবীকে যে পত্র

লেখেন তা থেকেও শ্রীঅরবিন্দের তখনকার মনের অবস্থার, সাধনার অবস্থা জানতে পারা যায়। ঐ পত্রে তিনি লিখেছিলেন, "৮ই জানুয়ারী আসিবার কথা ছিল, আসিতে পারি নাই, সে আমার ইচ্ছায় ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন, সেইখানে যাইতে হইল। এইবার আমি নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে গিয়াছিলাম। আমার এইবার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, সে কথা এই পত্রে প্রকাশ করিব না। তুমি এখানে এসো, তখন যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব; কেবল এই কথাই এখন বলিতে হইল যে, এর পরে আমি আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান আমাকে নিয়া যাইবেন সেইখানেই পুতুলের মত যাইতে হবে; যাহা করাইবেন তাহা পুতুলের মত করিতে হইবে।" অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠ্ছিলেন। আমরা দেখব তাঁর সাধনমার্গ হলো আত্মসমর্পণ-মার্গ। সেই পথে ইতিমধ্যেই তিনি চল্ছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের কথা শুনে লেলে মহারাজ শ্রীঅরবিন্দকে নিজের বিশেষ সাধন-মার্গ শিক্ষা দিতে রাজী হলেন, কিন্তু একটি সর্তে। সর্তটি এই যে কিছুকাল শ্রীঅরবিন্দকে নির্জনে তাঁর সঙ্গে থাকতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ রাজী হলেন। লেলে মহারাজ বরোদার একটা বড় নির্জন বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে গেলেন। সেই বাড়িতে রইলেন কেবল লেলে মহারাজ ও তাঁর স্ত্রী আর শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার। লেলে মহারাজের স্ত্রী রান্না করেন। আহারাদির জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতীত অন্য সব সময় শ্রীঅরবিন্দ লেলে মহারাজের সম্মুখে বসে ধ্যান করেন। বরোদায় লেলে মহারাজের সম্মুখে বসে শ্রীঅরবিন্দ কী করতেন এবং তার ফল কী হয়েছিল তা জানা যায় দিলীপকুমার রায় মশাইকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের এক পত্র থেকে। ঐ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ যা লিখেছিলেন তার মর্ম এই: আমরা দুজনে মুখামুখি বসতাম। তিনি আমাকে যে নির্দেশ দিতেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম। তিনি যে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন, আমি কোথায় যাচ্ছি তা বুঝলাম না। এইরূপে তিন দিন কাটলো। তারপর আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো। অদ্বৈত বেদান্তের দেশকালের অতীত নির্বিশেষ (অর্থাৎ যাঁর কোন গুণ বা লক্ষণ নাই বলে যাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না) নিশ্চল, নীরব ব্রহ্মের অনুভূতি আমার লাভ হলো। আমার এই উপলব্ধি হলো সে এক অনির্বচনীয় ব্রহ্মই কেবল আছেন; সমস্ত জগৎ যেন তাঁর অস্পষ্ট ছায়া মাত্র। আমার দেহ তার দর্শন, স্পর্শন, চলন, বলন প্রভৃতি নিয়মিত কর্ম করে যেতো, কিন্তু সব কিছুই যেন ছিল এক অচেতন যন্ত্রের কাজ।

আর আমার মনও যেন সম্পূর্ণ শূন্য বোধ হলো। সঙ্গে সঙ্গে এক বিপুল আনন্দে আমার মন ভরে গেল।

লেলে মহারাজের প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ অন্যত্র (Sri Aurobindo on Himself p.-132) যা বলেছেন তার মর্ম : লেলের কাছে আমার এই মহা ঋণ। কী করে মনকে শূন্য করতে হয় চিত্তের সকল বৃত্তি নিরোধ করতে হয় তার এক উপায় তিনি আমাকে শেখান। তিনি আমাকে ধ্যান করতে বললেন ; কোন কিছুর চিন্তা না করে (গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৫শ শ্লোকের "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ") মনের দিকে তাকাতে বললেন। তিনি বললেন মনের দিকে তাকালে দেখা যাবে বাইরে থেকে চিন্তাগুলি একটার পর একটা মনের ভিতর এসে থাকে। সেই চিন্তাগুলিকে আসতে না দিলে এবং এই অভ্যাস দৃঢ় হলে মন শূন্য হয়। সাধারণত ধ্যানযোগে কোন একটি বিষয়ের ধ্যান করতে হয়। লেলে মহারাজ শেখালেন কী করে মন শূন্য করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের কথা : "I had never heard before of thoughts coming visibly into the mind from outside ; but did not think either of questioning the truth or the possibility ; I simply sat down and did it.···My mind became silent··· ; I saw one thought and then another coming in a concrete way from outside ; I flung them way before they could enter ; in three days I was free." (Sri Aurobindo On Himself p.-133)। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য এ কথাও বলেন, It is not to say that everybody can do it in the way I did. যাক্ লেলে মহারাজের প্রদর্শিত উপায়ে শ্রীঅরবিন্দের মন শূন্য হলো এবং তাঁর প্রথম অনুভূতি—নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি লাভ হলো। শ্রীঅরবিন্দ বলেন আকস্মিক ভাবে এবং অনভিপ্রেত ভাবেই তাঁর এই অনুভূতি হয়—অর্থাৎ এই অনুভূতির জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না তবু তাঁর এই অনুভূতি হয়েছিল। এই অনুভূতির অস্তিত্ব কিছুকাল ধরেই ছিল। লেলে মহারাজ ছিলেন ভক্তিপন্থী ; শ্রীঅরবিন্দের এই অদ্বৈতানুভূতি তার নিকট দুর্বোধ্য ছিল।

শ্রীঅরবিন্দ গোড়াতেই লেলে মহারাজকে বলেছিলেন তাঁর যোগ সাধনার লক্ষ্য অধিকতর কর্মশক্তি লাভ করে কর্ম করা। কিন্তু শূন্য মন নিয়ে তো কোন কাজ করা যায় না। অথচ ইতিপূর্বেই স্থির হয়ে আছে কলকাতায় ফেরবার

পথে শ্রীঅরবিন্দকে পুণা, বোম্বাই, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিতে হবে। তাঁর মনের এই শূন্য অবস্থায় কী করে তাঁর পক্ষে বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব হবে—এই হল শ্রীঅরবিন্দের সমস্যা। লেলে মহারাজ বরোদা থেকে পুণায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যান। শ্রীঅরবিন্দ লেলে মহারাজকে এই সমস্যার কথা বলে তাঁর পরামর্শ চাইলেন। লেলে মহারাজ শ্রীঅরবিন্দকে কী করতে হবে সে সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যে বাণীর আবির্ভাব তিনি অনুভব করেন (যার কথা শ্রীঅরবিন্দ মৃণালিনীদেবীর নিকট লেখা পত্রে উল্লেখ করেছেন) এবং যার নির্দেশে শ্রীঅরবিন্দ পুতুলের মত কাজ করে থাকেন, সেই বাণীর উপর শ্রীঅরবিন্দ কি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারবেন? শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে তা তিনি পারবেন। তখন লেলে মহারাজ বললেন, "তা হলে সভা-সমিতিতে কী বলবে তা নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। সভাতে শ্রোতাদের সম্মুখে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করো। যখন যা বলতে হবে তা আপনিই মনের উর্ধ্বতর স্তর থেকে তোমার মুখ থেকে বের হয়ে আসবে।" স্বভাবতই এখানে রবীন্দ্রনাথের গানের এই কলিটি মনে পড়ে:

"শূন্য করে রাখ তোমার বাঁশি।
বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি॥"

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করা গেল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের একটি মন্তব্য মনে পড়ে। মন্তব্যটি লেখক শুনেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের এক শ্রীঅরবিন্দভক্ত কর্মীর নিকট। শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্যটি এই: "রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের পথের পথিক।" তাই রবীন্দ্রনাথের ও শ্রীঅরবিন্দের অনুভূতি যে অনুরূপ হবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। জড়জগতে যেমন নিয়মের রাজত্ব, অধ্যাত্মজগতেও তেমনি নিয়মের রাজত্ব বিদ্যমান। সকল বৈজ্ঞানিক একই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হন; অধ্যাত্ম পথেও সকল সাধকের অনুভূতির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

লেলে মহারাজ যা বলেছিলেন তা-ই শ্রীঅরবিন্দের কর্মের মূলসূত্র। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়ার বক্তৃতার আরম্ভে বলেছিলেন যে সেই সভায় তিনি সভার পুর্ব-নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলবেন বলে প্রথমে স্থির করেছিলেন; কিন্তু তা আর হলো না। তার কথা: as I sat here, there came into my mind a word that I have to speak to you; এবং শ্রীঅরবিন্দের ভিতরে যে বাণী এলো তা-ই তাঁর মুখ থেকে বের

হলো। এ হলো inspiration বা অনুপ্রেরণা। যা বাইরে থেকে ভিতরে এসে থাকে। বস্তুত এর পর থেকে শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত কাজই যন্ত্ররূপে, পুতুলরূপে, তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হতো। (সাবিত্রী কাব্য রচনার সময় তিনি অনুভব করতেন কবিতাগুলি তিনি রচনা করেন না, কবিতাগুলি আপনিই আসে। কথিত আছে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতাও এইরূপে inspired হয়ে দিয়েছিলেন।) আর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন যে, মা যা বলান তা-ই তিনি বলেন। তাঁর সহজ সরল ভাষায় তিনি এই উপমাটি দিতেন যে তাঁর দেশে ধান মাপবার সময় একজন ধানের রাশি থেকে ঠেলে ঠেলে ধান মাপবার পাত্রে ভরে দেন এবং অপর একজন ধান মাপে। তাঁর কথা: তেমনি যা বলতে হবে মা-ই তা তাঁকে যুগিয়ে থাকেন। এ ব্যাপারের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়ত নেই; কিন্তু আমাদের বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসু মশাই অনুরূপে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন ১৯০১ সনে লেখা তাঁর রবীন্দ্রনাথের নিকট এক চিঠিতে। ১৯০১ সনের মে মাসে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত উদ্ভিদ, মানব ও জড়ের সাড়ার ঐক্য সম্বন্ধে বিলাতের বৈজ্ঞানিকদের নিকট বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁর কথা: "বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কী বলিব স্থির করিতে পারি নাই।......বৃহস্পতিবার দুপ্রহরের সময় একেবারে নিরুদ্যম হয়ে শয়ন করিয়াছিলাম......এমন সময় এক আশ্চর্য unscientific ঘটনা ঘটিল।......তারপর কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না। তার পরদিন যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম তারপরই যেন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল; কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল জানি না; যাহা পূর্বে ভাবি নাই তাহা মুহূর্তে পরিস্ফুট হইল। (বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৮৮০ শক)।

এইরূপে তাঁর জীবনের সাধনার মূলনীতি যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করা, তা শ্রীঅরবিন্দ লাভ করেছিলেন। এই মূলনীতি অনুসারেই তিনি চলতেন। বস্তুত সাধনপথে অন্তর্যামী গুরুর নির্দেশই ছিল তাঁর পথ-প্রদর্শক। লেলে মহারাজের সঙ্গেও তাঁর গুরু-শিষ্য সম্পর্কের অবসান হয়। বরোদার নির্জন সাধনার মাস দুই পরে ১৯০৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে বারীন্দ্রকুমারের আহ্বানে লেলে মহারাজ কলকাতায় আসেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর সাধনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শ্রীঅরবিন্দের মনে

সত্যতা
অদ্বৈতানুভূতির সভ্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না; কিন্তু ভক্তযোগী লেলে মহারাজ উপাস্য ও উপাসকের ভেদ স্বীকার করতেন; এবং সাধনার তা-ই ছিল মূলনীতি। তাই তাঁর মনে হলো শ্রীঅরবিন্দ ভুল পথে চলছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বললেন ও পথ ত্যাগ না করলে তিনি আর তাঁর সাধনার কোন দায়িত্ব নিতে পারবেন না; শ্রীঅরবিন্দও লেলে মহারাজকে দায়-মুক্ত করলেন। কোন মানব-গুরুর, কোন শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণ না করে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অন্তর্যামীর নির্দেশেই সাধন-পথে অগ্রসর হতেন। তবে তিনি লেলে মহারাজের ঋণ স্বীকার করতেন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গেই তাঁর কথা উল্লেখ করতেন।

বোম্বাইয়ের বক্তৃতা

বরোদা থেকে কলকাতা ফেরার পথে বিভিন্ন স্থানে শ্রীঅরবিন্দ কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে বোম্বাইয়ে "দেশের বর্তমান অবস্থা" (The Present Situation) সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এই বক্তৃতার প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ সরকার কর্তৃক জাতীয়তাবাদী পত্রিকা যুগান্তর ও নবশক্তির উপর নির্যাতনের উল্লেখ করে, জাতীয়তা ও জাতীয়তাবাদী কথা দুটির সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। জাতীয়তা কী, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন জাতীয়তাবাদ কেবল একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মপন্থা নয়—কেবল স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি কর্মপন্থা গ্রহণই জাতীয়তা নয়। জাতীয়তা তার অপেক্ষা অনেক বড় জিনিস—জাতীয়তা ধর্ম, বিধি-নির্দিষ্ট কর্মপন্থা। ঈশ্বরের নিকট থেকে এই ধর্ম এসেছে; এবং ঈশ্বরের আদেশ ব'লে ভারতবাসীকে এই জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করতে হবে। গভর্নমেণ্ট নির্যাতন দ্বারা জাতীয় আন্দোলন বন্ধ করতে চেষ্টা করছে; কিন্তু তা সম্ভব হবে না।—কারণ জাতীয় আন্দোলনের মূলে রয়েছে ঈশ্বরের স্পষ্ট অভিপ্রায়; এবং ইশ্বরের অভিপ্রায়কে কে বাধা দিতে পারবে? বাঙালী জাতীয় আন্দোলনের নেতা বলে গভর্নমেণ্ট বাঙালীর উপর নির্যাতন সুরু করেছে। কিন্তু বাঙালী যে দমে নাই তার কারণ বাঙালী বিশ্বাস করে জাতীয়-আন্দোলনের পিছনে রয়েছে ভগবানের সুস্পষ্ট অভিপ্রায়।

তারপর শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদীর লক্ষণ, জাতীয়তাবাদী হতে হলে কী কী গুণ থাকা চাই, তার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন এই গুণগুলি হলো গভীর বিশ্বাস, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থতা ও অটল সাহস। কেবল বুদ্ধির দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে জাতীয়তা আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী ফল রাজরোষ ও দুঃসহ

নির্যাতন। তাই বুদ্ধির বিচারে মনে হবে জাতীয় আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছু নয়। ভারতের জাতীয়তাবাদীর এমন কী শক্তি আছে যা নিয়ে তিনি ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন? এ প্রশ্নের উত্তর শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন। তিনি বলেন জাতীয়তাবাদী তো শুধু বিচার-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয় না; তিনি বলেন বিশেভাবে তাঁর হৃদয়ের নির্দেশে, তাঁর বিশ্বাসের জোরে। হৃদয়েই ভগবানের বাণী শোনা যায়, বোঝা যায়, বুদ্ধিতে নয়। জাতীয়তাবাদী বিশ্বাস করেন তাঁর ভিতর দিয়ে ভগবান নিজের কাজ করছেন। তাই ভগবানের অভিপ্রায় বলে জাতীয়তাবাদী যা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন তার দ্বারা তিনি চালিত হন। সে পথে চলতে গিয়ে তাঁকে যদি দুঃখভোগ করতে হয় তবে হাসিমুখেই তিনি সে দুঃখ বরণ করেন। জাতীয়তাবাদীর শক্তি তো এখানেই যে তিনি হাসিমুখে দুঃখ সহ্য করতে প্রস্তুত। এখানে তিনি অজেয়, এবং গভর্নমেণ্টের সকল বিরুদ্ধশক্তি এখানে ব্যর্থ।

জাতীয়তাবাদী নিঃস্বার্থ; তাই তিনি হাসিমুখে দেশের জন্য, দশের জন্য গভর্ণমেণ্টের নির্যাতন মাথায় পেতে নেন। আর সাহসে জাতীয়তাবাদী অটল, কারণ তিনি জানেন তিনি ভগবানের যন্ত্র; তাঁর ভিতর দিয়ে ভগবান নিজের কাজ করছেন। আর একথাও তিনি জানেন যে ভগবানের কাজ রোধ করে এমন শক্তি কারো নেই। তাই জাতীয়তাবাদী কখনও ভয়ে অভিভূত হন না।

শেষে শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় ও ইউরোপের জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ইউরোপীয় জাতীয়তার প্রধান লক্ষ্য বৈষয়িক উন্নতি; তাই শক্তি লাভ করে পৃথিবীর দুর্বল জাতিগুলিকে পদানত করতে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদীর দ্বিধা হয় না। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য স্বতন্ত্র। আমরা শ্রীঅরবিন্দের স্বরাজ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেখেছি যে তাঁর মতে ভারতবাসী স্বাধীন হয়ে দুর্বলতর জাতিগুলিকে উৎপীড়িত করবে না। স্বাধীন ভারতের ঋষিদের উপলব্ধ সত্য সমূহ অমূল্য ও পরম কল্যাণকর; এবং ঐ সত্য সমূহের প্রচারের দ্বারা সর্বজগতের কল্যাণ-সাধনের জন্যই ভগবান ভারতে জাতীয় আন্দোলন এনেছেন। আজ দেশে ভগবানের শক্তি অবতীর্ণ হয়েছে; এবং সে শক্তিকে কেউ রোধ করতে পারবে না। ভারত-বাসীকে বুঝতে হবে যে তার কাছে যে কাজের আহ্বান এসেছে তার

লক্ষ্য কেবল ভারতের মুক্তি নয়, সর্বজগতের কল্যাণ। ভগবান ভারতবাসীর দ্বারা তাঁর নিজের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন; ভারতবাসীকেও তার জীবন ভগবানের কাজ করবার উপযুক্ত করে গঠন করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের বোম্বাইয়ের এই বক্তৃতা লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল।

কেউ কেউ হয়ত বলবেন শ্রীঅরবিন্দের এই বক্তৃতা উপাসনা-বেদী থেকে কোন ধর্ম-উপদেষ্টার ভাষণের মতন শোনাচ্ছে; রাজনৈতিক বক্তৃতা-মঞ্চের উপযোগী অভিভাষণ এ নয়। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ একজন Mystic; এবং একজন Mystic জগতের সকল ব্যাপারের মূলে, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে ঈশ্বরের হাত দেখতে পান। তাই শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে এরূপ বক্তৃতা দেওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুত তাঁর সকল প্রধান বক্তৃতারই একটি মূল সুর ছিল এই যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূলে রয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার জয় হবেই হবে; তবে আন্দোলন সফল হতে হলে ভারতবাসীকে দুঃখ সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক বক্তৃতাগুলি সম্বন্ধে একথাটাও উল্লেখযোগ্য যে ঐ সব বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ কেবল ধর্মের কথাই বলেন নি, কাজের কথাও বলেছেন। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল অসামান্য, এবং বক্তৃতাগুলিতে শ্রীঅরবিন্দ দেশের সংকটে দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে যথার্থ পথ নির্দেশও করেছিলেন।

ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেস সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ

সুরাটের বিপর্যয়ের পর দেশের সম্মুখে যে এক সংকট দেখা দিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্থিরবুদ্ধি লোকেরা বুঝলেন জাতীয় আন্দোলন সফল হতে হলে কংগ্রেসের অনুরূপ কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রয়োজন; কোন দলীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের সফল পরিণতি সম্ভব নয়। নানা সভা-সমিতিতে দেশবাসীরা এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করে; এবং শ্রীঅরবিন্দও জাতীয়তাবাদীদের এই পরামর্শই দেন যে তাদের কর্তব্য নিজেদের মূলনীতিতে ও লক্ষ্যে অটল থেকে সর্বপ্রযত্নে ভাঙ্গা কংগ্রেস জোড়া দেবার চেষ্টা করা। আমরা দেখবো এই ছিল তাঁর দেশবাসীর প্রতি শ্রীঅরবিন্দের শেষ নির্দেশ।

সুরাট থেকে ফিরে এসে মাত্র ৪ মাস কাল তিনি দেশের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তারপর পুরা এক বছর কাল তাঁকে আলিপুর জেলে বন্দীদশায় কাটাতে হয়। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে। এই চার মাস কাল

তাঁকে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার কাজ, প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়ে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হতো; এক মুহূর্তের জন্য তাঁর বিশ্রাম ছিল না। এই সময়ে তাঁর দেওয়া কয়েকটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৮ সনের ১০ই এপ্রিল তারিখে কলকাতার সেকালে "পান্তির মাঠ" নামে খ্যাত স্থানে কলকাতাবাসীরা এক বৃহৎ সভায় সমবেত হয়েছিল। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল কী করে ভাঙ্গা কংগ্রেস জোড়া দেওয়া সম্ভব হবে। সভায় শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একজন প্রধান বক্তা। এই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে শ্রীঅরবিন্দের মতে জাতীয়তাবাদীগণ নিজেদের নীতি ও লক্ষ্য বিসর্জন না দিয়ে সর্বপ্রযত্নে যেন ভাঙ্গা কংগ্রেস জোড়া দিতে চেষ্টা করেন অর্থাৎ মডারেটদের সঙ্গে যথাসম্ভব একযোগে কাজ করেন। তবে মডারেটদের মতি-গতি দেখে তা সম্ভব হবে বলে তিনি খুব আশা করেন না। কিন্তু দেশের লোক যখন চায় কংগ্রেসের পুনর্জীবন তখন জাতীয়তাবাদীদেরও জনমতের অনুরোধে কংগ্রেসের পুনর্জীবনের জন্যে চেষ্টা করা উচিত।

বারুইপুর বক্তৃতা—এক গাছে দুই পাখির কথা

কলকাতার অদূরে বারুইপুরে এক সভা হয়; এবং নিমন্ত্রিত হয়ে সে সভায় শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল, ও শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী নেতৃগণ যোগ দেন। শ্যামসুন্দরবাবু ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক; এবং বক্তৃতা প্রসঙ্গে এ কথাটা একটু দ্বিধার সঙ্গে বলেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গের লোকেরা বেশী স্বদেশীভাবাপন্ন। তারপর শ্রীঅরবিন্দ বক্তৃতা দিতে উঠে বলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের লোক; এবং তিনি একথা বিনা দ্বিধায়ই স্বীকার করবেন যে পূর্ববঙ্গের লোকেরা পশ্চিমবঙ্গের লোকের অপেক্ষা বেশী "স্বদেশী"; এবং তার কারণ এই যে পূর্ববঙ্গের লোকদের বেশী নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। পুলিশের রেগুলেশন লাঠির প্রয়োগ পূর্ববঙ্গেই বেশী হয়েছে। তারপর তিনি ব্যক্তিগত মুক্তি ও জাতীয় মুক্তি লাভের উপায় কী তা শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডক উপনিষদের এক গাছে দুই পক্ষীর উপমাটির উল্লেখ করে বুঝিয়ে বলেন। আমরা দেখবো উপনিষদের এই উপমাটি তিনি একটু অন্যভাবে অন্যস্থানেও ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি যে ব্যাখ্যা করেছেন তা এই:

এক বৃহৎ বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষে মিষ্ট তিক্ত নানাবিধ ফল ধরে। বৃক্ষের উপরের ডালে একটি ও নীচের ডালে আর একটি অতি সুন্দর পাখি রয়েছে।

উপরের পাখিটি নিরাসক্ত, ফল খায় না, তাই তার সুখ দুঃখ নেই; নীচের পাখিটি উভয়বিধ ফলই খায়, ফলে সে কখনো সুখী কখনো দুঃখী। নীচের ডালের পাখি আর উপরের ডালের পাখি বস্তুত অভিন্ন; কিন্তু বৃক্ষের মিষ্ট ফল খেয়ে সে নিজেকে হীন মনে করে। তারপর যখন তিক্ত ফল খাবার অর্থাৎ দুঃখের পালা আসে তখন তার মায়া, মোহ, ভাঙ্গে; এবং উপরের পাখিই যে তার প্রকৃত আপন তা বুঝে সে মায়া-মুক্ত হয়। এই দুই পাখি পরমাত্মা ও জীবাত্মার উপমা এবং উপনিষদের শ্লোকের মর্মার্থ এই যে মুক্তি হয় দুঃখের ভিতর দিয়ে। তারপর শ্রীঅরবিন্দ বলেন: The parable is equally applicable to national "Mukti"; অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষেত্রে যেমন জাতীয় মুক্তির ক্ষেত্রেও (স্বাধীনতালাভের জন্যও) তেমনি দুঃখ আঘাত প্রয়োজন। বঙ্গ-ভঙ্গের ন্যায় তিক্ত ফল খাইয়ে লর্ড কার্জন আমাদের মোহ-ভঙ্গের ব্যবস্থা করেছিলেন। মোহ-ভঙ্গের পূর্বে ভারতবাসী নিজেকে স্বায়ত্ত-শাসনের অযোগ্য মনে করেছিল; সেই মোহ ভাঙ্গার ফলে সে স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হয়েছে। আর মায়া-বদ্ধ পাখি যেমন নিজের প্রকৃত স্বরূপকে জেনেই মুক্ত হয়, তেমনি ভারতবাসীকেও মুক্তির জন্য যা করতে হবে তা হলো to final swaraj within himself; এবং তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে free within is free without অর্থাৎ অন্তরের স্বাধীনতা লাভ হলে বাইরের স্বাধীনতাও আসে পরাধীনতার পাশ কাটে।

পাবনা কনফারেন্স

এই সময়কার বাংলা দেশের একটি স্মরণীয় ঘটনা ফেব্রুয়ারী মাসের (১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৮ সন) পাবনার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স। কনফারেন্সের সভাপতি হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; এবং সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে দেশের ঐ সংকটকালে দেশবাসীর প্রথম কর্তব্য গ্রামগুলির উন্নয়ন করা, গ্রামগুলিকে সংঘবদ্ধ করা। আমরা দেখেছি ১৯০৪ সনে তাঁর "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছিলেন, এবং তার ১১ বছর আগে ১৮৯৩ সনে বরোদায় থাকা কালে শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে একথা বলেছিলেন। সভাতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ দেশের যুবকদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন "তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থা-বদ্ধ কর; শিক্ষা দাও...... গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে

সে উৎসাহের সঞ্চার কর"। ঐ অভিভাষণে তিনি একথাও বলেছিলেন : "বর্তমান কালের বৈশিষ্ট্য organisation—জোট-বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা ; সমস্ত মহৎ গুণ থাকিলেও "ব্যূহের" নিকট কেবল সমূহ আজ টিকিতে পারে না।"

কিশোরগঞ্জে পল্লীসমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা

পাবনা কনফারেন্সের দুই মাস পরে এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "পল্লীসমিতি" বিষয়ক প্রসিদ্ধ বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের কথার অনুরূপ কথা বলেছিলেন। কিশোরগঞ্জ বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ যা বলেছিলেন তার সার মর্ম এই :

ভারতের অতীত ইতিহাসে দেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলির, দেশের "পল্লী-সমিতিগুলির স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত ঐ সমিতিগুলিই ছিল, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, secret of Indian vitality—অর্থাৎ দেশের উপর দিয়ে রাষ্ট্রবিপ্লব ও নানাবিধ ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছে, কিন্তু দেশ ও তার সংস্কৃতি যে টিকে আছে তার মূলে ছিল ভারতের পল্লীসমিতিগুলি। দেহের অসংখ্য কোষ সমূহের সঙ্গে গ্রামগুলি তুলনীয়। দেহ-কোষগুলি সুস্থ থাকলে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় ; তেমনি গ্রামগুলি সুব্যবস্থিত থাকলে সমগ্র দেশ সুশাসিত, সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। এ দেশের অতীতের শাসন-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসেবে এক দিকে ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ অসংখ্য গ্রাম, অপরদিকে ছিল পাটলিপুত্র, দিল্লী কেন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থা। অতীতে কেন্দ্রীয় শাসন বিদেশীর হস্তগত হলেও সে শাসন বিদেশীয় শাসন ছিল না ; সেই সব বিদেশীয় শাসক ভারতীয় হয়ে পড়তেন ; এবং তাঁদের শাসন জাতীয় শাসনই ছিল। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় সেই শাসন-ব্যবস্থায় the heart of the nation beat। গ্রামগুলি ও কেন্দ্রের মধ্যে যোগসূত্র ছিল জমিদার ; এবং শ্রীঅরবিন্দ এই সম্পর্কের একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এই যে সেকালে আজকার মতন জলকষ্ট কখনও হতো না ; তার কারণ The zeminder felt he was one with his tenants and could not justify his existence if they were suffering. কিন্তু আজ সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দেহের মধ্যে যেমন কর্কট বা Cancer রোগে এমন একটা মাংসপিণ্ড জন্মে যা দেহের ভিতর থেকেও দেহের অঙ্গ নয়। সেই মাংসপিণ্ডটা দেহের সকল সার শোষণ করে নিজে পুষ্ট হয়, এবং দেহের কোষগুলিকে ধ্বংস করে মৃত্যু ঘটায়। বিদেশীয় শাসন এমন একটা বাইরের জিনিস। তাই ইউরোপের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইউ-রোপীয়দের এই শিক্ষা দেয় যে foreign rule is inorganic, অর্থাৎ বিদেশীয়

শাসক ও শাসিতদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নয়—দুয়ের মধ্যে অন্তরের যোগের অভাব। বিদেশীয় শাসনের লক্ষ্য দেশের সকল কর্মের উৎস রুদ্ধ করে দেওয়া। তাই শাসিতদের প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্বরূপ নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলি কাজ করবার সুযোগের অভাবে ধ্বংস হয়; যেমন দেহের কোন একটা অঙ্গ দীর্ঘদিনের অব্যবহারের ফলে ক্রমশ লুপ্ত হয়ে আসে। বিদেশীর শাসনাধীনে আমাদের পল্লীসমিতিগুলি আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে; ফলে দেশের লোক আজ সকল ব্যাপারে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে, এমন কী আত্মরক্ষার ব্যাপারেও সরকারের পুলিশের উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন স্বরাজের অর্থই হলো organisation of national self-help, national self-dependence; অর্থাৎ জাতির প্রয়োজনীয় সকল কাজ, জাতির আত্মরক্ষা যদি জাতি নিজেই করে তবেই তার স্বরাজ আছে বোঝা যায়। তাই তিনি বলেন, if we are to organise Swaraj we must base it on the village অর্থাৎ পল্লীসমিতিগুলি পুনর্জীবিত করেই আমাদের স্বরাজের সূচনা করতে হবে। পল্লীতে গিয়ে যুবকদের যে সব কাজ করতে হবে তা রবীন্দ্রনাথ তার পাবনা কনফারেন্সের সভাপতির অভিভাষণে বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন we must take them all back into our hands.—আমাদিগকে আবার পল্লীতে পল্লীতে সেই সকল কাজের ভার গ্রহণ করতে হবে। শেষে শ্রীঅরবিন্দ বলেন: Another condition of Swaraj is that we should awaken the political sense of the mass; অর্থাৎ জনগণের মনে স্বাধীনতা-বোধ না জাগালে স্বরাজ আসবে না। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন আজিকার যুগ organisation বা সংগঠনের যুগ; আজ ব্যূহের বা organised mass-এর কাছে সমূহ বা unorganised mass টিকতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দও সে কথাই বলেছেন: This is the age of the people, the million, the democracy. If any nation wishes to survive in the modern struggle, if it wishes to recover or maintain Swaraj, it must awaken the people and bring them into the conscious life of the people. রবীন্দ্রনাথের ব্যূহবদ্ধ জনগণ, শ্রীঅরবিন্দের পল্লীসমিতির পুনর্জীবন এবং পরবর্তী কালের কংগ্রেসের গণ-সংযোগ আন্দোলন এবং গান্ধিজীর পরিকল্পিত গ্রামোন্নয়ন ও সর্বোদয় আন্দোলন, সকলেরই অভিপ্রায় এক—স্বরাজ বা

national self-help. শ্রীঅরবিন্দের এই সব বক্তৃতা থেকে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়; তাই এখানে বক্তৃতাগুলির সার কথা উল্লেখ করা গেল।

কর্মব্যস্ত জীবন নিয়ে বিব্রত শ্রীঅরবিন্দ

এইরূপে সুরাট থেকে ফেরার পর চার মাস কাল একদিকে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দান, বন্দেমাতরম্ পত্রিকার পরিচালনা প্রভৃতি কাজ অপরদিকে নিজের সাধন ভজন নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ খুবই কর্মব্যস্ত ছিলেন; তিনি মনে মনে বিষম বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। সুরাট কংগ্রেসের কয়েক দিন আগে ১৯০৭ সনের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে যে পত্র লিখেছিলেন তা থেকে তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থার একটা আভাষ পাওয়া যায়। ঐ পত্রে তিনি লিখেছিলেন; "আমার এইখানে এক মুহূর্তও সময় নাই; লেখার ভার আমার উপর, কংগ্রেস সংক্রান্ত সকল কাজের ভার আমার উপর, "বন্দেমাতরমের" গোলমাল মিটাইবার ভার আমার উপর। আমি পেরে উঠছি না। তাহা ছাড়া আমার নিজের কাজও আছে। (নিজের কাজ অর্থাৎ সাধন-ভজন) তাহাও ফেলতে পারি না।······চারিদিকে যে টান পড়েছে পাগল হইবার কথা।" আমরা দেখবো জেল থেকে বের হয়ে উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে তিনি ঐ সময় বুঝেছিলেন তাঁর পক্ষে নিরিবিলিতে কিছুকাল থাকা প্রয়োজন; কিন্তু কিছুতেই তিনি কাজ থেকে ক্ষান্ত হতে, কর্ম থেকে কিছুকালের জন্যও অবসর নিতে পারছিলেন না। তার কারণ কাজ ছিল তাঁর অতি প্রিয়। কিন্তু মে মাসের প্রথম ভাগে বোমার ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহ করে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং এক বছরের জন্য তাঁকে আলিপুরের জেলে বন্দীদশায় থাকতে হয়। কিন্তু জেলে যাওয়া তাঁর পক্ষে শাপে বর হলো—কাজের থেকে সম্পূর্ণ অবসর পেয়ে আত্ম-সমাহিত হবার এবং নতুন এক সাধনার রাজ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ তিনি লাভ করেন। আলিপুর জেলে বন্দীদশা তাঁর জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের ইতিহাস বলবার আগে আলিপুর বোমার মামলার পটভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আলিপুর বোমার মামলার পটভূমি

বাংলার বোমার ও বিপ্লববাদের উৎপত্তি

১৯০৬ সনের কলকাতা কংগ্রেসে স্বরাজ দাবী করা হয়। আমরা দেখেছি স্বরাজ বলতে মডারেটগণ বুঝতেন ক্যানাডা প্রভৃতি উপনিবেশের ন্যায় স্বায়ত্ত-শাসন; আর জাতীয়তাবাদীদের নিকট স্বরাজ কথার অর্থ ছিল পূর্ণ-স্বাধীনতা। অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় জাতীয়তাবাদীও সদ্য সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আশা করতেন না। স্বাধীনতার লক্ষ্যে যথাসময়ে পৌঁছবার সোপান হিসাবে সরকার যদি ভারতবাসীদের সত্যিকার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার আংশিক ভাবেও দেবার প্রস্তাব করতো তা হলে জাতীয়তাবাদীরাও তখনকার মতন সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু সেকালের ইংরেজ সরকার ভারতের উপর তার নিরঙ্কুশ অধিকার বিন্দুমাত্রও ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না; ত্যাগ করা প্রয়োজনও মনে করতো না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-ভার তখন পার্লামেন্টের উদার-নৈতিক দলের উপর ন্যস্ত। উদারনৈতিক দলের এক জন প্রধান ব্যক্তি প্রসিদ্ধ লেখক জন মর্লি তখন ভারত-সচিব, ভারতের হর্তা-কর্তা বিধাতা। জন মর্লি পার্লামেণ্ট সভায় এবং পার্লমেণ্টের বাইরেও ভারতে স্বরাজ-দাবীর বিরুদ্ধে তাঁর মত স্পষ্ট ব্যক্ত করেন। এক বক্তৃতায় তিনি ভারতের মডারেটদের, ক্যানাডার ন্যায় ঔপনিবেশিক শাসন দাবী প্রসঙ্গে বলেন: ক্যানাডা একটি শীতপ্রধান দেশ; সেখানকার লোকদের গায় fur coat মানায় ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তা মানায় না। অর্থাৎ তিনি স্পষ্ট করেই বললেন যে তাঁর মতে মডারেটদের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভের আশা দুরাশা মাত্র। আর এক বক্তৃতায় জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতা-দাবী প্রসঙ্গে তিনি বলেন: ভারতের জাতীয়তা-বাদীরা চায় হাতে আকাশের চাঁদ; তাঁর হাতে তো আর চাঁদ নেই যে তিনি জাতীয়তাবাদীদের চাঁদ দেবেন। আর যদি তার হাতে চাঁদ থাকতোও তবু তিনি তাঁদের চাঁদ দিতেন না। ভারতবাসীকে ইংরেজ কখনো স্বাধীনতা দেবে না; ইংরেজেরা এই সংকল্প যে অটল, তা মর্লিসাহেব ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন। বস্তুত সেকালের বলদৃপ্ত ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর সঙ্গে কোন প্রকার আপোষ-রফা করা মোটেই প্রয়োজন মনে করতো না। ছাত্র-নির্যাতন,

জাতীয়তাবাদী পত্রিকা দলন, বিনা বিচারে সরকার-বিরোধী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্বাসন, আর বিশেষভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি—এই সকল উপায়ের উপরই ছিল সরকারের নির্ভর। তার উপর নাম-মাত্র অসার শাসন-সংস্কারের টোপ ফেলে মডারেটদের জাতীয়তাবাদীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও জাতীয়তাবাদীদের বিনাশ করাও ছিল সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি।

ভারত-সচিবের বক্তৃতাগুলি এবং সরকারের অনুসৃত নির্যাতন-নীতি ভারতের স্বাধীনতা-কামী যুবকদের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করে। তারা বুঝলো ইংরেজ কখনো স্বেচ্ছায় তার ক্ষমতা বিন্দুমাত্র ত্যাগ করবে না। বাংলাদেশে বোমার আবির্ভাব ঐ নৈরাশ্যেরই ফল। তাইতো বারীন্দ্রকুমারের অন্যতম সহযোগী ও বোমার মামলায় যাবজ্জীবন নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত সুলেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাসন থেকে ফিরে এসে তাঁর "নির্বাসিতের আত্মকথা" নামক পুস্তকের ভূমিকায় দুঃখ করে লিখেছিলেন: "ভারতবর্ষে বিপ্লববাদের উৎপত্তির জন্য গভর্নমেণ্ট যতটা দায়ী এত আর কেহই নহে। আজ যে রিফর্মবিল (ভারত শাসন-সংস্কার প্রস্তাব) তাড়াতাড়ি বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করা হইতেছে তাহা যদি বিশ বছর পূর্বে সৃষ্ট হইত তাহা হইলে বিপ্লববাদের নামটি পর্যন্ত শোনা যাইত কিনা সন্দেহ।

মাণিকতলার বোমার আড্ডা—বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তি

১৯০৭ সনের ২৪শে জুলাই যুগান্তরের মামলায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের জেল হয়। ঐ সনের ২১শে আগষ্ট মর্লি সাহেব ইংল্যাণ্ডের আরব্রোথ নামক স্থানে যে বক্তৃতা দেন তা ছিল বিশেষভাবে নৈরাশ্যজনক। বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর সহযোগীগণ ভিন্নপন্থা অবলম্বন করা স্থির করেন। ঐ বক্তৃতার অল্প পরেই ২৮শে আগষ্ট তারিখে বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর সহযোগীরা যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদনা-ভার অপর লোকের হস্তে অর্পণ করেন। কলকাতার উপকণ্ঠে মানিকতলা অঞ্চলে ৩২নং মুরারিপুকুর রোডে বারীন্দ্রকুমারের একটি পৈত্রিক বাগানবাড়ি ছিল। বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর সহযোগী দেবব্রত বসু, অবিনাশ ভট্টাচার্য ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একটি বিপ্লবীদল গঠনে প্রবৃত্ত হন। তাঁরা ভাবী গেরিলাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি হিসাবে গোপনে এক দল আদর্শবাদী ত্যাগী যুবক সংগ্রহ করতে থাকেন; সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থাদি সংগ্রহ চলতে থাকে।

ধরা-পড়ার পর বারীন্দ্রকুমার এক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যে স্বীকারোক্তি করেন তা রাউলাট কমিটির রিপোর্টে উদ্ধৃত হয়েছে। কমিটির রিপোর্টের ঐ অংশের মর্ম এই : "১৯০৭ সনের গোড়ার দিক থেকে ১৯০৮ সনের এপ্রিল মাস পর্যন্ত (অর্থাৎ ধরা-পড়ার পূর্ব পর্যন্ত) আমি চোদ্দ পনর জন যুবক সংগ্রহ করি। তাদের আমরা শাস্ত্র ও রাজনীতি শিক্ষা দিতুম। আমরা দেশে সুদূর ভবিষ্যতে এক রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা ভাবতুম এবং সেজন্য প্রস্তুত হচ্ছিলুম। সবশুদ্ধ আমি ১১টি রিভলভার ৪টি রাইফেল ও ১টি বন্দুক সংগ্রহ করি। যে সব যুবক আমাদের দলে যোগ দেয় তাদের মধ্যে ছিলেন উল্লাসকর দত্ত। তিনি বলেন আমাদের দলে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে এবং আমাদের কাজে লাগবেন বলে তিনি বোমা তৈয়ার করতে শিখেছেন। তাঁর পিতা ছিলেন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ। উল্লাসকর পিতার অগোচরে গৃহে একটি লেবরেটরি তৈরী করেছিলেন এবং বোমা তৈরী নিয়ে পরীক্ষা করতেন। আমরা মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে উল্লাসকরের সাহায্যে অল্প পরিমাণ বোমা তৈয়ার করতে সুরু করি। আমাদের অপর এক সহযোগী, মেদিনীপুরের হেমচন্দ্রদাস, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং বোমা তৈয়ার করা শিখতে প্যারিসে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি দেশে ফেরেন এবং উল্লাসকরের সঙ্গে যোগ দেন। আমরা কখনও বিশ্বাস করতুম না রাজনৈতিক হত্যা দ্বারা দেশে স্বাধীনতা আসবে। রাজনৈতিক হত্যা আমরা করতুম এই জন্য যে আমাদের বিশ্বাস ছিল দেশের লোক তা চায়।" এইরূপে দেশে এক নতুন যুগের প্রবর্তন হয়—বোমা ও রিভলভারের সাহায্যে অবাঞ্ছিত লোকের হত্যার বা সন্ত্রাসবাদের যুগের সূচনা হয়।

বারীন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তার দলের ছেলেরা বাগানে কী করতো। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তারা উপেন্দ্রনাথ ও আমার নিকট ধর্মগ্রন্থ আর রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থাদি পড়তো।" এই প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক জষ্টিশ মুখোপাধ্যায় মশাই এক মামলায় বিপ্লবী যুবকদের যে শিক্ষা দেওয়া হতো সে সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন যে অপরিণতবুদ্ধি যুবকদের শেখানো হতো ভগবানের ইচ্ছার নিকট নির্বিচারে আত্মসমর্পণ হলো সর্বোচ্চ ধর্ম। যে কাজ করতে ঐ সব অপরিণত-বুদ্ধি যুবকের আতঙ্কে বিমুখ হবার কথা ঐ শিক্ষার ফলে সেই কাজই তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরমধর্ম মনে করে বিনা দ্বিধায় সম্পন্ন করতো। আর এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। বারীন্দ্রকুমারের দ্বিতীয় বারের

গুপ্তসমিতি ও প্রথমবারের গুপ্তসমিতির মধ্যে একটা বড় পার্থক্য এই যে দ্বিতীয়বারের গুপ্তসমিতিতে যুবকদের ধর্মশিক্ষার উপর বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হতো। ধর্মের নামেই বিপ্লবী যুবকেরা প্রাণের ভয় করতো না; এবং নিষ্কাম কর্মের নামে নিষ্ঠুর কর্ম করতে তাদের কোন দ্বিধা হতো না। গীতায় নিষ্কাম কর্মের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। রিভলভার ও বোমার ব্যবহার শেখার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী যুবকগণ নিয়মিত গীতা-পাঠে ও গীতার ধর্ম-পালনে—অর্থাৎ গীতার ধর্ম বলতে তারা যা বুঝতো তার পালনে যত্নবান ছিল। এই ছিল বোমার মামলার পটভূমি।

প্রথম বোমার ব্যবহার ও ক্ষুদিরামের ফাঁসি

১৯০৭ সনের ৬ই ডিসেম্বর তখনকার বাংলার ছোটলাট এণ্ড্রুফ্রেজার সাহেব উড়িষ্যা থেকে ট্রেনে ফিরছিলেন। পথে মেদিনীপুরের অদূরে নারায়ণগড় নামক স্থানে বারীন্দ্রকুমারের দলের লোক রেল-লাইনের নীচে একটি বোমা পুঁতে রেখে লাটসাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। বোমাটা ফাটে এবং রেললাইনের নীচে পাঁচফুট গভীর ও পাঁচফুটের মতন চওড়া একটা গর্ত হয়। এঞ্জিনটা জখম হয়; কিন্তু লাটসাহেবের কোন ক্ষতি হল না।

১৯০৮ সনের ১২ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেল সাহেবের গৃহে একটা বোমা নিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু মেয়র রক্ষা পান। চন্দননগরের ভিতর দিয়ে বাইরে থেকে বিপ্লবীরা বে-আইনি অস্ত্র আমদানি করতো। মেয়র অস্ত্র আমদানি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তাই তাঁর উপর এই আক্রমণ।

বিপ্লবীদের নরহত্যার এই দুই চেষ্টা ব্যর্থ হয়; কিন্তু ১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল তারিখে বিহারের মজঃফরপুর শহরে তারা যে বোমা ছোড়ে তার আঘাতে দুটি নিরপরাধ ইংরেজ মহিলার প্রাণনাশ হয়। বোমার লক্ষ্য ছিলেন কলকাতার প্রাক্তন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব। তিনি মজঃফরপুরের জেলাজজ। কলকাতায় কিংসফোর্ড সাহেব স্বদেশী মামলায় নিষ্ঠুর দণ্ড দিতেন। একজন ইউরোপীয় সার্জেণ্টের গালে চড়-মারার অপরাধে সুশীলচন্দ্র সেন নামক একজন চোদ্দবছরের বালককে বেত্রদণ্ডের আদেশ দিয়ে কিংসফোর্ড বাংলার বিপ্লবীদের বিশেষ বিরাগভাজন হন। ১৯০৮ সনের ৩০শে এপ্রিল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি নামক বারীন্দ্রকুমারের দলের দুটি বালক রাত্রির অন্ধকারে কিংসফোর্ড সাহেবের গাড়িভ্রমে অপর একটি গাড়ির উপর বোমা ছোড়ে। গাড়িটা কিংসফোর্ড সাহেবের বাড়ির ফটকে ঢুকতে যাচ্ছিল। বোমা

যখন ফাটে তখন গাড়িতে ছিলেন Mrs. Kennedy ও তাঁর কন্যা Miss. Kennedy। মহিলা দুটি বোমার আঘাতে নিহত হন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়। প্রফুল্ল চাকি ধরা পড়ার উপক্রম হলে নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করে। এরা দুজন স্বদেশীযুগের প্রথম বলি।

বোমার দলের গ্রেপ্তার

এই শোচনীয় ও অভাবনীয় ঘটনায় দেশে মহা হৈচৈ পড়ে গেল। পুলিশ কিছুদিন যাবৎ মুরারিপুকুরের বাগান বাড়িটির উপর নজর রাখছিল। বারীন্দ্রকুমার ও তাঁর সহযোগীদেরও এই সন্দেহ হয়েছিল। তাই দলের সকল লোক ঐ বাগান বাড়িতে না থেকে কেউ কেউ বিভিন্ন স্থানে থাকতো। মজঃফরপুরের ঘটনার পর পুলিশ আর কালবিলম্ব না করে ২রা মে ভোর রাত্রে বাগান ঘিরে ফেলে এবং বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে ও দলের কয়েকটি ছেলেকে গ্রেপ্তার করে। বাগানে কিছু বোমা, অস্ত্রশস্ত্র ও কাগজপত্র পুলিশের হাতে পড়ে। বারীন্দ্রকুমারের অপর সহযোগীদের অনেকে ঐ দিন বা দিন কয়েকের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ধরা পড়ে। যার বিরুদ্ধেই পুলিশ বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ পায়, তাকেই ধরে। এমন কী ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মশাইকেও পুলিশ সন্দেহবশে ধরে আলিপুর জেলে পুরেছিল। তাঁর অপরাধ পুলিশ যে সব কাগজ পায় তার কোন একটাতে তাঁর নামের উল্লেখ ছিল। ঐ নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জেলে এক ব্রাহ্মণ প্রহরী কর্তৃক আনীত শুধু গঙ্গাজল ও বেলপাতা খেয়ে কয়েক দিন কাটান। কয়েকদিন পরেই তাঁকে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বারীন্দ্রকুমারের প্রাক্তন সহযোগী ও বাংলার প্রথম গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠাতা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কয়েক বছর যাবৎ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছিলেন; তিনিও রেহাই পেলেন না। অবশ্য দিন কয়েক পরেই নিরপরাধ বলে তাঁকেও ছেড়ে দেওয়া হয়। কাগজপত্রে পুলিশ চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির নাম পায়। তার সন্ধান করতে গিয়ে পুলিশ চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের প্রফেসর চারুচন্দ্র রায় মশাইকে ধরে। তিনি ছিলেন ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে চন্দননগরের উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কানাইলাল দত্তের শিক্ষক। অতএব তিনি 'রায় চৌধুরী' না হয়ে শুধু রায় হলেও নিশ্চয়ই বিপ্লবী। তাঁর নির্দোষিতার একটি প্রমাণ পেয়ে গভর্নমেণ্ট তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়; কিন্তু তাঁকে অযথা বহু হয়রানি সহ্য করতে হয়েছিল। মোট কথা

বারীন্দ্রকুমারের দলের সন্ধানে পুলিশ কারণে অকারণে যাকেই সন্দেহভাজন বলে মনে করে তাকেই ধরে।

পুলিশের কবলে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ তখন বাংলা জাতীয়তাবাদী দৈনিক পত্রিকা নবশক্তির সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাই তিনি তাঁর স্কট লেনের বাসা ছেড়ে গ্রে ষ্ট্রীটে নবশক্তি পত্রিকার কার্যালয়ের উপরতলায় তখন বাস করছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও ভগিনী সরোজিনী দেবী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ২রা মে ভোর রাত্রে গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায় পুলিশ হানা দেয়। শ্রীঅরবিন্দ তখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত ছিলেন। তাঁর ভগিনীই প্রথম পুলিশের উপস্থিতি টের পান, এবং ব্যস্তসমস্ত হয়ে শ্রীঅরবিন্দকে খবর দিলে তিনি তাঁর ঘরের দরজা খোলেন। দরজা খোলা মাত্রই সশস্ত্র পুলিশ তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তাঁর কোমরে দড়ি বেঁধেছিল। পুলিশ কী তাঁর হাতে হাতকড়ি দিয়েছিল ? এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। Sri Aurobindo on Himself and on the Mother পুস্তকে (৮৭ পৃষ্ঠায়) আছে 'পুলিশ হাতকড়ি দেয় নি, কোমরে দড়ি বেধেছিল।' ('Hand cuffed'—No, tied with a rope ; this was taken off on the protest of Bhupen Bose, the Congress Moderate Leader) শ্রীঅরবিন্দ তখন খুবই জনপ্রিয়। তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনে বাংলার অন্যতম মডারেট নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু মশাই গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায় আসেন, এবং শ্রীঅরবিন্দ মতন একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির কোমরে দড়ি বাধার প্রতিবাদ করেন। পুলিশ তখন দড়ি খুলে নেয়। হাতে হাতকড়ির কথা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কারাকাহিনী পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। হয়ত প্রথমে হাতকড়ি দেওয়া হয়, এবং পরে হাতকড়ির বদলে কোমরে দড়ি বাধা হয় ; এবং তা-ও ভূপেন বাবুর প্রতিবাদের ফলে খুলে নেওয়া হয়। ক্রেগান নামক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে খানাতল্লাসী হয়, এবং তাঁর সহকারী ছিলেন কলকাতা পুলিশের নামজাদা ইন্‌স্পেক্টর বিনোদ গুপ্ত। ক্রেগানের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কিছু কথা কাটাকাটি হয়, এবং তাঁর হুকুমেই শ্রীঅরবিন্দের হাতে হাতকড়ি (?) ও কোমরে দড়ি দেওয়া হয়। পরে বিনোদ গুপ্তের অনুরোধে নাকি হাতকড়ি খুলে নেওয়া হয় ; এবং ভূপেন বাবুর প্রতিবাদের ফলে দড়িও খুলে নেওয়া হয়। পুলিশ বাড়িতে ঢুকে যখন শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে তখন গোলমাল শুনে পাশের

বাড়ির লোকেরা জাগে এবং জিজ্ঞাসা করে তারা কী সাহায্য করতে পারে। সরোজিনী দেবী তাঁর মেশো কৃষ্ণকুমার মিত্র মশাইকে খবর দিতে বলেন। একটি ছেলে সাইকেলে চড়ে সঞ্জীবনী অফিসে এসে খানা-তল্লাসের খবর দেয়। কৃষ্ণকুমার মিত্র মশাই গ্রে স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়ে হাতকড়ি ও দড়ির কথা শুনতে পান। তিনি বিনোদবাবুকে বলেন, 'মশাই আপনাদের এ কী রকম ব্যবহার ?" বিনোদবাবু নাকি বিনীতভাবে বলেন তাঁর দোষ নাই, তাঁর উপরওয়ালার এ-কাজ; তবে তিনিই অনুরোধ করে হাতকড়ি খুলিয়ে দেন। যাক্ শ্রীঅরবিন্দও প্রথমে একজন সাধারণ কয়েদীর মতন ব্যবহারই পুলিশের হাতে পেয়েছিলেন।

পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরে পুলিশ শ্রীঅরবিন্দের ঘর তল্লাসী করে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "কারাকাহিনী" পুস্তকে তল্লাসের সরস বর্ণনা দিয়েছেন। খানা তল্লাসের সময় মৃণালিনী দেবীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের পত্রগুলি পুলিশের হাতে পড়ে; বোমার মামলা চলা-কালে বিচারালয়ে পুলিশ সেগুলি দাখিল করে। এইরূপে গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য ঐ পত্রগুলি প্রকাশ্য আদালতে দাখিল হওয়ায় সেগুলি প্রকাশ করার বিপক্ষে আর ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ রইলো না; এবং পত্রগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পত্রগুলি থেকে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায়। শ্রীঅরবিন্দের ঘর থেকে পুলিশ আরো অনেক চিঠিপত্র, অপ্রকাশিত হাতের লেখা প্রবন্ধ প্রভৃতি নিয়ে যায়। মামলার বিচারকালে সেগুলি পুলিশ ও সরকার-পক্ষ কী ভাবে ব্যবহার করে তা আমরা দেখবো।

খানা-তল্লাসের পর শ্রীঅরবিন্দকে থানায় নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে তাঁকে লালবাজার হাজতে সেই রাত্রি রাখা হয়। লালবাজার কলকাতার পুলিশ কমিশনার হ্যালিডে সাহেব শ্রীঅরবিন্দকে বলেন, "দুটি নিরপরাধ মহিলার শোচনীয় মৃত্যুর কারণ এই কাপুরুষোচিত দুষ্কর্মের সঙ্গে লিপ্ত বলে কী আপনার লজ্জা হয় না?" শ্রীঅরবিন্দ উত্তরে বলেন, "এ কাজের সঙ্গে আমি লিপ্ত ছিলাম এই অনুমান করবার আপনার কী অধিকার আছে?" তদুত্তরে হ্যালিড সাহেব বলেন, "আমি অনুমান করছি না, আমি জানি।" শ্রীঅরবিন্দ বল্লেন, "আপনি কী জানেন আর না-জানেন, তা আপনিই অবগত আছেন। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সকল সম্পর্ক আমি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছি।" এর পর হ্যালিডে সাহেব আর কিছু বললেন না।

লালবাজার থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শ্রীঅরবিন্দকে রয়েড স্ট্রীটের গোয়েন্দা অফিসে নেওয়া হয়। সেখানে কৌশলে তাঁর মুখ থেকে অপরাধের স্বীকারোক্তি বের করবার জন্য গোয়েন্দাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শ্রীঅরবিন্দ পুলিশের হাল-চাল ভাল করেই জানতেন, এবং তাদের ফাঁদে পা দিলেন না। একজন গোয়েন্দা মিষ্ট ভাষায় নানা কথার পর তাঁকে অকস্মাৎ বলে, "বারীন্দ্রকুমারকে মুরারিপুকুরের বাগানে বোমা তৈরী করতে দিয়ে আপনি ভাল কাজ করেন নি।" শ্রীঅরবিন্দ হেসে বল্লেন, "আমি বারীনকে মুরারিপুকুরের বাগানে থাকতে দিয়েছিলাম, একথা কে আপনাকে বললে? বাগানে আমার যেমন অধিকার বারীনেরও তেমনি অধিকার। আর বোমা তৈরী করবার জন্য আমি বারীনকে বলেছিলাম তা-ও বা আপনি কার কাছে জানলেন।" এর পর গোয়েন্দা মশাই এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা বললেন না। প্রবর্তক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় মশাই শ্রীঅরবিন্দকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানতেন। তিনি বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ কূটনীতিতে বিচক্ষণ ছিলেন; এবং ইউরোপের কূটনীতি খুব ভাল করেই বুঝতেন। আমরা পরে যখন শ্রীঅরবিন্দের বক্তৃতাগুলি আলোচনা করবো তখন দেখবো একথা সত্য।

লালবাজার থেকে শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি কয়েদীদের কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট থর্নহিল সাহেবের কোর্টে উপস্থিত করা হয়। মামলার আসামীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল মুরারিপুকুর বাগান; ঐ বাগান ২৪ পরগণা জেলার সদর আলিপুর কোর্টের এলাকায় অবস্থিত। তাই থর্নহিল সাহেব আসামীদের বিচারের জন্য আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতিকে আলিপুর জেলে পাঠানো হলো। ১৯০৮ সনের মে মাসের ৫ই থেকে ১৯০৯ সনের ৫ই মে পর্যন্ত এক বছর কাল শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলে ছিলেন।

জেলে থাকার ব্যবস্থা

শ্রীঅরবিন্দ ও অন্যান্য আসামীদের প্রথমে জেলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে রাখা হয়। পরস্পরের সঙ্গে কিংবা জেলের অপর কয়েদীদের সঙ্গে তাঁদের আলাপ করতে দেওয়া হতো না। নির্জন কারাবাস অধিকাংশ লোকের পক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের নিকট নির্জন কারাবাস কষ্টকর না হয়ে বরং ধ্যান-ধারণার পক্ষে উপযোগীই হয়েছিল। তাই তিনি তাঁর এই একবছর কারাবাসকে তাঁর আশ্রমবাস বলেছেন। কিছুদিন প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ রাখার পর জেলের দুটি বড় কক্ষে সকলকে একত্র রাখার

ব্যবস্থা হয়। আসামীদের অনেককে শ্রীঅরবিন্দ জানতেন না। তাদের মধ্যে দুএকটি বালকও ছিল। কী ভাবে অধিকাংশ কয়েদীর সময় কাটতো সে সম্বন্ধে দু একটি কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাদের মাথার উপর যে ফাঁসির দড়ি ঝুলছে, যুবক ও বালকদের অনেকেই সে কথা ভুলে নানাপ্রকার হল্লা ও ফুর্তি করে সময় কাটাতো। শ্রীঅরবিন্দ ও দেবব্রত বসুর ন্যায় দুএকজন ঐ গোলমালের মধ্যেই তাঁদের ধ্যান ধারণা নিয়ে থাকতেন। কিছুদিন পরে বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই জেলের ভিতরে নিহত হয়; সে কথা যথাস্থানে আমাদের বলতে হবে। নরেন গোঁসাইয়ের হত্যার পর শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি সকল কয়েদীকে আবার ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ করা হয়। পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা নিষিদ্ধ হয়। তবে আদালতে যাবার সময় পথে গাড়িতে এবং আদালত কক্ষেও তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা চলতো। তাই যুবক ও বালক আসামীরা বিচারালয়ে যাবার জন্য উৎসুক হয়ে থাকতো। বিচারের ফল কি হবে তা দিয়ে তাদের বিশেষ উদ্বিগ্ন দেখাতো না। এই নতুন ব্যবস্থায় নির্জন কক্ষে শ্রীঅরবিন্দ বিনা অসুবিধায় তাঁর অভ্যস্ত ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হবার সুযোগ পান।

জেলে শ্রীঅরবিন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতা

জেল থেকে বের হয়ে ১৯০৯ সনের ৩০শে মে তারিখে শ্রীঅরবিন্দ উত্তর পাড়ায় লাইব্রেরী গৃহে যে বক্তৃতা দেন তা থেকে আমরা তাঁর জেল-অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। তিনি তাঁর "কারাকাহিনী" পুস্তকেও পুলিশের কবলে পড়বার পর তাঁর মানসিক অবস্থার কথা বলেছেন। সে সম্বন্ধে উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় তিনি যা বলেছিলেন তার মর্ম নিম্নে দেওয়া গেল। বোমার মামলার সম্পর্কে আমাকে গ্রেপ্তার করা হলে প্রথমে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। আমার মনে সংশয় দেখা দেয়। এতকাল আমার বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরের ইচ্ছা আমি দেশের জন্য কাজ করি; এবং যতদিন আমার কাজ শেষ না হবে ততদিন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন। তবে কেন আমার কাজ শেষ হবার আগেই এরূপ অভিযোগে পুলিশ আমাকে ধরলে? আমি তখন বুঝি নাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী। এইরূপে একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল। তারপর আমাকে আলিপুর জেলে নেওয়া হল। সেখানে আমি অন্তরে এই বাণী যেন শুনলাম "ধৈর্য্য ধর, অপেক্ষা করে দেখ।" (শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা : 'A voice come to me from

within 'wait and see')। তখন আমার মন শান্ত হলো। আলিপুরের নির্জন কক্ষে দিন-রাত অপেক্ষা করে আছি, কবে আবার অন্তরে ঈশ্বরের বাণী শুনবো এবং আমার পক্ষে করণীয় কি তা বুঝতে পারবো। শেষে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হলো, আমার প্রথম শিক্ষা লাভ হলো (earliest realisation, the first lesson)। আমার মনে পড়লো যে গ্রেপ্তারের এক মাস বা তারও আগে আমার উপর প্রত্যাদেশ হয়েছিল (a call had come to me) কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করে নির্জনে থাকার জন্য ; এবং নিজের গভীর অন্তরে প্রবেশ করে ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্টতর ভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য আমার উপর আদেশ এসেছিল, একথা আমার মনে পড়লো। কিন্তু আমি তখন কাজে মগ্ন। কাজ আমার প্রিয়। অহংকার-বশে আমার তখন বিশ্বাস ছিল যে আমি নিজে না করলে অন্য কারো দ্বারা সে কাজ হবে না। এখন আলিপুর জেলে কর্ম থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়ে আমি অনুভব করলাম ভগবান যেন আমাকে জেলে এনে বুঝিয়ে দিলেন যে অহংকার-বশত কিংবা হৃদয়ের দুর্বলতার জন্য যে বন্ধন নিজে ছিন্ন করতে পারি নি, সে বন্ধন ভগবানই নিজে ছিন্ন করে দিলেন। আমি বুঝলাম আমার শিক্ষার জন্যই এই কারাবাস, এই কর্ম থেকে বিরতি। তারপর আমার হাতে গীতা এলো এবং ভগবানই আমাকে গীতার সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন। আগে আমি বুঝি নি, এখন ভাল করে বুঝলাম যে যাঁরা ভগবানের কাজ করতে চান তাঁদের নিজ ইচ্ছা অনিচ্ছা ত্যাগ করতে হয় ; ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে, ভগবানের হাতে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করতে হয় ; কাজের সফলতা বা বিফলতা দুই-ই সমভাবে গ্রহণ করতে হয়।"

আলিপুর জেলে এই হলো শ্রীঅরবিন্দের প্রথম অভিজ্ঞতা ; কিন্তু একমাত্র বা প্রধান অভিজ্ঞতা নয়। শ্রীঅরবিন্দের জীবন কয়েকটি বিশেষ উপলব্ধির উপর গঠিত। এই উপলব্ধিগুলির মধ্যে চারটি উপলব্ধি প্রধান। বরোদায় লেলে মহারাজের সঙ্গে ধ্যানকালে তাঁর প্রথম প্রধান উপলব্ধি—অদ্বৈত বেদান্তের নির্বিশেষ ব্রহ্মের বা 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মের উপলব্ধি—লাভ হয়েছিল। আলিপুর জেলে তাঁর দ্বিতীয় প্রধান উপলব্ধি—বাসুদেবঃ সর্বমিতি—লাভ হয়। এই দ্বিতীয় উপলব্ধিটি যেন প্রথমটির পরিপুরক। জেলে নির্জন কারাকক্ষে কিছুকাল থাকার পর জেলের কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন দুবেলা আধ ঘণ্টার জন্য তাঁকে তাঁর কক্ষের সম্মুখে পায়চারি করতে অনুমতি দেন। এসব কথা তিনি তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতায়

বলেছেন। যখন তিনি কক্ষের বাইরে পায়চারি করতেন, তখন একদিন অকস্মাৎ তাঁর এই উপলব্ধি হলো যে তিনি আর দেওয়ালের মধ্যে বন্দী নন—তাঁর চারিদিকে রয়েছে জেলের দেয়াল নয়; চারিদিকে তাঁকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব। কক্ষের সম্মুখে যে গাছের তলায় তিনি বেড়াতেন সেই গাছকে তাঁর আর গাছ বলে মনে হলো না; মনে হলো বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই তাঁর মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে রয়েছেন। জেলের কয়েদীদের মধ্যেও—চোর, ডাকাত বলে যারা বন্দী, তাদের মধ্যেও তিনি বাসুদেবকে দেখলেন। উপনিষদের একটি মহাবাক্য 'একমেবাদ্বিতীয়ং'; উপনিষদের অপর মহাবাক্য 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। বরোদায় ও আলিপুর জেলে এই দুই মহাবাক্যের উপলব্ধি শ্রীঅরবিন্দ লাভ করেন।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। সাধারণ লোকের নিকট, matter-of-fact বা বাস্তববাদী লোকের নিকট শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত উপলব্ধি অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। সাধারণ লোক জেলের ভিতরে শ্রীঅরবিন্দের বাণী শোনা বা প্রত্যাদেশ লাভ প্রভৃতি ব্যাপারকে শ্রীঅরবিন্দের অবচেতন মনেরই ভেল্কি বলে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবে। কেউ কেউ জেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে উপহাসও করেছেন। The Indian Social Reformer পত্রিকার সম্পাদক মিঃ নটরাজন ও The Bengalee পত্রিকার বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তো জেলের ভিতরে বাসুদেবের দর্শন-লাভ কথাটা হাস্যকর বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য বিদ্রূপে বিচলিত হবার লোক ছিলেন না; এবং ঠাট্টা বিদ্রূপে কিছুতেই তাঁর অভিজ্ঞতার সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহের কোন ছায়াপাত হয় নি; তাঁর কথা যে সেগুলি তাঁর 'living experiences'। মোট কথা শ্রীঅরবিন্দ একজন অসাধারণ মানুষ; তাঁর জীবন-কথা সর্বতোভাবে একজন সাধারণ লোকের জীবন-কথার ন্যায়ই হবে এরূপ আশা করা যায় না। পাঠককে অসাধারণ কথা শুনবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বোমার মামলার বিচার

আলিপুর ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে প্রাথমিক তদন্ত

আলিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি সাহেবের কোর্টে বোমার মামলার প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ হয় ১৯০৮ সনের ১৯শে মে। আসামীদের বিরুদ্ধে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, যুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র করা, বে-আইনি অস্ত্র-রাখা প্রভৃতি ফৌজদারী দণ্ডবিধির আট-নয়টি ধারার অপরাধের অভিযোগ আনা হয়। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করার শাস্তি প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ; অন্য অপরাধগুলির জন্যও আইনে দীর্ঘ মেয়াদের বিধান রয়েছে। ১২ই সেপ্টেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট প্রাথমিক তদন্ত শেষ করে শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতি ছত্রিশ জন আসামীকে আলিপুরের দায়রা কোর্টে সোপর্দ করেন। শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। গভর্নমেণ্টের বক্তব্য বারীন্দ্রকুমার ছিলেন দলের নেতা ; এবং শ্রীঅরবিন্দ পেছন থেকে বুদ্ধি ও প্রেরণা দিতেন।

এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে একজন, নাম নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, রাজসাক্ষী হয়। নরেন গোঁসাই তার এজেহারে শ্রীঅরবিন্দ ও আরো অনেককে জড়িয়েছিল। সময় বাঁচাবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজসাক্ষীর জেরা হবে দায়রা কোর্টে। জেরা না হলে সাক্ষীর সাক্ষ্য আইন মতে অগ্রাহ্য। দায়রা কোর্টে বিচার আরম্ভ হওয়ার আগেই ১৯০৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর আসামীদের মধ্যে দুজন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল দত্ত, জেলের ভিতরে বিশ্বাস-ঘাতক রাজসাক্ষীকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে। নিজেদের ফাঁসি নিশ্চিত জেনে বাংলার ঐ দুই বীর যুবক দলের স্বার্থে এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নরেন গোঁসাইয়ের সাক্ষ্য যাতে গৃহীত না হতে পারে সেজন্য বিশ্বাস-ঘাতককে হত্যা করে। ফলে তার সাক্ষ্য দায়রা কোর্টে গৃহীত হলো না।

বিচারে কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয়। কানাইলাল আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টা করলেন না। ফাঁসির আদেশের পর কানাইলালকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি হাইকোর্টে আপিল করবেন কিনা। তিনি আপিল করতে অস্বীকার করেন। কথিত আছে ফাঁসির আদেশের পর তাঁর দেহের ওজন বৃদ্ধি পায়। ফাঁসির আগের দিন জেলের উঠানে কানাইলাল তাঁর সহযোগী

আসামীদের কারাকক্ষের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বিদায়-নমস্কার করেন। মৃত্যুর দিন ভোর রাত্রে ম্যাজিস্ট্রেট ও জেল কর্তৃপক্ষ ফাঁসি-মঞ্চে কানাইলালকে নেবার জন্য যখন কানাইলালের কক্ষে যান তখন তাঁরা দেখে স্তম্ভিত হন যে কানাইলাল শান্তচিত্তে নিদ্রামগ্ন! ধীর শান্তভাবে কানাইলাল ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণ করেন। বারীন্দ্রকুমার তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "কানাইলালের মরণের মহত্ত্ব যাইবার নয়; যে কোন দেশে কানাইলালের তুলনা নাই।" উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় কানাইলালের অপূর্ব শান্তভাবে মৃত্যুবরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন: পতঞ্জলি চিত্তস্থির করবার, মনকে শান্ত করবার নানা উপায় বর্ণনা করেছেন। কানাইলালকে দেখে একথাটাই মনে হয় যে চিত্তস্থির করবার সব উপায় পতঞ্জলিরও বোধ হয় জানা ছিল না। সে কথা থাক্। সহস্র সহস্র লোক সেদিন শ্মশানে কানাইলালের শবদেহের অনুগমন করে। সারা পথ তাঁর শবদেহের উপর জানালা থেকে পুষ্প বর্ষণ করা হয়। শ্মশানে প্রায় পাঁচশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলেছিলেন, "যদি স্বর্গ থাকে তবে নিশ্চয়ই তোমার স্বর্গলাভ হবে।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় বোমার মামলার অভিযুক্ত যুবকদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, "In many of them I discovered a mighty courage, a power of self-effacement in comparison with which I was simply nothing." তিনি বলেছিলেন দেশে এক অসাধারণ যুবকদলের আবির্ভাব হয়েছে। এই যুবকদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়

"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"

কানাইলাল ছিলেন এই মৃত্যুঞ্জয়ী যুবকবৃন্দের অগ্রণী। সত্যেন্দ্রনাথও বীরের মতই মৃত্যুকে বরণ করেন।

আলিপুরের দায়রা জজের কোর্টে বিচার

আলিপুরের বোমার মামলা এদেশের ফৌজদারী মামলার ইতিহাসে বিখ্যাত। ১৯০৮ সনের ১৯শে অক্টোবর আলিপুরের সহকারী দায়রা জজ বিচক্রফ্‌ট সাহেবের এজলাসে মামলা সুরু হয়; শেষ হয় ১৯০৯ সনের ৫ই মে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই বিচক্রফ্‌ট সাহেব আর শ্রীঅরবিন্দ একই সময়ে কেম্ব্রিজে ছিলেন, এবং একই বছর তাঁরা I. C. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; আর সেই পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ গ্রীক ভাষায় প্রথম এবং বিচক্রফ্‌ট সাহেব

দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দুজন এসেসরের সাহায্যে মামলার বিচার হয়। এই বিরাট মামলায় সরকার পক্ষ থেকে ২০৩ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়; সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানে ও জেরাতে ১৪১ দিন লেগেছিল। এই মামলায় যে সকল চিঠিপত্র ও শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধাদি আদালতে পেশ করা হয় তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। সরকার প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে বারীন্দ্রকুমার ছিলেন ষড়যন্ত্রের নায়ক এবং শ্রীঅরবিন্দ আড়াল থেকে বুদ্ধি যোগাতেন। শ্রীঅরবিন্দ অপর আসামীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, একথাটা প্রমাণ করার জন্য গভর্নমেণ্ট যে চেষ্টার *ত্রুটি* করে নি, সাক্ষী প্রভৃতির উপরোক্ত বিপুল সংখ্যা এবং মামলার জন্য মুক্ত হস্তে অর্থব্যয়ই তার প্রমাণ। সরকার পক্ষের প্রধান কৌন্সিল নর্টন সাহেব দৈনিক এক হাজার টাকা পেতেন। জজও বলেছেন শ্রীঅরবিন্দকে দোষী প্রমাণ করাই ছিল সরকারের প্রধান লক্ষ্য।

ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে প্রসিদ্ধ কৌন্সিলী ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (B Chakravarti) শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। দায়রা আদালতে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন তাঁর বন্ধু উদীয়মান ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই (C. R. Das)। দাশ মশাই তাঁর অভূতপূর্ব দেশ-সেবার ও ত্যাগ স্বীকারের জন্য তখনও দেশবাসীর নিকট থেকে "দেশবন্ধু" এই আখ্যা লাভ করেন নি।

স্মরণ রাখতে হবে যে শ্রীঅরবিন্দের মামলার ব্যয়ভার বহনের জন্য তাঁর ভগিনী দেশবাসীর নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন। প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট থেকেই কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা ওঠে; কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় বলেছিলেন যে দিনের পর দিন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত জেগে থেকে, নিজের স্বাস্থ্যের হানি ও বিপুল আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার শাস্তি হোল প্রাণদণ্ড। সরকার পক্ষের কৌন্সিলী নর্টন সাহেবের যুক্তিজাল এমন বিচক্ষণতার সঙ্গে দাশমশাই খণ্ডন করেন যে জজ শ্রীঅরবিন্দকে খালাস দিতে বাধ্য হন।

শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে তাঁর কৌন্সিলীর জবাব

শ্রীঅরবিন্দ মামলার ফলের জন্য একটুও উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তাঁর বরাবরই বিশ্বাস ছিল তিনি খালাস পাবেন। মোকদ্দমা চলাকালে তিনি

আদালতের কাজে বিশেষ মন দিতেন না; নিজের চিন্তায়ই নিবিষ্ট থাকতেন। দায়রা কোর্টে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি নিজের স্বপক্ষে কিছু বলবেন কিনা। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন তাঁর পক্ষে যা বলবার তা তাঁর কৌন্সিলীই বলবেন; তিনি নিজে কোর্টের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না। দাশ মশাই শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে জবাব দাখিল করেন; এবং গোড়াতেই বলেন যে যদি স্বাধীনতা কামনা করা কিংবা স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা অপরাধ হয় তবে শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন তিনি অপরাধী, এবং তাঁর অপরাধের শাস্তি তিনি প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করবেন। তার পর ঐ জবাবে দাশ মশাই বলেন যে ধর্মমতে শ্রীঅরবিন্দ একজন বৈদান্তিক, এবং শ্রীঅরবিন্দের মতে বেদান্তই জগতের ভাবী ধর্ম; জগতে বেদান্ত-প্রচারই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কর্তব্য মনে করতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও শ্রীঅরবিন্দ বেদান্ত প্রয়োগ করে থাকেন। বেদান্ত বলে নিজের ভিতরেই যে ঈশ্বর রয়েছেন তাঁর উপলব্ধি করলেই মানুষ মুক্তি লাভ করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর দেশবাসীর প্রতি শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ—তোমরা ভয় ত্যাগ করে আত্মকর্তৃত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের জন্য সচেষ্ট হও। বাইরে থেকে কেউ তোমাদিগকে সাহায্য করতে পারবে না। দেশের চিরন্তন পথে তোমাদিগকে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করতে হবে। তিনি দেশবাসীর সম্মুখে যে কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন তা-তে বোমা বা ষড়যন্ত্রের কোন স্থান নেই। তাঁর অভিমত যারা আইন মেনে চলতে পারে না তারা দেশ-শাসনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। তবে তিনি তাঁর দেশবাসীদের একথাও বলেন যে সরকারের কোন আইন যদি অন্যায় বিবেচিত হয় তবে বিবেকের অনুরোধে সেই অন্যায় আইন অমান্য করাই সঙ্গত। তবে শ্রীঅরবিন্দের মত এই যে অন্যায় আইন অমান্য করার অধিকার থাকলেও হিংসার আশ্রয় নেবার কোন অধিকার আইন-ভঙ্গকারীর নেই; আইন-ভঙ্গকারীকে আইন অমান্য করার শাস্তি গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আইন-ভঙ্গের শাস্তি যদি হয় জেল, তবে জেলেই যেতে হবে; কিন্তু কোন মতেই হিংসার পন্থা গ্রহণ করা চলবে না। দাস মশাই বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance) বিষয়ক ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি জজ ও এসেসরদের নিকট পড়ে তাঁর বক্তব্য প্রমাণ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলির শ্রেণীবিভাগ

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য ব্যতীত যে সব কাগজপত্রের উপর নর্টন সাহেব নির্ভর করেছিলেন, সেগুলিকে এই কয় শ্রেণীতে ভাগ করা চলে :—

১। মৃণালিনী দেবীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের কয়েকখানা চিঠি।

২। শ্রীঅরবিন্দের লেখা অন্যান্য চিঠি।

৩। শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি বক্তৃতার রিপোর্ট।

৪। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত (শ্রীঅরবিন্দের) প্রবন্ধ সমূহ।

৫। খানা-তল্লাসীর সময় প্রাপ্ত শ্রীঅরবিন্দের দুটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ এবং একটা খাতায় কিছু হিজিবিজি লেখা।

৬। মিঠাইয়ের চিঠি (Sweets letter)।

প্রথমে মৃণালিনী দেবীকে লেখা পত্রের কথা ধরা যাক্। ১৯০৫ সনের ৩০শে আগষ্ট তারিখে লেখা পত্রে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর তিনটি "পাগলামির" কথা বলেছিলেন। তাঁর তৃতীয় পাগলামি তিনি দেশকে মা বলে জানেন; এবং সে প্রসঙ্গে লিখেছিলেন "মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা হলে ছেলে কী করে ?" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দ্বিতীয় পাগলামি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, যে "তা হলে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের সংকল্প।" বিচারক বিচক্রফ্ট সাহেব তাঁর রায়ের গোড়াতে বলেছিলেন সরকার পক্ষের এবং আসামীর কৌন্সিলী উভয়েই এবিষয়ে একমত যে শ্রীঅরবিন্দ একজন অত্যন্ত ধার্মিক ও দেশভক্ত ব্যক্তি। নর্টন সাহেব এই চিঠিখানার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং বলেন যে শ্রীঅরবিন্দের গভীর ধর্মভাব ও দেশপ্রেমের ফলে তিনি একজন ঘোর সরকার-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছেন—নর্টন সাহেবের ভাষায় 'a fanatic and a bad bold man' হয়ে উঠেছেন, এবং স্বাধীনতালাভের জন্য যে তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন তা মায়ের রক্তপানে উদ্যত রাক্ষসের প্রতি ছেলের কর্তব্য কী, এ প্রশ্ন থেকেই স্পষ্ট অনুমান করা যায়। কৌন্সিলী দাশ মশাই বলেন নর্টন সাহেব গোড়াতেই ভুল করেছেন এবং ফৌজদারী মামলার মূলনীতিই লঙ্ঘন করেছেন। ফৌজদারী মামলার মূলনীতি এই যে যতক্ষণ আসামীর অপরাধ প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ ধরে নিতে হবে আসামী নির্দোষ; কিন্তু নর্টন সাহেব গোড়াতেই ধরে নিয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ দোষী ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত; তারপর তিনি তাঁর অনুমানের স্বপক্ষে প্রমাণের সন্ধান করেছেন। তাই তিনি

শ্রীঅরবিন্দের রাক্ষসের উপমাটার অপব্যাখ্যা করতে চান। বস্তুত ঐ উপমাটার সহজ অর্থ এই যে পরাধীনতা দুর্বহ; এবং শ্রীঅরবিন্দ উপমার দ্বারা শুধু তা-ই বলতে চেয়েছেন। দাশ মশাই বিচারককে অনুরোধ করেন তিনি যেন নর্টন সাহেবের মতন ভুল না করেন, এবং গোড়া থেকেই যেন ধরে না নেন যে শ্রীঅরবিন্দ দোষী। তিনি আশা করেন বিচারক চিঠিটার সহজ অর্থই গ্রহণ করবেন। বিচারক দাশ মশাইয়ের যুক্তির ন্যায্যতা স্বীকার করেছিলেন।

নর্টন সাহেব বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি রাজদ্রোহকর বলে প্রমাণ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, এবং প্রবন্ধগুলির জন্য শ্রীঅরবিন্দকেই দায়ী করেন। নর্টন সাহেবের বক্তব্য শ্রীঅরবিন্দ বে-আইনি কর্মপন্থার সমর্থক। দাশ মশাই দেখালেন শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর লেখায় বোমা বা ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও নাই। শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য স্বরাজ; এবং স্বরাজলাভের উপায় স্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি এবং তাঁর কর্মপন্থা Passive Resistance বা বা নিষ্ক্রিয় ও অহিংস প্রতিরোধ। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৭ সনের ৯ই এপ্রিল থেকে ২৩শে এপ্রিলের মধ্যে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় Passive Resistance সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেন দাশ মশাই জজ ও এসেসরদের তা প'ড়ে শোনান এবং দেখান শ্রীঅরবিন্দের লেখার মধ্যে অপরাধজনক কিছু নেই।

এখানে একটু অবান্তর হলেও প্রসঙ্গক্রমে এ কথাটা বলা দরকার যে কেউ কেউ এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত Passive Resistance বিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিপিনচন্দ্র পাল মশায়ের লেখা; এবং ঐ লেখাগুলির সাহায্যেই দাশ মশাই শ্রীঅরবিন্দকে নির্দোশ প্রমাণ করেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ On Himself and on the Mother পুস্তকের ৯৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "I was the writer of the series of articles on the "Passive Resistance" published in April 1907 to which reference has been made. Bipin Pal had nothing to do with it. He ceased his connection with the paper towards the end of 1906 and from that time onward was not writing any editorials or articles for it."

মিঠাইয়ের চিঠির কথা

আলিপুর বোমার মামলায় বারীন্দ্রকুমারের 'মিঠাইয়ের চিঠি' নামে পরিচিত ক্ষুদ্র চিঠিখানার ভূমিকা ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিখানা এই:

"প্রিয় দাদা, এখনই সময়। হঠাৎ প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য আমাদের ভারতের সর্বত্র মিঠাই প্রস্তুত রাখিতে হবে। আমাদের কনফারেন্সের জন্য ব্যবস্থা যাতে হয় তা দেখো। আমি এখানে তোমার পত্রের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

তোমার স্নেহের
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ"

উপরের চিঠিতে একটা কনফারেন্সের কথা আছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সুরাট কংগ্রেসের সময় বারীন্দ্রকুমার সুরাটে ভারতের কয়েকটি প্রদেশের বিপ্লবপন্থীদের এক গোপন সভায় আহ্বান করেন। তিলককেও সে সভায় উপস্থিত থাকতে বারীন্দ্রকুমার অনুরোধ করেন। তিলক সেই সভায় যোগ দিতে অসম্মত হয়ে বলেন তিনি তাঁর পথে দেশ-সেবা করবেন। বারীন্দ্রকুমারের পথ তাঁর পথ নয়। শ্রীঅরবিন্দও সেই কনফারেন্সে যোগ দেন নি।

উপরোক্ত 'মিঠাইয়ের চিঠি' প্রসঙ্গে নর্টন সাহেবের বক্তব্য 'মিঠাই' কথাটির দ্বারা এখানে স্পষ্টতই বোমা বোঝায়, এবং এ প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমার যে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন তাতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে শ্রীঅরবিন্দ বোমার দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দাশ মশাই আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে দেখালেন চিঠিখানা জাল; এবং শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে তা প্রমাণ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না। আমরা দেখবো বিচারকও চিঠিখানাকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ বলে গ্রহণ করলেন না। দাশ মশাইয়ের যুক্তি এই: প্রথমত দুই ভাই-ই তখন সুরাটে, তবে চিঠি লেখবার প্রয়োজন কোথায়? দ্বিতীয়ত বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দকে 'সেজদা' বলতেন; কিন্তু চিঠিতে "সেজদা" বলে সম্বোধন না করে 'প্রিয় দাদা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই চিঠিটা বারীন্দ্রকুমারের লেখা নয়, এ সন্দেহ স্বাভাবিক। তৃতীয়ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এই পুরা স্বাক্ষরও সন্দেহজনক। সরকার পক্ষের কথা শ্রীঅরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার ইঙ্গভাবাপন্ন। বিলাতে কিন্তু এক ভাই অপর ভাইকে চিঠি লিখতে বংশের নাম (Surname) বাদ দিয়ে থাকে। (বিচারক মন্তব্য করলেন তিনিও তাঁর ভাইকে চিঠি লিখতে বংশের নাম রেখেন না।) চতুর্থত এ অতি অবিশ্বাস্য কথা যে এরূপ একটা চিঠি শ্রীঅরবিন্দ সযত্নে কলকাতায় নিয়ে এলেন, চিঠিটা তাঁর Scott

Lane-এর বাসায় দুই মাসকাল রইলো, এবং পুলিশের সৌভাগ্যক্রমে ৪৮নং গ্রে ষ্ট্রীটের নতুন বাসা খানাতল্লাশের সময় তা পুলিশের হাতে পড়লো। খানাতল্লাশের সময়ই যে চিঠিখানা পাওয়া যায়, তাও নিঃসন্দেহ প্রমাণের অভাব। সমস্ত ব্যাপারটাই সন্দেহজনক; এবং দাশ মশাই তাঁর ভাষণে বললেন তিনি আশা করেন বিচারক চিঠিটাকে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ বলে গ্রহণ করবেন না।

তারপর দাশ মশাই বলেন যে সরকার পক্ষের কৌন্সিলীর মতে শ্রীঅরবিন্দ একজন উচ্চশিক্ষিত প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁর মতন একজন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ একটা ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া সম্ভব কিনা তা বিনা বিচারে গ্রহণ করা যায় না। দাশ মশাই বলেন বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় তাঁরা কী সামান্য পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। দুই চারিটি বোমা, রিভলভার ও রাইফেল নিয়ে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আশা বাতুলতা মাত্র; এবং শ্রীঅরবিন্দের মতন একজন প্রতিভাবান তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি এরূপ একটা ষড়যন্ত্রে যোগ দেবেন, এ অতি অবিশ্বাস্য কথা।

এইরূপে দাশ মশাই সরকার পক্ষের কৌন্সিলীর যুক্তি অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে খণ্ডন করেন। তারপর যে কথাগুলি বলে তিনি তাঁর ভাষণের উপসংহার করেন তা এদেশের ফৌজদারী মামলার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি এসেসরদ্বয় ও বিচারককে সম্বোধন করে বলেছিলেন: "আপনাদের নিকট আমার এই নিবেদন যে এই মামলা নিয়ে যে সব বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে লোকে একদিন তা ভুলে যাবে। অরবিন্দও একদিন ইহলোক ত্যাগ করবেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর বহু পরেও লোকে তাঁকে ভুলবে না। লোকে তাঁকে স্মরণ করবে দেশপ্রেমের কবি বলে; স্মরণ করবে তাঁকে জাতীয়তার ঋষি বলে; স্মরণ করবে তাঁকে বিশ্বপ্রেমিক বলে। তাঁর মৃত্যুর বহু পরেও শুধু ভারতে নয় দেশ-দেশান্তরেও তাঁর বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে। তাই আমি বলি আজ কেবল আপনাদের সম্মুখেই তাঁর বিচার হচ্ছে না; তাঁর বিচার হচ্ছে ইতিহাসের দরবারে।" দাশ মশাইয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। ভারত ও সর্ব জগৎ শ্রীঅরবিন্দের বিচার করেছে; আজ তিনি দেশ-ভক্ত জাতীয়তাবাদী ও বিশ্বপ্রেমিক বলে সর্বত্র পুজিত—কেবল ভারতে নয়, সর্বজগতে।

এসেসরদ্বয়ের অভিমত

সাক্ষ্য-প্রমাণাদি গ্রহণ ও ফরিয়াদী ও আসামী পক্ষের কৌন্সিলীর সওয়াল শেষ হলে এসেসরদ্বয় তাঁদের অভিমত জানালেন। তাঁদের অভিমত সংক্ষেপে দেওয়া গেল। প্রথম এসেসর গুরুদাস বসুর অভিমত :

অরবিন্দ ঘোষের বক্তৃতাগুলি নির্দোষ। তিনি তাঁর বক্তৃতায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথাই প্রধানত বলেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অপরাধ নয়।

যুগান্তর, সন্ধ্যা প্রভৃতি কাগজে সময় সময় রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ বের হতো। ঐ সব পত্রিকার সঙ্গে বন্দেমাতরমের যোগাযোগ প্রমাণিত হয় নাই। ঐ সব পত্রিকা ও বন্দেমাতরমের কর্মপন্থা ভিন্ন।

'মিঠাইয়ের চিঠি'-খানাকে নানা কারণেই প্রমাণ বলে গ্রহণ করা যায় না।

এইরূপ একটা ছেলেখেলার ষড়যন্ত্র যে সফল হতে পারে শ্রীঅরবিন্দের মতন একজন উচ্চশিক্ষিত লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা অসম্ভব; এবং এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রমাণ করার মতন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। আমি তাই অরবিন্দ ঘোষকে নিপরাধ মনে করি।

দ্বিতীয় এসেসর কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত :

অরবিন্দ ঘোষকে এই মামলায় ষড়যন্ত্রের প্রকৃত নেতা বলা হয়েছে; এবং সরকার পক্ষ থেকে তাঁর বিরুদ্ধে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। আমার অভিমত এই যে তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।

খানাতল্লাশের সময় প্রাপ্ত খাতার অপ্রকাশিত লেখার উপর নির্ভর করা যায় না। "মিঠাইয়ের চিঠি"-ও নির্ভরযোগ্য নয়। দুই ভাইই তখন সুরাটে ছিলেন। তবে একভাই অপর ভাইকে পত্র দিতে যাবেন কেন? আর চিঠিটা বারীন্দ্রকুমারের লেখা হলে "প্রিয় দাদা" সম্বোধন না থেকে "সেজদা" সম্বোধনই থাকবার কথা, আর "বারীন্দ্রকুমার ঘোষ" এই পুরা সাক্ষরও চিঠিতে থাকবার কথা নয়। চিঠিটা কখন পাওয়া গেল, কার কাছে ছিল সেই সব বিষয়ে সরকারী সাক্ষীরা পরস্পর-বিরোধী কথা বলেছে। আমার বিশ্বাস অরবিন্দ বাবুর মতন একজন উচ্চশিক্ষিত লোকের পক্ষে বোমা-রিভলভারের সাহায্যে ইংরেজ সাম্রাজ্য ধ্বংস করার চেষ্টা করা অসম্ভব।

জজ বিচক্রফটের রায় শ্রীঅরবিন্দের মুক্তি

উভয় এসেসরই ৩৬ জন আসামীর মধ্যে বারীন্দ্রকুমার প্রমুখ কয়েকজনকে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২২ ধারা অনুসারে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্রসংগ্রহের অপরাধে অপরাধী বলেন। জজ উনিশ জন আসামীকে বিভিন্ন শাস্তি দেন; সতের জন আসামী খালাস পান। মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন একজন। জজ তাঁর রায়ে শ্রীঅরবিন্দকে কেন খালাস দিতে বাধ্য হন তার একটু আলোচনা করেন।

জজ তাঁর রায়ে বলেন যে সরকার পক্ষের মতে অরবিন্দ ঘোষই এই মামলার প্রধান আসামী; এবং তার দণ্ডবিধানই হলো গভর্নমেন্টের প্রধান লক্ষ্য ও একান্ত কাম্য। তাকে অপরাধী প্রমাণ করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে এত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা হয় যে বিচার শেষ করতে ছয় মাস তিন সপ্তাহ সময় লাগে। অরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যে ষড়যন্ত্র করে অরবিন্দ তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই আগে বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির অপরাধের বিচার করার পর অরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদির বিচার করতে হয়। এই সাক্ষ্য প্রমাণগুলিকে যে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায় তা পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯০৫ সনের ৩০শে আগষ্ট তারিখের মৃণালিণী দেবীকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের পত্রে তাঁর তিনটি পাগলামির কথার উল্লেখ আছে। শ্রীঅরবিন্দের তৃতীয় পাগলামি—দেশ মা, এবং মায়ের বুকে ব'সে কোন রাক্ষস রক্তপান করতে উদ্যত হলে ছেলে কী করে—শ্রীঅরবিন্দের এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে জজ যা বলেন তা এই: সরকারী কৌন্সিলীর মতন যদি ধরে নেওয়া যায় যে পত্রলেখক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তবে ঐ চিঠিখানার মধ্যে স্থানে স্থানে এমন কথা পাওয়া যায় যা সন্দেহের উদ্রেক করে; কিন্তু যদি পূর্বাহ্ণে ঐরূপ ধারণা না নিয়ে চিঠিখানা পড়া যায় তবে তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায় না। জজের কথা "Viewing it in an unprejudiced way there is nothing in it that really calls for explanation. অর্থাৎ চিঠি সম্বন্ধে জজ পুরাপুরি দাশ মশাইয়ের যুক্তিই গ্রহণ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসাবে সুরাটের কংগ্রেসের পর কলকাতা ফেরবার পথে শ্রীঅরবিন্দ যে সব বক্তৃতা দেন সরকার পক্ষ তার রিপোর্ট আদালতে দাখিল করে। জজ ঐ বক্তৃতাগুলির মধ্যে দোষাবহ কিছু পেলেন

না। বক্তা যেখানেই যান সেখানে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়—এর বেশী কিছু রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায় না। জজের মতে প্রমাণ হিসাবে ঐ রিপোর্ট-গুলি দাখিল করা অনাবশ্যক ছিল।

শ্রীঅরবিন্দের গৃহে খানাতল্লাশের সময় দুটি অপ্রকাশিত হস্তলিখিত প্রবন্ধ প্রবন্ধ পাওয়া যায়। তার একটি প্রবন্ধ হলো The Morality of Boycott; দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হলো What is Extremism। প্রবন্ধ দুটি কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। The Morality of Boycott প্রবন্ধটি সম্বন্ধে জজ বলেন: "There are passages in it which taken by themselves certainly indicate support of the use of violent methods." দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে কীভাবে জাতি সংগঠন করতে হয় সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন। জজ তাঁর রায়ে উক্ত প্রবন্ধ থেকে শ্রীঅরবিন্দের এই অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন: "The object of the nationalist is to build up the nation. The nationalist has a deep respect for law, because without it the nation cannot attain proper development. But the law must be in accordance with the wish of the nation. If it is not, it is not moral; and if immoral, it should be broken. The notionalist is not afraid of anarchy and suffering." প্রবন্ধটি সম্বন্ধে জজ মন্তব্য করেন: "As an essay the article is a splendid piece of writing. The danger lies in the effect it might have on ill-balanced and impressionable minds. The fact that neither of these articles was published is again a point in Aurobindo's favour."

স্বাধীনতার কামনা এবং স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা দোষের নয়, একথা বিচারাসন থেকেই জজ স্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন কোন ইংরেজের নিকটই স্বাধীনতার কামনা কিংবা স্বাধীনতার বাণী প্রচার অপরাধ নয়। What is Extremism প্রবন্ধটির একস্থানে সন্ধ্যা, যুগান্তর আর বন্দেমাতরম্ পত্রিকার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন সন্ধ্যা ও যুগান্তরের স্বাধীনতার আদর্শকে অপরাধ বলা যায় না। সন্ধ্যা ও যুগান্তরের প্রদর্শিত কর্মপন্থা নিশ্চিত বে-আইনি ও রাজদ্রোহকর; তাই নর্টন সাহেব বলেন

শ্রীঅরবিন্দও বেআইনি ও রাজদ্রোহকর কর্মের সমর্থক। নর্টন সাহেবের এই অভিমতের সঙ্গে জজ একমত হতে পারলেন না; কারণ ঐ উক্তির পরেই শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "There is no harm in independence as an ideal; the offence lies in the method by which it is sought to be attained." জজ ঐ দুটি লেখাতে শ্রীঅরবিন্দকে দোষী সাব্যস্ত করার মতন কোন প্রমাণ পেলেন না।

খানাতল্লাশের সময় একটা খাতা পাওয়া যায়; তার মধ্যে কিছু হিজিবিজি লেখা ছিল। বিচারকের মতে লেখাগুলি নিঃসন্দেহে অপরাধজনক। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন খাতার হিজিবিজি লেখা তাঁর নয়; খানাতল্লাশের সময় খাতাতে ঐ সব লেখা ছিল না। অর্থাৎ পরে লেখাটা খাতায় স্থান পেয়েছিল। জজ এই লেখাটাকেও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন; কারণ একথাটা সুবিদিত যে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগে গুপ্তচরেরা অনেক সময় আসামীর অজ্ঞাতে এরূপ জাল করে থাকে।

'মিঠাইয়ের চিঠি"-টাকে জজও 'the most important exhibit' বলেন। নর্টন সাহেবের তো ঐ চিঠিখানার উপর খুবই ভরসা ছিল। কিন্তু দাশ মশাই যে চিঠিখানাকে জাল প্রমাণ করার জন্ম খুবই যুক্তি-পুর্ণ সওয়াল করেছিলেন, তা আমরা দেখেছি। চিঠি সম্বন্ধে জজের সিদ্ধান্ত এই: "If the letter is forged, it is a splendid specimen of the forger's art. But I hesitate to accept it."

তাই বিচারক শ্রীঅরবিন্দের অপরাধ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা এই: "Taking all the evidence together I am of opinion that it falls short of such proof as would justify me in finding him guilty of so serious a charge" অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে যে সাক্ষাৎ প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছিল তা থেকে তাঁকে আইনত দোষী প্রমাণিত করা যায় না। সন্দেহের অবকাশে জজ শ্রীঅরবিন্দকে খালাস দিলেন।

শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দেশের আনন্দ—দাশ মশাইয়ের অশেষ খ্যাতি

শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দেশের লোকের আনন্দের সীমা রইলো না। এমনকি বোমার মামলায় যাঁরা দণ্ডিত হন তাঁরাও শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে নিজেদের দণ্ডের কথা ভুলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়েন। শ্রীঅরবিন্দের মুক্তিতে দাস মশাইয়ের

জয়, আর নর্টন সাহেব ও সরকার পক্ষের পরাজয় ঘোষিত হয়। দাস মশাই যে অশেষ কীর্তি অর্জন করেন তা একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। বোমার মামলার রায় বের হবার পর দাশ মশাই দার্জিলিং-এ বেড়াতে যান। সেখানে পথে একদিন সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় দাশ মশাইকে দেখে সিস্টার নিবেদিতা এগিয়ে এসে আবেগভরে বলেন: I knew you are great, but I never knew you are so great.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলকাতায় শেষ দশ মাস

জেল থেকে বের হয়ে কী দেখলেন

এক বছব জেলে থাকার পর ১৯০৯ সনের ৬ই মে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি লাভ করেন, এবং ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে বাংলাব বাজনীতিব সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে তিনি চন্দননগরে যান। মধ্যবর্তী দশ মাস কাল কলকাতায় তাঁর জীবন ছিল কর্মব্যস্ত। ইতিমধ্যে দেশেব বাজনৈতিক অবস্থারও বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে, জেল থেকে বের হয়ে দেশে তিনি কী দেখলেন তা জানা যায় তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতা থেকে। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেন যে জেলে যাবার পুর্বে তিনি দেখেছিলেন দেশে তখন মহা উৎসাহ, দেশের লোক নতুন আশায়, নতুন উদ্যমে পুর্ণ। দেশের সর্বত্র লোকের কণ্ঠে তখন বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। জেল থেকে ফিরে এসে তিনি আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনি তেমন শুনতে পাচ্ছেন না। আর বাঙালী যেন আশা উদ্যম হারিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। দেশের কাজে যাঁরা তাঁর সহযোগী ছিলেন, তাঁদের অনেককে তিনি আর দেখতে পাচ্ছেন না। যিনি তাঁর একজন প্রধান সহযোগী ছিলেন সেই দেশমান্য নেতা তিলক তখন ব্রহ্মদেশে মান্দালয় জেলে সাড়ে ছয় বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন। জাতীয়তাবাদী অপর প্রধান নেতা বিপিনচন্দ্র পাল তখন স্বেচ্ছায় দেশ ছেড়ে বিলাতে প্রবাসী। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় বলেন তিনি তবু নিরাশ হন নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যাঁর ইচ্ছায় ইতিপুর্বে দেশ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সরব হয়েছিল, তাঁর ইচ্ছায়ই দেশ তখন নীরব। এই নীরবতা ও সাময়িক অবসাদের মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় দেখলেন।

জাতীয় আন্দোলনের পরিচালনা

বস্তুত কিছুকাল ধরে দেশের উপর ভীষণ নির্যাতন চল্‌ছিল। ১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে গভর্নমেণ্ট বিনা বিচারে বাংলার নেতৃস্থানীয় নয়জনকে বাংলার বাইরে নির্বাসিত করেন। এদিকে সন্ত্রাসবাদীরাও নিষ্ক্রিয় ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ জেলে থাকা কালে ১৯০৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আলিপুরের সরকারী উকিল, বোমার মামলার সরকারী কৌন্সিলী নর্টন সাহেবের সহকারী আশু বিশ্বাস মশাই কোর্টে নিহত হন। কারা-মুক্তির পর শ্রীঅরবিন্দ আবার জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। তিনিই তখন জেলের বাইরে বাংলার একমাত্র জাতীয়তাবাদী নেতা। যুবকদের নিয়ে তিনি আবার সভা-সমিতি স্বরু করলেন। প্রাকাশ্য সভায়ও কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। অবশ্য আগে সভায় সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হ্‌তো ; এখন সহস্রের স্থলে শত সংখ্যক লোক সভায় যোগ দিত। জেল থেকে বের হয়ে তিনি আর একটি কাজ করেন। তিনি যখন জেলে তখন বন্দেমাতরম পত্রিকা গভর্নমেণ্ট বন্ধ ক… দেয়। তার একটু ইতিহাস আছে। যতদিন শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ততদিন পত্রিকা বেশ চল্‌ছিল। তাঁর জেলে যাবার পর অর্থাভাবে পত্রিকা পরিচালনা অসম্ভব হয়ে ওঠে, এবং পত্রিকার কর্তৃপক্ষ স্থির করেন আপনা হতে অর্থাভাবে উঠে যাওয়া অপেক্ষা গভর্নমেণ্টের দ্বারা বন্ধ হওয়া পত্রিকার পক্ষে অধিকতর গৌরবজনক। তাই পত্রিকার অন্যতম লেখক B. C. Chatterjee মশাই বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় এমন একটি কড়া প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যে গভর্নমেণ্ট প্রবন্ধটিতে হত্যার প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে মনে করে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল কানাইলাল দত্ত কর্তৃক নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা। প্রবন্ধের মধ্যে এই মর্মে কথা ছিল : "কানাই নরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে। যে ঘৃণ্য ভারতীয় তাহার দেশের শত্রুর কর চুম্বন করে (অর্থাৎ তার আনুগত্য স্বীকার করে) সে আর আপনাকে প্রতিশোধের আঘাত হইতে নিরাপদ মনে করিতে পারিবে না।……যে মুহূর্তে কানাই সেই গুলী ছুড়িয়াছিল সেই মুহূর্ত হইতে তাহার দেশের বাতাসে ধ্বনিত—'সাবধান'। বিশ্বাস-ঘাতকের দণ্ড সম্বন্ধে সাবধান।" (গল্প ভারতী, পৌষ, ১৩৫৭ সন ৮৭০ পৃষ্ঠা)। ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাস থেকে ১৯০৮ সনের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বন্দেমাতরম্ পত্রিকা দেশে জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিল।

কর্ম্মযোগিন ও ধর্ম্ম

কেউ কেউ এই সময় বন্দেমাতরম্ পত্রিকা পুনঃ প্রকাশের জন্তে শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রস্তাব করেন। শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পুনঃ প্রকাশ না করে কর্ম্মযোগীন্ নামক একখানা ইংরেজী সাপ্তাহিক ও ধর্ম্ম নামক অপর একখানা বাংলা সাপ্তাহিক বের করেন। ১৯০৯ সনের ১৯শে জুন কর্মযোগিন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হয়; এবং ২৩শে জুন ধর্ম পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কর্মযোগিন্ প্রথম থেকেই প্রায় বন্দেমাতরম্ পত্রিকার মতনই দেশের লোকের নিকট সমাদর লাভ করেছিল। পত্রিকাটি অল্পকালই স্থায়ী হয়েছিল—শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা ত্যাগের অল্প পরেই কর্মযোগিন ও ধর্ম বন্ধ হয়ে যায়।

কারামুক্তির পর নতুন মানুষ শ্রীঅরবিন্দ

আলিপুর জেল থেকে শ্রীঅরবিন্দ এক নতুন মানুষ হয়ে বের হন। তাঁর "কারা কাহিনী"—পুস্তকের গোড়াতে তিনি লিখেছিলেন যে কারাবাসের পুর্বে তিনি জানতেন না যে "আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব তখন সেই পুরাতন অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন মানুষ নূতন চরিত্র লইয়া নূতন কর্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে।" শ্রীঅরবিন্দের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় কর্মযোগিন পত্রিকার প্রচ্ছদপটে। আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দ গীতার সাধনা গ্রহণ করেন এবং "বাসুদেব সর্বমিতি" এই প্রত্যক্ষ অনুভূতিলাভ করেন। কর্ম্মযোগিন পত্রিকার প্রচ্ছদপটে দেখা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রথারূঢ় কৃষ্ণার্জুনের মূর্তি—কৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ম্মযোগের উপদেশ দিচ্ছেন। কর্মযোগিনের Motto-ও গীতার নিষ্কাম ধর্মের আদর্শ "যোগঃ কর্মসু কৌশলম্", কর্মযোগিনে শ্রীঅরবিন্দ যে সব প্রবন্ধ লেখেন তাতেও তাঁর এই সময়কার বক্তৃতাতে জাতীয়তার কথা, ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য ও আদর্শের কথা, অবশ্য ছিল; কারণ তিনিই তখন বাংলার জাতীয় আন্দোলনের পরিচালক। কিন্তু তাঁর এই সময়কার লেখা ও বক্তৃতায় ঝোঁক পড়েছিল ধর্মের উপর, কর্মযোগের উপর। শ্রীঅরবিন্দের উত্তরপাড়ার বক্তৃতার উপসংহারেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। ঐ উপসংহারে তিনি বলেছিলেন যে পুর্বে তিনি বলতেন ভারতের জাতীয়তাই ধর্ম; এখন তিনি কথাটা একটু পরিবর্তন করে বলতে চান যে সনাতন ধর্ম, হিন্দু ধর্মই ভারতের জাতীয়তা—অর্থাৎ এখন আগে ধর্ম, পরে জাতীয়তা ও দেশের সেবা। কর্ম্মযোগিনের প্রথম সংখ্যা আরম্ভ হয় রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের ধর্মের আলোচনা নিয়ে। অল্প

কিছুকাল পরে দেশ-সেবা ও জাতীয় আন্দোলন থেকে অবসর নিয়ে তিনি পণ্ডিচেরীতে যাবেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগদান ও পণ্ডিচেরীতে যোগ সাধনায় আত্ম-সমর্পণ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী ঘটনা হলো শ্রীঅরবিন্দের জেলের অনুভূতি। এই অনুভূতির ফলে শ্রীঅরবিন্দের কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয় না, তাঁর দৃষ্টির প্রসারও হতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতার অপেক্ষাও সর্ব মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতিই অধিকতর কাম্য, এ ধারণা তাঁর মনে ক্রমশ জন্মাতে থাকে।

কর্মযোগিন ও ধর্মপত্রিকার আলোচ্য বিষয় সমূহ

কিন্তু দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন থেকে সদ্য সদ্য বিচ্ছিন্ন হওয়া তো শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই জাতীয়তাবাদীর লক্ষ্য কী হওয়া উচিত এবং তার কর্মপন্থাও কী হবে সেই সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিন ও ধর্ম পত্রিকাদ্বয়ের সাহায্যে দেশের সম্মুখে তাঁর সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন। তাঁর এই সময়কার বক্তৃতাগুলিতেও আমরা তা-ই দেখি। তবে কেবল জাতীয়তাবাদের আলোচনায় তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন না; ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধেও তিনি কর্মযোগিনে ও ধর্মে মূল্যবান প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ কী ছিল; কেন ভারতের সভ্যতা এতদিন ধরে বিদ্যমান আছে—এইসব প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেন এবং তার উত্তরও দেন। তিনি বলেন প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ ব্রহ্মচর্য ও ধর্ম-সাধনাই ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘকালব্যাপী অস্তিত্বের কারণ। তাঁর মত বর্তমান ভারতেও আমাদিগকে প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী পরিবর্তনসহ প্রাচীন আদর্শেরই পুনঃ প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ চিরদিন ভারতীয় চিত্রকলার একজন সমজদার ছিলেন। চন্দননগর গমনের অল্প আগে তিনি ভারতের নতুন চিত্রকলা পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সুন্দর একটি প্রবন্ধ ধর্ম পত্রিকায় লেখেন তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন: "শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভায় অনুপ্রাণিত কয়েকজন যুবক ভারতীয় চিত্র বিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতিভার গুণে বঙ্গদেশে নূতন যুগের সূচনা হইতেছে। ইহার পর আশা করা যায় যে ভারত ইংরেজের চোখে না দেখিয়া নিজ চোখে দেখিবে; পাশ্চাত্যের অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া আবার চিত্রিত রূপ ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত করিবে।"

ভারতের শিল্পের বৈশিষ্ট্যও তিনি ঐ প্রবন্ধে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন: "ভারতীয় চিত্রকর ও অন্যান্য শিল্পীরা যে ঠিক বাহ্য জগতের অনুকরণ করেন না ইহা সত্য, কিন্তু সামর্থ্যের অভাবে নয়। তাহাদের উদ্দেশ্য বাহ্য দৃশ্য ও আকৃতি অতিক্রম করিয়া অন্তরস্থ ভাব ও সত্য প্রকাশ করা।......পাশ্চাত্য বাহিরের নামরূপে অনুরক্ত, আমরা নিত্য বস্তু না পাইয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। এই প্রভেদ যেমন ধর্মে, দর্শনে ও সাহিত্যে তেমনি চিত্রবিদ্যায় ও স্থাপত্য-বিদ্যায় সর্বত্র প্রকাশ পায়।" (ধর্ম ও জাতীয়তা পৃষ্ঠা ১১২ দ্রষ্টব্য)

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শেষ দশ মাসের কাজ

এই শেষ দশ মাস কালের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের তিনটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ২৩শে জুন তারিখে বরিশালের ঝালকাঠি শহরে অনুষ্ঠিত বরিশাল সম্মিলনীতে যোগদান। সেখানে শ্রীঅরবিন্দ যে হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতা দেন তার একটু আলোচনা আমাদের করতে হবে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৯০৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে হুগলী জেলার চুঁচড়া শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের যে সভা আহূত হয় তাতে জাতীয়তাবাদী দলের পরিচালনা। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশিত দেশবাসীর প্রতি শ্রীঅরবিন্দের এক খোলা চিঠি। এই চিঠিখানাকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "শেষ উইল" বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই খোলা চিঠিখানা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলিল। কী অবস্থায়, কেন শ্রীঅরবিন্দ এই খোলা চিঠিখানা লিখেছিলেন এবং তার ফল কী হয়েছিল সেই সব কথা আমাদের আলোচনা করতে হবে। আর এই দশ মাস কালের মধ্যে জুন, জুলাই ও আগষ্ট মাসে তিনি কলকাতায় কতকগুলি বক্তৃতা দেন; এবং বক্তৃতাগুলি কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সর্বদেশে প্রচারিত হয়। এই বক্তৃতাগুলিতে শ্রীঅরবিন্দ তখনকার দেশের সমস্যা সমূহের আলোচনা, এবং প্রসঙ্গক্রমে গভর্নমেন্টের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের সমালোচনা করেন। তাই একদিকে যেমন ঐ বক্তৃতাগুলি থেকে আমরা তখনকার দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা জানতে পারি তেমনই শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক আদর্শও কর্মপন্থার দার্শনিক ব্যাখ্যাও জানতে পারি। তাই এই বক্তৃতাগুলি থেকে দুচারটি সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। প্রথমে এই বক্তৃতাগুলির কথাই আলোচনা করা যাক্। তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়ার বক্তৃতাই জেল থেকে

বের হবার পর প্রথম বক্তৃতা ; ইতিপূর্বে নানা প্রসঙ্গে সেই বক্তৃতার অনেক কিছু উল্লেখ করা হয়েছে।

বিডন স্কোয়ারের বক্তৃতা

এই বক্তৃতা দেওয়া হয় ১৯০৯ সনের ১৬ই জুন। বক্তৃতার পটভূমিকা এই—ইতিপূর্বে ১৯০৮ সনের ১২ই ডিসেম্বর বাংলার ৯ জন প্রধান ব্যক্তি বিনা বিচারে নির্বাসিত হন। বরিশালের সর্বজনমান্য নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত ও তাঁর সহযোগী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সুলেখক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পূর্ব-বঙ্গের অনুশীলন সমিতির কৃতী নেতা পুলিনচন্দ্র দাস প্রমুখ নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলার বাইরে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ হন। আর কলকাতায় তখন গভর্নমেণ্টের হুকুমে সন্ধ্যার আধ ঘণ্টা পূর্বে সভাসমিতি বন্ধ রাখতে হয়। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধ করাও গভর্নমেণ্টের সুনির্দিষ্ট নীতি।—রাজদ্রোহকর প্রবন্ধ প্রকাশের অজুহাতে পত্রিকার প্রেস বাজেয়াপ্ত করা, কিংবা পত্রিকার কাছে বহু টাকার জামিন দাবী করা তখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এক-দিকে এই নির্যাতন অপরদিকে ভুয়ো শাসন-সংস্কার দিয়ে দেশের একদল লোকের তোষণ ; এবং গভর্নমেণ্টের দলে তাদের আকৃষ্ট করে দেশের ঐক্যনাশ করা ছিল গভর্নমেণ্টের সুচিন্তিত নীতি। তাই প্রবল ঢক্কানিনাদের সঙ্গে গভর্নমেণ্ট ১৯০৮ সনের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার নামে পরিচিত প্রস্তাব প্রকাশিত করে।

তাঁর বিডন স্কোয়ারের বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে বলেন যে দেশে যখনই স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন একটু স্তিমিত হয় তখন সরকারের দিক থেকে নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি হলেই আন্দোলন আবার শক্তিশালী হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবে না। বিনা বিচারে নির্বাসনাদি নির্যাতন-ব্যবস্থার ফলে স্বদেশী আন্দোলন বল সংগ্রহ করবে। তিনি বলেন সব দেশের লোককেই স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য মূল্য দিতে হয়, নির্যাতন ভোগ করতে হয় ; ভারতবাসীকেও সেই মূল্য দিতে হবে। ভারতবাসী এ পর্যন্ত অনেক নির্যাতন ভোগ করেছে ; কিন্তু ভগবান পরাধীনতা-অপরাধের জন্য তাদের কাছে আরো অধিক মূল্য দাবী করবেন। তারপর তিনি প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন জেলে থাকা কালেই তিনি প্রস্তাবিত মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের কথা কিছু কিছু শুনেছেন। ঐ শাসন-সংস্কার

প্রস্তাব নিয়ে উল্লসিত হবার তিনি কোন কারণ দেখেছেন না। তিনি চোদ্দ বছর বিলাতে ছিলেন, এবং ইংরেজ জাতির রীতি-নীতি তিনি ভাল করেই জানেন। এদেশে যেটুকু আন্দোলন হয়েছে তার জন্যই ইংরেজ সত্যিকারের অধিকার ভারতবাসীকে কিছু দিবে, একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। যতটুকু না দিলে নয় তার বেশী ইংরেজ কখনও দেয় না। এই তথাকথিত সংস্কারের ফলে দেশের উন্নতি হবে না, অবনতিই হবে। ইংরেজ অতি কৌশলে এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাব রচনা করেছে। আইন-সভার হিন্দু সভ্যগণ হিন্দুদের দ্বারা এবং মুসলমান সভ্যগণ মুসলমানদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এই ব্যবস্থা করে ইংরেজ এদেশের হিন্দু মুসলমানের বিরোধ পাকা করতে চায়; অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের একযোগে কাজ করা শক্ত হবে।

কুমারটুলির বক্তৃতা

পরে আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে তিনি কলকাতায় কুমারটুলিতে এক সভায় মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে যা বলেন এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। কুমারটুলির সভায় তিনি বলেন যে দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের একটা মূল নীতি তিনি লক্ষ্য করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে কোন খেলো ও বাজে জিনিস বাজারে চালাতে হলে ইংরেজ ব্যবসায়ী খেলো জিনিসটির বহিরাবরণ-খুব মনোহর করে তৈরী করে। এইরূপ খেলো জিনিসের নাম Brummagem। শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ চরিত্র ভাল করে জানেন বলে ইংরেজের দেওয়া কোন শাসন-সস্কার প্রস্তাবকে তিনি একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন মনে করেন। তাঁর মতে এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাব আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ হবে কী না তা দেখা দরকার। তাঁর বিশ্বাস এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাব একটা Brummagem-এর ন্যায় বাজে জিনিস। তার বহিরাবরণ মনোহর। ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচন, বেসরকারী নির্বাচিত সভ্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং জন-স্বার্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করবার বেসরকারীর সভ্যদের অধিকার প্রভৃতি বস্তুত খেলো জিনিসের বাইরের মনোহর আবরণ মাত্র। কারণ—এ প্রস্তাবে বেসরকারী সভ্যদের উত্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণ করা বা না-করা সম্পূর্ণরূপে সরকারের ইচ্ছাধীন। সত্যিকার অধিকার বলতে কিছুই এই প্রস্তাবে ভারতবাসীকে দেওয়া হয় নি। বরং ইংরেজ কৌশলে তার নিজের শক্তি বৃদ্ধিরই ব্যবস্থা করেছে; কারণ আসলে এই প্রস্তাব অনুসারে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ

দেখা দেবে এবং ইংরেজই দুদলের মধ্যে মধ্যস্থ হয়ে কর্তৃত্ব করবে। তারপরে তিনি এই বলে বক্তৃতার উপসংহার করেন যে ভারতবাসীকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে ভারতের অগ্রগতির পথে কোন কিছুই বাধা হতে পারবে না। ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য একদিন উদিত হবেই ; এবং সর্বভারতে, কেবল সর্বভারতে নয় এশিয়ার সর্বত্র এবং পৃথিবীর সর্বত্র সেই সূর্যের আলো একদিন ছড়িয়ে পড়বে।

কলেজ স্কোয়ার বক্তৃতা

১৯০৯ সনের ১লা জুলাই মদনলাল ধিঙ্গড়া নামক এক পাঞ্জাবী যুবক লণ্ডনে ভারতসচিবের সেক্রেটারী কার্জন উইলি সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে ; এবং কার্জন উইলি সাহেবকে রক্ষা করতে গিয়ে একজন ভারতীয় ভদ্রলোকও আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারান। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এই খুনের নিন্দা করা হয়। কয়েকদিন পরে বাংলার ছোটলাট বেকার সাহেব ব্যবস্থাপক সভায় এই খুনের উল্লেখ করে যা বলেন, তা বিস্ময়জনক। তিনি সকল ভারতবাসীকে এই খুনের জন্য দায়ী করে বলেন খুনের শুধু নিন্দা করাই যথেষ্ট নয় ; ভারতবাসীকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে ; নইলে গভর্নমেণ্ট এই জাতীয় অনাচার দমনের জন্য এমন উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হবে যাতে দোষী-নির্দোষের সূক্ষ্ম বিচার করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ ছোটলাট এই ভয় দেখিয়েছিলেন যে দোষী-নির্দোষী নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে নির্যাতন ভোগ করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ১৮ই জুলাই তারিখের কলেজ স্কোয়ার বক্তৃতায় বেকার সাহেবের এই অনুচিত মন্তব্যের সমুচিত উত্তর দেন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এই বক্তৃতায় প্রথমে বলেন ছোটলাট বেকার সাহেব যে সকল ভারতবাসীকে এই খুনের জন্য দায়ী করেছেন তা অন্যায়। এই খুনের সঙ্গে সমগ্র দেশের সম্পর্ক কোথায়? লণ্ডন পুলিশের মতে ধিঙ্গড়ার সঙ্গে অপর লোকের যোগ-সাজসের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি ; তাদের মতে কাজটা ধিঙ্গড়ারই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তারপর গভর্নমেণ্ট যে দেশের লোকের সহযোগিতা দাবী করে সে প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ জিজ্ঞাসা করেন লাটসাহেব বুঝিয়ে বলবেন কী দেশে শান্তি রক্ষার জন্য সরকারের সঙ্গে ভারতবাসী কী ভাবে সহযোগিতা করবে? এদেশের শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর কোন হাত নেই। ভারতবাসীর মৌলিক অধিকার বলেও কিছু নাই। দেশের আইন প্রণয়নে ভারতবাসীর মত গ্রহণ করা হয় না ; গভর্নমেণ্ট যে আইন করতে ইচ্ছা করে

সেই আইনই পাশ হয়ে থাকে। গভর্নমেণ্ট যে ট্যাক্স আদায় করে তা কী ভাবে ব্যয় করা হবে তা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেশবাসীর নেই। এমতাবস্থায় গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতায় অর্থ কী গভর্নমেণ্ট যা বলে বা যা করে তাতে শুধু সায় দেওয়া মাত্র নয়? প্রজাদের কী করণীয় থাকতে পারে? সরকারী কর্মচারীদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে মেনে নেওয়া, তাঁদের স্বেচ্ছামতন দেশ-শাসন করবার ঈশ্বর-দত্ত অধিকার স্বীকার করা ছাড়া ভারতবাসী আর কী করতে পারে? কিন্তু কোন সুসভ্য জাতিই তার রাজনৈতিক আদর্শ বলে এ ব্যবস্থা স্বীকার করতে পারে না। বস্তুত আজ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভারতের প্রজাদের সম্পর্ক অস্বাভাবিক এবং আধুনিক যুগের রাষ্ট্রিক আদর্শের রাজা-প্রজার সম্পর্কের আদর্শের বিরোধী। সরকার যদি এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে এদেশের প্রজাদের তাদের মৌলিক অধিকার দেয় তবে এদেশে শান্তিশৃঙ্খলা ভঙ্গ হবার কোন কারণ ঘটবে না। দেশবাসীর পক্ষে সরকারের সঙ্গে প্রকৃতি সহযোগিতা করা তখন সম্ভব হবে।

বিলাতে কার্জন উইলি সাহেবের হত্যা প্রসঙ্গ ভারতে বিশিষ্ট মডারেট নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে মশাই পুণাতে ৮ই জুলাই যে বক্তৃতা দেন বেকার সাহেব তাঁর ভাষণে সেই বক্তৃতার প্রশংসা করেন। গোখলে তাঁর পুণা-বক্তৃতায় বলেছিলেন যে ভারতের বর্তমান অবস্থায় স্বরাজের বা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিছক পাগলামি; এবং যারা শান্তিপুর্ণ উপায়ে স্বাধীনতালাভের কথা বলে তারা মিথ্যাবাদী—ভীরুতাবশত তারা তাদের মনের কথা গোপন করে থাকে। গোখলের মতে এই সব লোক দেশের প্রকৃত উন্নতির অন্তরায়; এবং গভর্নমেণ্ট যদি তাদের সম্বন্ধে কঠোর নির্যাতন-নীতি অবলম্বন করে তবে গভর্নমেণ্টকে দোষ দেয়া যায় না। গোখলের দেশপ্রেম এবং দেশের জন্যে তাঁর ত্যাগ স্বীকার শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করতেন, কিন্তু তিনি গোখলের পুণা-বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা না করে পারলেন না। বস্তুত শ্রীঅরবিন্দ গোখলের মডারেট-পন্থী রাজনীতি বরদাস্ত করতে পারতেন না। স্মরণীয় যে রাজনীতিতে গোখলের গুরু ছিলেন ঝানু মডারেট ফিরোজশা মেহতা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কলেজ স্কোয়ারের বক্তৃতায় ও কুমারটুলির বক্তৃতায় গোখলের পুণা-বক্তৃতার যে সমালোচনা করেন তা সুযুক্তিপুর্ণ। তিনি বলেন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যে দোষের নয় কিংবা দণ্ডনীয় নয়, আলিপুর বোমার মামলায় বিচারকও তা স্বীকার করেছিলেন। এমন কি ভারতের কোন কোন ইংরেজ পত্রিকার ইংরেজ

সম্পাদকও মন্তব্য করেছিলেন যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার জন্য গভর্নমেণ্টের তরফে নির্যাতন সমর্থন যোগ্য নয়। ১৭ই জুলাই তারিখে কর্ম্মযোগিন পত্রিকায় গোখলের পুণা-বক্তৃতার সমালোচনা করে "Exit Vibhishan" এই নামে শ্রীঅরবিন্দ যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ অবান্তর হবে না। শ্রীঅরবিন্দ যে শ্লেষাত্মক রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন ঐ প্রবন্ধটি তার প্রমাণ। ঐ প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: He (Gokhale) publishes himself now as the righteous Vibhishan who with the Sugrivas, Angads and Hanumans of Madras and Allahabad has gone to join the Avatar of Radical Absolutism in the India office and ourselves as the Rakhasas to be destroyed by this Holy Alliance. মর্মার্থ: গোখলে হলেন ন্যায়-পরায়ণ বিভীষণ; মাদ্রাজ ও এলাহাবাদর ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকেরা হলেন সুগ্রীব, অঙ্গদ আর হনুমান; ভারত সচিব লর্ড মর্লি (যিনি বিলাতের রাজনীতিতে চরম সংস্কারপন্থী কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক) হলেন রামের অবতার। ধর্মপরায়ণ বিভীষণ রামের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন; এবং রাম, বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান মিলেছেন জাতীয়তাবাদী রাক্ষসদের নিধনের জন্যে।

ঝালকাঠি বক্তৃতা

১৯০৮ সনের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে, আলিপুর বোমার মামলা চলার কালে, গভর্নমেণ্ট বিনা বিচারে বাংলার যে ৯ জন নেতাকে নির্বাসিত করে বাংলার বাইরে বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ রাখেন তাঁদের মধ্যে তিন জনই ছিলেন বরিশালের লোক। এই তিনজন হলেন বরিশালের সর্বজনমান্য নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত মশাই, তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশাই আর বাংলার অপর বিখ্যাত সাংবাদিক ও জননেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মশাই। ইতিপূর্বেই বরিশালের লোকদের অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল; পুলিশের রেগুলেশন লাঠির আঘাত; তাদের মাথায় পড়েছিল। স্বদেশী ও বয়কট অন্য জেলার অপেক্ষা বরিশালে অধিক মাত্রায় সফল হওয়ার অপরাধে ঝালকাঠির বাসিন্দাদের উপর পিউনিটিভ ট্যাক্সও বসানো হয়েছিল; তবু বরিশালের লোকেরা যে ভয় পায় নি তার প্রমাণ ১৯০৯ সনের জুন মাসের ঝালকাঠির কনফারেন্স। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে বরিশালে

শ্রীঅরবিন্দ স্বদেশী ও বয়কট সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন ইহা পুলিশের মনঃপুত ছিল না। পুলিশ ঝালকাঠি বাসীদের জানিয়েছিল শ্রীঅরবিন্দ-কে ঝালকাঠিতে আমন্ত্রণ করা হলে কনফারেন্সই বন্ধ করা হবে। কিন্তু ঝালকাঠির লোকেরা ভয় পেলেন না। তাঁরা বলেন কনফারেন্স যদি কর্তৃপক্ষ বন্ধ করেন তো করুন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, সে আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হবে না।

বক্তৃতা দিতে উঠে শ্রীঅরবিন্দ বলেন চার বছর আগে তিনি বরিশালে প্রথম এসেছিলেন; চার বছর পর আজ তিনি আবার বরিশালে এসেছেন। তাঁর মনে হয় তিনি যেন এক তীর্থস্থানে এসেছেন; কারণ অশ্বিনী দত্ত মশায়ের হাতে-গড়া বরিশাল সত্যিই স্বদেশীর পীঠস্থান। তারপর তিনি যে শূন্য চেয়ারে অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের ফটো রাখা হয়েছিল তার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করেন কী অপরাধে অশ্বিনী দত্ত মশাই, কৃষ্ণকুমার মিত্র মশাইয়ের মতন পবিত্র চরিত্রের লোক নির্বাসিত হয়েছেন? কেউ তাঁদের এমন একটি কাজেরও উল্লেখ করতে পারবে না যা প্রশংসার যোগ্য নয় কিংবা গর্বের বিষয় বলে গণ্য হবার মতন নয়। তারপর শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে আইন অনুসারে তাঁদের ধরা হয়েছে তাতে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনার দরকার হয় নাই, আদালতে বিচারেরও প্রয়োজন হয় নাই। বিলাতের পার্লামেণ্টের সভ্যদেরও কেউ কেউ বলেছিলেন সে আইন শত বছরের পুরানো এমন এক আইন, যা বর্তমান কালের উপযোগী নয় এবং বর্তমানে ঐ আইনের প্রয়োগও সঙ্গত নয়। ভারত-সচিব সেই আইন সমর্থন করেন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ঐ আইনকে "বে-আইনি আইন" (Lawless law) এই আখ্যা দেন।

তারপর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শ্রোতাদের বলেন যে গভর্নমেণ্টের শক্তির ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় প্রজাদের উপর নির্যাতনে; আর ভারতবাসীর শক্তির পরিচয় হবে অম্লান মুখে সেই নির্যাতন সহনে। তিনি বলেন নির্যাতন উৎপীড়ন হলো যেন ভগবানের "হাতুড়ির আঘাত।" কামার যেমন হাতুড়ির দ্বারা পিটিয়ে পিটিয়ে লোহাকে মজবুত করে তোলে, ঈশ্বরও তেমনি তাদের উপর নির্যাতনের হাতুড়ি প্রয়োগ করে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করছেন। তিনি তাঁর শ্রোতাদের স্মরণ রাখতে বলেন যে ভারতবাসী এক সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধীকারী; আজিকার ভারতবাসীদের পূর্বপুরুষগণকে কত তপস্যা করতে হয়েছিল। ভারতবাসী সেইসব মায়ের সন্তান যাঁরা হাসি মুখে স্বামীর চিতায়

আরোহণ করতেন। আজ তাদের নেতৃগণ নির্বাসিত; কিন্তু তা বলে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই। তিনি বলেন এই নির্বাসিত নেতারা মহান ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের সফলতার জন্য তাঁরাও একান্ত অপরিহার্য নন। একদিন মৃত্যু এসে তাঁদের পৃথিবী থেকে অপসারিত করবে; কিন্তু আন্দোলন তখনও চলবে। বস্তুত ভারতের এই জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃত নেতা হলেন ভগবান স্বয়ং; এবং আন্দোলনের পিছনে রয়েছে ঈশ্বরের সুস্পষ্ট অভিপ্রায়। (এই কথাটা শ্রীঅরবিন্দ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, এবং তাঁর নানা বক্তৃতায় কথাটা উল্লেখ করেছেন।)

তারপর তিনি বলেন সরকারের নির্যাতন-নীতি ব্যর্থ হতে বাধ্য। নির্যাতনের দ্বারা দেশ শাসন করা যায় না। যে বাণিজ্য-রক্ষার জন্য ইংরেজ এত ব্যাকুল নির্যাতনের ফলে সেই বাণিজ্যেও অচল অবস্থা দেখা দেবে। দেশে শান্তি না থাকলে কে বাণিজ্যে টাকা খাটাবে? কেউ কেউ বলেন নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতির উপায় হলো নির্যাতন-নীতির সম্মুখে নতিস্বীকার, নির্যাতন এড়িয়ে চলা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মত তা নয়। তিনি বলেন সাহসের সঙ্গে সরকারের নির্যাতন-নীতির সম্মুখীন হওয়াই দেশবাসীর প্রকৃষ্ট পন্থা। সভার দিনের আবহাওয়ার দরুণ তাঁর কবি মনে একটি উপমার উদয় হয়; এবং সেই উপমা দিয়েই তিনি তাঁর বক্তৃতার উপসংহার করেন। সভার আগের দিন প্রবল ঝড়ে সভা-মণ্ডপের ছাদ উড়ে যায়; কিন্তু সভারম্ভের পুর্বে বহু আয়াসে ছাদ মেরামত করা হয়। সভার অধিবেশন চলার কালে আবার প্রবলতর ঝড় আসে। স্বেচ্ছাসেবকগণ গায়ের জোরে সভামণ্ডপের ছাদ ধরে রাখে; ঝড়ে ছাদ উড়িয়ে নিতে পারলো না। তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে শ্রীঅরবিন্দ বলেন তিনি ঝড়ের মধ্যে যেন ঝড়ের দেবতার রুদ্ররূপ দেখতে পেলেন। তিনি বলেন আজ দেশে এক সুন্দর মাতৃমন্দির রচিত হচ্ছে; কোন ঝড়-ঝাপটা, বাধা বিপত্তিতেই ঐ মন্দির নির্মাণ অসম্পূর্ণ রাখলে চলবে না। সেদিনের সভায় যেমন স্বেচ্ছাসেবকেরা সমবেত চেষ্টায় সভামণ্ডপের ছাদ তুলে রেখেছে তেমনি দেশ সেবকদের মাতৃ-মন্দিরের উপর ছাদ তুলে রাখতে হবে, অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হবে।

হাওড়ার বক্তৃতা

ঝালকাঠি থেকে ফেরার কয়েকদিন পরে Howrah People's Association-এর বার্ষিক সভায় শ্রীঅরবিন্দ এক তথ্যবহুল বক্তৃতা দেন। কয়েকমাস

আগে গভর্নমেণ্ট এক নতুন আইন পাশ করে—Criminal Law Amendment Act of 1908—বাংলা দেশের সমিতিগুলিকে বেআইনি ঘোষণা করে। এইরূপে অনুশীলন সমিতি, বরিশালের স্বদেশবান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংয়ের সুহৃদ সমিতি প্রভৃতি সমিতিগুলি বন্ধ হয়ে যায়—প্রকাশ্যে আর সমিতিগুলির পক্ষে কাজ করা সম্ভব রইলো না। হাওড়ার এই বক্তৃতা তারই উত্তর। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সকল স্বাধীন জাতির তিনটি বিশেষ অধিকারের উল্লেখ করেন। এই অধিকার তিনটি হলো স্বমত প্রচারের অবাধ অধিকার; সভাসমিতিতে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার অধিকার; এবং সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার অধিকার। তারপর অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লব থেকে যে তিনটি কথাকে সমগ্র মানবজাতি তার আদর্শ ও লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে সেই তিনটি কথার—Liberty, Equality, Fraternity তিনি ব্যাখ্যা করেন। সংঘবদ্ধ হওয়াই হলো মানবের উন্নতির মূল। আমাদের দেশেও জীবন সংঘবদ্ধ ছিল; আমাদের আগেকার পল্লীজীবন, আমাদের যৌথ পরিবার প্রথা, এমন কী সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের জাতিভেদ প্রথা আগে আমাদের সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু বিদেশী ইউরোপীয় শাসনে এদেশের সংঘবদ্ধ জীবন ধ্বংস হয়। উনিশ শতকের ভারত তার সংঘবদ্ধ জীবন হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। বিশ শতকের প্রথমে আবার কী ভাবে এবং কোন্ কোন্ আদর্শের প্রেরণায় এদেশে সংঘবদ্ধ জীবন নতুন করে গড়ে উঠেছিল, শ্রীঅরবিন্দ তার বর্ণনা করেন। এবং ইংরেজের নতুন আইনে সমিতিগুলি বেআইনি ঘোষিত হলেও, আইন ভঙ্গ না করে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে কী ভাবে সকলে মিলে কাজ করা সম্ভব হবে, শ্রীঅরবিন্দ তার বর্ণনা করে বক্তৃতার উপসংহার করেন। আমরা নিম্নে শ্রীঅরবিন্দের বক্তৃতার কিছু কিছু অংশের আলোচনা করবো।

স্বাধীন জাতির অধিকার-ত্রয়

সকল স্বাধীন জাতিই স্বমত প্রচারের অধিকারকে যে মূল্যবান মনে করে তার কারণ মত বা মনোভাবই একদিন কাজে রূপ ধারণ করে; এবং যা থাকে একদিন শুধু মত বা ভাবরূপে, তা-ই একদিন বাস্তবে পরিণত হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ একথাটাই তাঁর "ধর্ম ও জাতীয়তা" পুস্তকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন: "বাহিরের অবস্থা অন্তরের ভাবে প্রতিষ্ঠিত।" (পৃষ্ঠা—১০৭) শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভারতীয় দর্শনের কথা এই যে প্রথমে ঈশ্বরের মনে সৃষ্টির

ভাবনা বা কল্পনা আসে ; এবং সেই ভাব বা কল্পনাই পরে জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। মত প্রচার হয় সংবাদপত্রের সাহায্যে ; তাই মত প্রচারের স্বাধীনতার অর্থ হলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বা সরকারের তরফে সংবাদ-পত্রের প্রকাশের উপর অযথা বাধা-নিষেধ প্রয়োগের অভাব। প্রকাশ্যে সভা-সমিতিতে আলোচনা করবার অধিকার না থাকলে একজনের মত বহুজনের মত হয়ে উঠতে পারে না। আর সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকলেই কেবল যা থাকে প্রথমে হয়তো ব্যক্তিবিশেষের মত বা আদর্শ মাত্র তা-ই হয়ে ওঠে একদিন সর্বলোকের করণীয় কর্মের লক্ষ্য ; এবং এই ভাবেই জাতির উন্নতি সম্ভব হয়ে থাকে।

ফরাসী বিপ্লবের বাণী—স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব

আধুনিক সভ্যতার যে তিনটি চরম আদর্শ (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় the triple gospel,) ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় প্রচারিত হয় সেই আদর্শ তিনটিকে বাংলায় স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বলা হয়। শ্রীঅরবিন্দ মৈত্রী কথাটির পরিবর্তে ভ্রাতৃত্ব কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। আমাদের ধর্মেও বলা হয়েছে মুক্তি বা মোক্ষই মানবজীবনের লক্ষ্য ; এবং মুক্তি বলতে বোঝায় সকল বন্ধন থেকে, সকল অধীনতা থেকে মুক্তি অর্থাৎ স্বাধীনতা। তবে ভারত খুঁজেছে অন্তরের স্বাধীনতা, আর ইউরোপ লাভ করেছে বাইরের, অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা। বর্তমান ভারত ইউরোপের কাছে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করেছে ; ইউরোপকেও ভারতের কাছে শিখতে হবে অন্তরের স্বাধীনতালাভের পথ। দ্বিতীয় আদর্শ সাম্য এখনও মানুষ পূর্ণমাত্রায় লাভ করে নি। সাম্য স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ; সাম্যের অবর্তমানে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন ইউরোপ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সাম্যলাভ করেছে ; সেখানে আইনের চক্ষে সকলেই সমান ; কিন্তু সামাজিক সাম্য ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই (স্মরণ রাখতে হবে এই বক্তৃতা দেওয়া হয় ১৯০৯ সনে) ; তাই ইউরোপের চেষ্টা সামাজিক সাম্যপ্রতিষ্ঠা। তৃতীয় আদর্শ ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা জীবনে লাভ করা সর্বাপেক্ষা কঠিন ; অথচ সকল ধর্মই একটু বিভিন্ন ভাষায় এই ভ্রাতৃত্ব-মনোভাব-লাভকেই জীবনের চরম আদর্শ বলেছে। খ্রীষ্টান ধর্ম বলে সকল মানুষ ভাই ; মুসলমান ধর্ম বলে সকল মানুষই আল্লার বান্দা অর্থাৎ দাস, এবং ঈশ্বরের চোখে সকল মানুষই সমান ; আর হিন্দু ধর্ম বলে একমেবাদ্বিতীয়ং—এক বই দুই নাই ; ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে, পুণ্যাত্মা ও পাপীতে একই নারায়ণ। যতদিন

মানুষের এই বোধ না জন্মে ততদিন মানুষের অজ্ঞান দূর হয় না ; তার বন্ধনও ঘোচে না ; অর্থাৎ সে মুক্ত ও স্বাধীন নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা যেমন সাম্য, তেমনই সাম্যের প্রতিষ্ঠা ভ্রাতৃত্ব-বোঁধে। এই ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচার করেছে বলে খ্রীষ্টান ধর্মের এত দ্রুত প্রসার হয়েছিল, বৌদ্ধ ধর্মও ভারতে ও উত্তর-পুর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আধুনিক মানবতা ধর্মের বা Religion of Humanityর (বা gospel of love for man) প্রেরণা এই মনোভাব থেকে।

বাংলার নতুন সমিতিসমূহ

তারপর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বক্তৃতায় কী ভাবে ইংরেজের শাসনাধীনে ভারতের প্রাচীন সংঘবদ্ধ জীবনের কেন্দ্রগুলি বিনষ্ট হয় সে কথা বলেন। আমরা ইতিপুর্বে শ্রীঅরবিন্দের কিশোরগঞ্জের পল্লীসমিতি বিষয়ক বক্তৃতায় সে কথা পড়েছি ; এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমরা দেখেছি উনিশ শতকের শেষ দশকে বাংলায় ও মহারাষ্ট্রের দুই একটি ব্যায়াম-সমিতি গড়ে ওঠে কিন্তু বিশশতকের প্রথমে বাংলায় যখন স্বদেশ-প্রেমের বাণ আসে এবং দেশে নতুন জীবন দেখা যায়, তখন জেলায় জেলায় বিভিন্ন সমিতি গড়ে ওঠে। এই সকল সমিতির কার্যকলাপ এবং কিসের প্রেরণায় তাদের উদ্ভব সে কথা বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বরিশালের স্বদেশ বান্ধব সমিতিকে তাদের দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করেন, এবং স্বদেশ বান্ধব সমিতি সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন স্বদেশ বান্ধব সমিতির মুলে ছিল বরিশালের জন-নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত মশায়ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিত্রবল। অশ্বিনীবাবুর ব্রজমোহন কলেজটি ছিল একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এখানে ছেলেরা কেবল পরীক্ষায় পাশ করত না। মানুষের মতন মানুষ হয়েও উঠতো। অশ্বিনীবাবু কলেজের ছেলেদের নিয়ে প্রথমে Little Brothers of the Poor নামক একটি সংঘ সৃষ্টি করেন। সংঘের কর্মীদের কাজ ছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে—রুগ্নের সেবা ; এবং ক্ষুধার্তের অন্ন-যোগানো। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান থেকেই ক্রমে স্বদেশীযুগে স্বদেশ বান্ধব সমিতির উদ্ভব হয়, এবং তার কর্মক্ষেত্রও ব্যাপক হয়ে ওঠে। বরিশালে কোন দেশ নেতা এলে যুবক ছাত্রগণ প্রথমে স্বেচ্ছাসেবক হয়ে নেতাদের সেবায় প্রবৃত্ত হতো দেশ-সেবকের সেবক থেকে সহজেই তারা দেশ-মাতার সেবক হয়ে ওঠে। দেশে স্বদেশী আন্দোলন দেখা দিলে ঘরে ঘরে

স্বদেশী মন্ত্র প্রচার, স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলন এবং স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্যে বিদেশী পণ্যের বর্জন করতে দেশবাসীদের নিকট অনুরোধ উপরোধ সমিতির কর্মীদের কর্মের অঙ্গ হলো। দেশের লোক মামলা মোকদ্দমা করে সর্বস্বান্ত হয়; তাই বরিশালের যুবকেরা আপোষে মামলা মিটাবার চেষ্টা করতো। এই সব দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবকদল আর একটি কাজ করতে প্রবৃত্ত হলো। ইংরেজ রাজপুরুষগণের নিকট বাঙালী অবজ্ঞার পাত্র; কেননা বাঙালীর শরীর দুর্বল। ইংরেজের মতে বাঙালী অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অক্ষম, তাই বাঙালী চিরদিন দাস থাকবে। স্বাধীনতা লাভের যোগ্য কখনো সে হবে না—এই ছিল রাজপুরুষদের ধারণা। ইংরেজ অবশ্য নিজ জাতির শারীরিক বল ও খেলাধুলার প্রশংসায় এতকাল পঞ্চমুখ ছিল। যখন বরিশালের যুবকগণ দেশের এই কলঙ্ক দূর করতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে লাঠিখেলা ও ব্যায়ামাদির চর্চায় প্রবৃত্ত হলো, তখন ইংরেজ শরীর চর্চার প্রশংসায় বিরত হলো। ইংরেজের পুলিশের মতে Lathi is the father of the bomb—আজ যারা লাঠি খেলে কাল তারাই বোমার দল সৃষ্টি করবে। আর স্বেচ্ছাসেবকদের প্রযত্নেই স্বদেশীর বহুল প্রচলন এবং ফলে ইংরেজের বাণিজ্যের অবনতি; তাই স্বেচ্ছাসেবকগণ (volunteers) ইংরেজের চক্ষুশূল। সমিতিগুলিকে বে-আইনি ঘোষণার এই হলো আসল কারণ।

জাতীয়তাবাদীদের কী কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে

তারপর উপসংহারে শ্রীঅরবিন্দ বলেন গভর্নমেণ্ট তো সমিতিগুলিকে বে-আইনি ঘোষণা করে বন্ধ করে দিয়েছে; তা বলে আমাদের তো দেশের কাজ বন্ধ করা চলবে না। তিনি বলেন আমাদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে হবে, নতুন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এতকাল ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এবং ইংরেজের অনুকরণে আমরা ভেবেছি সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে গেলে সংঘের জন্যে সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন করতে হয়; সংঘের জন্যে নির্দিষ্ট সভাগৃহ রাখতে হয়। কিন্তু এগুলি সংঘজীবনের আসল জিনিষ নয় এবং এসব না হলে দেশ-সেবা সম্ভব নয়, একথাও ঠিক নয়। আসল জিনিষ বাইরে নয়, মনে। আসল জিনিষ হলো ভ্রাতৃত্ববোধ। সরকার দেশ ভাগ করতে পারে; কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের বাঙালী মাত্রই ভাই ভাই, এক দেশমাতার সন্তান। আমাদের দেশমাতার সেবা করতে হবে, কিন্তু পূর্বের কর্মপদ্ধতি এখন চলবে না। সভা সমিতিতে

প্রস্তাব আনয়ন ও প্রস্তাব পাশ—এসব করা আর চলবে না। প্রত্যেককে দেশের সেবার জন্যে, এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের সংগে একযোগে কাজ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। সভাসমিতির হাঙ্গামা না করে নিজের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় জেনে নিতে হবে আজ কী করতে হবে, কাল করণীয় কী, এবং এসব কাজ করবার সর্বোত্তম উপায়ই বা কী। তারপর সে সব কাজ করে যেতে হবে। তাই শ্রীঅরবিন্দের কথা "it is a question of working and not of means"। উদ্দেশ্য স্থির থাকলে উপায় আপনিই আসবে। দেশ-ভ্রাতার সেবা, দেশমাতার জন্যে কাজ, এই হবে আমাদের স্থির লক্ষ্য। যেদিন দেশের সকল নেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে, সকল দেশ যেদিন স্বদেশ বান্ধব সমিতি হয়ে উঠবে সেইদিন আমাদের সংঘজীবন সত্য হবে, পূর্ণ হবে।

শ্রীঅরবিন্দ গভর্নমেণ্টের এক নম্বর শত্রু

শ্রীঅরবিন্দ তখন একমাত্র সক্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা। স্বভাবতই গভর্নমেণ্ট মনে করতো শ্রীঅরবিন্দই হলেন ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক নম্বর শত্রু, এবং তাঁকে অপসারিত করা হলেই ইংরেজ নিরাপদ হবে। সিষ্টার নিবেদিতা এই সময় নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারেন শ্রীঅরবিন্দকে নির্বাসিত করার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে পরামর্শ দিলেন শ্রীঅরবিন্দ ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করুন। শ্রীঅরবিন্দ রাজনৈতিক চালে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করা প্রয়োজন বোধ করলেন না। তিনি বললেন তিনি দেশের সম্মুখে তাঁর শেষ নির্দেশ হিসাবে এক কর্মসূচী স্থাপন করবেন। গভর্নমেণ্ট যদি বোঝে যে শ্রীঅরবিন্দকে নির্বাসিত করলেও তাঁর প্রদর্শিত কর্মপন্থা জাতীয়তাবাদীরা অনুসরণ করবেন; এবং শ্রীঅরবিন্দের নির্বাসনের ফলে তাঁর কর্মপন্থা অনুসরণ করবার আগ্রহ বরং বৃদ্ধি পাবে, তাহলে গভর্নমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দকে নির্বাসিত করার কোন সার্থকতা দেখবে না; বরং মনে করবে শ্রীঅরবিন্দের নির্বাসন গভর্নমেণ্টের স্বার্থের প্রতিকূলই হবে। জুলাই মাসের ৩০শে তারিখে কর্মযোগিন্ পত্রিকায় তাঁর দেশবাসীদের নিকট শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত খোলা চিঠিখানা প্রকাশিত হলো। গভর্নমেণ্টও শ্রীঅরবিন্দকে তখনকার মতন নির্বাসন দণ্ড দিতে ক্ষান্ত রইলো।

শ্রীঅরবিন্দের খোলা চিঠি—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যা—

উপরে আমরা শ্রীঅরবিন্দের যে সব বক্তৃতার মর্ম উল্লেখ করেছি তাঁর এই খোলা চিঠিতে সে সব কথারই পুনরুক্তি দেখা যায়। এই চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ

প্রথমে বলেন যে আজকাল এদেশে যিনি দেশের কাজ করেন তিনি যে কোন সময়ে গভর্নমেণ্টের দ্বারা বিনা অপরাধে ও বিনা বিচারে নির্বাসিত হতে পারেন। শোনা যাচ্ছে কলকাতার পুলিশ আমার নির্বাসনের জন্যে গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন পেশ করেছে। যদি আমার নির্বাসন হয়, এবং ভবিষ্যতে দেশের কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব না হয় তবে আমার অনুরোধ আমার দেশবাসীগণ বিশেষত জাতীয়তাবাদীগণ আমার এই খোলা চিঠিখানাকেই যেন তাঁদের নিকট আমার চরম নির্দেশ বলে, আমার উইল বলে গ্রহণ করেন।

পরে দেশের বর্তমান অবস্থায় জাতীয়তাবাদীদের কর্তব্য কী সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ আলোচনা করেন। তিনি বলেন এ কথা ঠিক জাতীয়তাবাদীর সম্মুখে নানা সমস্যা; কিন্তু সেজন্য নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আজ অর্থবল, সৈন্যবল সবই সরকারের পক্ষে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকে কারারুদ্ধ, কেউ কেউ প্রবাসে কাল কাটাতে বাধ্য; তবু তো জাতীয়তা আন্দোলনের অবসান হয় নি। আপাতদৃষ্টিতে দুর্বল হলেও জাতীয়তাবাদীগণ শক্তিহীন নন, কারণ তাঁহাদের পক্ষেই ন্যায়, দেশের যুবশক্তি তাঁদের সমর্থক। দেশের ভবিষ্যৎ জাতীয়তাবাদীদেরই হাতে; তাঁরাই দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা। এখন জাতীয়তাবাদীদের কর্তব্য ধীরভাবে তাঁদের কর্তব্য স্থির করা এবং ধৈর্য ধরে ঈশ্বর-প্রেরিত নেতার জন্যে অপেক্ষা করা। শ্রীঅরবিন্দ বলেন সকল বড় আন্দোলন সফল হয় তখনই, যখন ভগবান আন্দোলনের নেতৃত্ব করবার জন্যে একজন উপযুক্ত নেতা প্রেরণ করেন। তাই জাতীয়তাবাদীদের সেই নেতার জন্যেই প্রতীক্ষা করতে হবে যিনি বিপদে ধীর, পরাজয়ে যিনি নিরাশ হন না। (এ যেন কয়েক বছর পরে ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব; কথাটা ভবিষ্যৎবাণীর ন্যায় শোনায়।)

একটি বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদীদের সাবধান হতে বলেন। তাঁদের শক্তি এখানে যে তাঁদের দাবী ন্যায্য। তাই জাতীয়তাবাদীরা যেন ন্যায় পথ থেকে ভ্রষ্ট না হন। তিনি জাতীয়তাবাদীদের স্মরণ করিয়ে দেন যে যারা আইন মানতে জানে না বা পারে না তারা কখনও দেশ-শাসন করবার যোগ্য হয় না। দেশের কিছু সংখ্যক যুবক আজ হত্যা প্রভৃতি বে-আইনি কার্যে লিপ্ত। ঐ সকল পথভ্রষ্ট যুবকের সঙ্গে দেশবাসীর বা জাতীয়তাবাদীর কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের পক্ষে এ কথা বলাই যথেষ্ট যে আমরা ঐ সকল যুবকের ভ্রান্তপথ সমর্থন করি না। ঐ সকল যুবকের ভ্রান্ত কর্মনীতি গভর্নমেণ্টের

নির্যাতন-নীতির ও ভ্রান্ত শাসন-নীতিরই অবশ্যম্ভাবী-ফল। যতদিন গভর্নমেণ্টের তরফে নির্যাতন বন্ধ না হবে এবং সুশাসন প্রবর্তন না হবে ততদিন পথভ্রষ্ট যুবকদের কদাচারও বন্ধ হবার নয়।

তারপর শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য ও কর্মপন্থার কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন জাতীয়তাবাদীদের লক্ষ্য পুর্ণ-স্বাধীনতা; এবং তাঁদের কর্মপন্থার দুটি অঙ্গ। এ দুটি অঙ্গের একটি হলো স্বাবলম্বন, দ্বিতীয়টি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। জাতীয়তাবাদীরা দেশের আইন ভঙ্গ না করেও স্বাবলম্বী হতে পারেন। স্বাবলম্বী হতে হলে জাতীয়তাবাদীদের কোন্ কোন্ কাজের ভার গ্রহণ করতে হবে সে কথা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কিশোরগঞ্জের বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। সেই বক্তৃতায় উল্লিখিত সব কর্মের তালিকার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই খোলা চিঠিতে তিনি একথাও বলেছেন যে জাতীয়তাবাদীদের সর্বোপরি দেশের শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে হবে—কেবল দেশ থেকে নিরক্ষরতা দুর করা নয়, কারিগরি শিক্ষা, দেহ ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও তাঁদের ভাবতে হবে। আর জাতীয়তাবাদীদের কর্মপন্থার দ্বিতীয় অঙ্গ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে আজিকার কোন সভ্য দেশেই এই কর্মপন্থা দূষণীয় বা আপত্তিকর বলে বিবেচিত হতে পারে না।

তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের ব্যাখ্যা করে বলেন যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সার মর্ম হলো এই যে যতদিন গভর্নমেণ্ট দেশের শাসন-ব্যবস্থায় আমাদের অংশীদার না করবে ততদিন আমরা গভর্নমেণ্টের সঙ্গে কোন সহযোগিতা করবো না। ইতিপুর্বে "বয়কট" কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি যা বলেছেন এখানে তার পুনরুক্তি ও সম্প্রসারণ করে তিনি বলেন যে অষ্টাদশ শতকে স্বাধীনতা-সমরের সময় আমেরিকাবাসীদের মুলনীতি ছিল No representation, no taxation. আজ বিংশ শতকেও ভারতবাসীর কোন রাষ্ট্রিক অধিকার নেই; তাই আজ ভারতবাসীর মুলনীতি হলো No control, no co-operation, অর্থাৎ যতদিন দেশের শাসন-ব্যবস্থায়—আইন-প্রণয়নে, আয়ব্যয় নিধারণ প্রভৃতি ব্যাপারে—আমাদের সত্যিকার অধিকার না না থাকবে ততদিন আমরা গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবো না। অবশ্য এই অসহযোগিতা কি পুর্ণ-মাত্রায় অসহযোগিতা, না আংশিক অসহযোগিতা হবে তা নির্ভর করবে অবস্থার উপর; নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি কথাটা বুঝিয়ে

বলেছেন। তিনি বলেন এমন যদি হয় যে গভর্নমেণ্ট ভারতবাসীদের সত্যিকার কোন অধিকার দেয় তবে তা প্রত্যাখ্যান করে গভর্নমেণ্টের সংগে অসহযোগিতা করা সমীচীন হবে না। যথা গভর্নমেণ্ট যদি আমাদের প্রতিনিধিদের হাতে বিদেশী পণ্যের উপর ট্যাক্স বসাবার অধিকার দেয় এবং প্রতিনিধিদের পক্ষে সেই অধিকার বলে যদি দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি করা সম্ভব হয়, তবে বিলেতি পণ্য বর্জন নীতি আঁকড়ে থাকার কোন প্রয়োজন আর থাকবে না। দ্বিতীয়ত দেশের শিক্ষার ভার যদি কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর গভর্নমেণ্ট দেয় তবে প্রচলিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জন নিরর্থক হবে। তৃতীয়ত দেশের বিচারালয় সমূহের বিচারকগণ যদি দেশীয় লোক হন এবং তাঁরা যদি একমাত্র সরকারের নিকট দায়ী না হয়ে কোন দেশীয় মন্ত্রীর নিকট দায়ী হন তবে সরকারের বিচারালয় বর্জন করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। মোট কথা একমাত্র অসহযোগিতাই শ্রীঅরবিন্দের কর্মপন্থার সবটুকু ছিল না। গভর্নমেণ্ট সত্যিকার কোন অধিকার দিলে তিনি তাঁর দেশবাসীকে স্বাধীনতার পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তা গ্রহণ করতে বলেন; এর পরে অধিকতর অধিকার আদায়ের জন্যে আন্দোলন করতে প্রস্তুত থাকতে বলেন। আমরা দেখবো পরে ১৯৪২ সনে ক্রিপস্ সাহেবের প্রস্তাব গ্রহণ করার অনুকূলে যে তিনি মত দিয়েছিলেন তা এই নীতি অনুসরণেরই ফল। তবে তিনি মডারেট নেতাদের মতন নামমাত্র ভুয়ো অধিকার গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না, তা তিনি বিডন স্কোয়ারের ও কুমারটুলির বক্তৃতায় ভাল করেই বলেছিলেন।

তারপর তিনি জাতীয়তাবাদীদের আর একটি কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন সুরাটে কংগ্রেস ভঙ্গ হওয়ায় জাতীয় আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেশের ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে; এবং ঐক্যহীন আন্দোলন সফল হবার নয়। তাই জাতীয়তাবাদীদের কর্তব্য সর্বপ্রযত্নে দেশে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্যে পুনরায় যত্নবান হওয়া। কলকাতার পান্তির মাঠের বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেছিলেন। এই চিঠিতে তিনি বলেন যুক্ত কংগ্রেস যদি বর্তমানে সম্ভব না হয়; কংগ্রেসের ভিতরে মডারেট ও জাতীয়তাবাদীরা যদি একযোগে কাজ করতে না পারেন, তবে কংগ্রেসের বাইরে প্রাদেশিক সম্মিলনীগুলিতে দুই দল একযোগে কাজ করতে চেষ্টা করুন না কেন? প্রাদেশিক সম্মিলনীগুলিতে দুই দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি একত্র হয়ে প্রদেশের সকল প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেষ্টা করেন তবে হয়ত পরে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভিতরেও

দু' দলের পক্ষে একত্রে কাজ করা ক্রমে সম্ভব হবে। এইভাবে যুক্ত কংগ্রেস পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে জাতীয়তাবাদীরা যেন চেষ্টা করেন।

উপসংহারে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দেশবাসীর সম্মুখে নিম্নলিখিত কার্যক্রম স্থাপন করেন:

খোলা চিঠিতে বর্ণিত কার্য-ক্রম

১। আইন অমান্য না করে, সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে, শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বাবলম্বন-নীতি ও অহিংস বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতিতে স্থির থাকা।

২। সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না অসহযোগিতা তা নির্ণয় করবার মূল নীতি হবে No Control, no co-operation অর্থাৎ সত্যিকার অধিকার পাওয়া গেলে সহযোগিতা, আর যতদিন সত্যিকার অধিকার পাওয়া যাবে না ততদিন অসহযোগিতা।

৩। জাতীয়তাবাদীদের নিজস্ব নীতি বিসর্জন না দিয়ে যখনই সম্ভব হবে তখনই মডারেটদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা। দেশের ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করা।

৪। গভর্নমেণ্টের উপর সত্যিকারের চাপ পড়ে, এবং গভর্নমেণ্টের আর্থিক শোষণ যাতে অবাধ না হয় সেই লক্ষ্য সম্মুখে রেখে বয়কট নীতি নিয়ন্ত্রিত করা।

৫। জাতীয় আদর্শ অনুসারে সমগ্র দেশকে বর্তমানে সম্ভব না হলেও অন্তত প্রদেশগুলিকে সুব্যবস্থিত করার চেষ্টা করা।

৬। সমিতিগুলি বে-আইনি ঘোষিত হওয়া সত্বেও আইন বাঁচিয়ে কর্মীদের সংগঠন-মূলক কাজ করে যাওয়া।

হুগলী কনফারেন্স

১৯০৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হুগলী জেলার চুঁচুড়া সহরে বাংলার প্রাদেশিক সম্মিলনীর (Provincial Conference) অধিবেশন হয়। দুই দিন ব্যাপী এই অধিবেশনে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করেন। এই কনফারেন্সের প্রধান আলোচ্য ছিল প্রস্তাবিত মর্লি-মিণ্টো সংস্কার। সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্বন্ধে দেশে দুই মত দেখা দিয়েছিল। আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কুমারটুলির বক্তৃতায় সরকারের এই সংস্কার প্রস্তাবকে Brummagem বা বাজে জিনিষের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন; কিন্তু মডারেট নেতারা ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। অবশ্য মডারেট-নেতাদের

অনেকেরই এই সংস্কার-প্রস্তাবের মূল্য সম্বন্ধে উঁচু ধারণা ছিল না। বাংলার মডারেট নেতা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর A Nation in Making পুস্তকে বলেছেন: "মর্লি-মিণ্টো প্রবর্তিত শাসন-সংস্কার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে সামান্য মাত্র অগ্রগতি আনিয়াছিল। কেহই ইহাতে অসামান্য কিছু দেখে নাই; কারণ ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য মাত্র এই ছিল যে ইহা বেসরকারী সভ্যদের জন-স্বার্থ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিবার দক্ষতা দিয়াছিল।" ('মহাজাতি গঠন পথে' পুস্তক থেকে গৃহীত। পুস্তকখানা A Nation in Making পুস্তকের বাংলা অনুবাদ)। ঐ পুস্তকের অন্যত্র সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সত্য কথা বলিতে গেলে এই মর্লি-মিণ্টো ব্যবস্থায় আমরা সরকারের উপর অপ্রত্যক্ষভাবে নৈতিক প্রভাব বিস্তারের অধিকার লাভ করি।" মর্লি-মিণ্টো প্রস্তাব ভারত-বাসীদের সত্যিকার কোন অধিকার দেয়নি; বরং হিন্দুমুসলমান প্রতিনিধিদের স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা করে দেশের মহা অনিষ্টই করে। তাই জাতীয়তাবাদীদের নিকট এই প্রস্তাব ছিল গ্রহণের অযোগ্য।

কনফারেন্সে যা ঘটে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের On Himself and On the Mother পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। তার মর্ম এই: হুগলী কনফারেন্সের ডেলিগেটদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ডেলিগেটগণই ছিলেন সংখ্যায় অধিক। প্রকাশ্য অধিবেশনের পূর্বে বিষয়-নির্বাচনী কমিটি (Subject Committee) মডারেট প্রতিনিধিদের আনীত প্রস্তাব, "মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রস্তাব গৃহীত হউক," ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্য করে। "শাসন-সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য"—বিষয়-নির্বাচনী সমিতিতে শ্রীঅরবিন্দের এই প্রস্তাবই ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়। তখন মডারেটগণ জিদ করলেন এবং ভয় দেখালেন যে যদি শাসন-সংস্কার প্রস্তাব কনফারেন্সে গৃহীত না হয়, তবে তারা কনফারেন্সের সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন কংগ্রেসে না হলেও অন্তত প্রাদেশিক সম্মিলনীতে দুই দল একত্র কাজ করুক। তাই তাঁর অনুরোধে জাতীয়তাবাদীগণ প্রকাশ্য অধিবেশনে মডারেটদের প্রস্তাবের বিরোধিতা না-করাই স্থির করেন। প্রকাশ্য অধিবেশনে শ্রীঅরবিন্দ একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় এই কথাটা স্পষ্ট করে বলেন যে জাতীয়তাবাদীদের নিকট শাসন-সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য হলেও তাঁরা প্রস্তাবের উপর ভোটে কোন অংশ গ্রহণ করবেন না। এই কথা বলে তিনি সভা ত্যাগ করেন; এবং সকল জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধি নীরবে একযোগে

তাঁর অনুগমন করেন। তারপর মডারেটগণ তাঁদের প্রস্তাব বিনা বাধায় পাশ করাতে সক্ষম হন। কিন্তু মডারেট নেতারা ক্ষুব্ধ হলেন একথা ভেবে যে সব পুরাতন নেতা দেশের কাজে চুল পাকিয়েছেন তাদের মত অগ্রাহ্য করে একদল প্রতিনিধি রাজনীতির ক্ষেত্রে নবাগত এক যুবক নেতাকে বিনা বাক্যে অনুসরণ করলেন। বাংলার গুরুত্বপুর্ণ সভাসমিতিতে শ্রীঅরবিন্দের যোগদান বোধহয় এখানেই শেষ হয়।

দেশের পরিস্থিতি ও শ্রীঅরবিন্দের ক্ষোভ

এইরূপে ১৯০৯ সন শেষ হয়ে এলো। শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিন ও ধর্মে তাঁর জাতীয়তাবাদী ও ধর্মের বাণী প্রচার করে চলেছেন। কিন্তু দেশে তখন বিশৃঙ্খলা। একদিকে গভর্নমেন্টের নির্যাতন, অপরদিকে মরিয়া হয়ে একদল বিপ্লবী যুবকের সরকারী কর্মচারী হত্যা। শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৯ সনের ডিসেম্বর মাসে আর একখানা খোলা চিঠি কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সেই পত্রে তিনি বলেন দেশে এক ভীষণ পাপচক্র দেখা দিয়েছে—গভর্নমেণ্ট যতই নির্যাতন-নীতির অনুসরণ করছে, বিপ্লবীদলও ততই তাদের অনাচার, পিস্তল বোমার সাহায্যে হত্যা প্রভৃতি দুষ্কার্য করে চলেছে; ফলে গভর্নমেণ্টকেও আবার নির্যাতনের মাত্রা বাড়াতে হচ্ছে; প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীদলও উগ্রতর কর্মপন্থা গ্রহণ করছে। এই পাপচক্রের শেষ কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ কর্মযোগিন পত্রিকায় সরকার ও বিপ্লবীদল উভয় পক্ষকেই তাদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে উপদেশ দেন। কোন পক্ষই এই উপদেশে কান দিল না। ইতিমধ্যে ১৯১০ সনের জানুয়ারী মাসে আবার এক দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড ঘটে—হাইকোর্টে পুলিশ সুপারিন্টেনডেণ্ট সামস-উল-আলম বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। গভর্নমেণ্টের চোখে শ্রীঅরবিন্দই সরকারের প্রধান অন্তরায়। তার দ্বিতীয় খোলা চিঠিখানা (কর্মযোগিন পত্রিকায় ১৯০৯ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত) গভর্নমেণ্ট রাজদ্রোহকর মনে করে শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা স্থির করে। পরে যখন অভিযোগ আনা হয় তখন শ্রীঅরবিন্দ বাংলার বাইরে পণ্ডিচেরীতে। কর্মযোগিন পত্রিকার মুদ্রাকর রাজদ্রোহকর চিঠি প্রকাশের জন্য অভিযুক্ত হন। নিম্ন আদালতে তাঁর জেলের হুকুম হয়; কিন্তু হাইকোর্টের বিচারে চিঠিখানা রাজদ্রোহকর বিবেচিত না হওয়ায় মুদ্রাকর খালাস পান। ইতিপুর্বেই শ্রীঅরবিন্দ কলকাতা ত্যাগ করেছেন।

কলকাতা ত্যাগ

শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা ত্যাগের ইতিহাস এই: ১৯১০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন সন্ধ্যায় কর্মযোগিন পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রামচন্দ্র মজুমদার শ্রীঅরবিন্দকে বলেন যে এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীর নিকট সঠিক সংবাদ পাওয়া গেছে যে পরদিন কর্মযোগিন অফিসে খানাতল্লাসী হবে এবং শ্রীঅরবিন্দ গ্রেপ্তার হবেন। কর্তব্য স্থির করতে শ্রীঅরবিন্দের কয়েক মিনিটের অধিক সময় লাগলো না। সংবাদ পাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি কর্মযোগিন অফিস ত্যাগ করে গঙ্গার ঘাটে যান; এবং একখানা ভাড়াটে নৌকায় দুজন সঙ্গীসহ চন্দননগর যাত্রা করেন। নৌকা তখনই ছেড়ে দেয় এবং ভোর রাত্রে চন্দননগর পৌঁছায়।

শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর যাওয়ার প্রসঙ্গে কয়েক বছর আগে নানা বাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয়। চন্দননগর-যাত্রায় শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রবাসী পত্রিকায় যে বিবরণ দেন রামচন্দ্র মজুমদার তাঁর প্রতিবাদ করে প্রবাসীতে এক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর প্রবন্ধে রামচন্দ্র মজুমদার বলেন যে চন্দন-নগর যাত্রার পূর্বক্ষণে শ্রীঅরবিন্দ বাগবাজার মঠে গিয়ে পূজনীয়া সারদামণি দেবীর সঙ্গে দেখা করেন; সিষ্টার নিবেদিতার পরামর্শও চাওয়া হয়। সিষ্টার নিবেদিতার পরামর্শেই শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর যান; এবং সিষ্টার নিবেদিতা ও ব্রহ্মচারী গণেন্ মহারাজ গঙ্গার ঘাটে এসে শ্রীঅরবিন্দকে বিদায় দেন। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী রামচন্দ্র মজুমদারের প্রবন্ধের জবাবে লেখেন চন্দননগর যাবার আগে শ্রীঅরবিন্দ বাগবাজারে মঠে যাননি, কিংবা সিষ্টার নিবেদিতার পরামর্শও চাননি। কর্মযোগিন অফিস থেকে সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে সুরেশ চক্রবর্তী ও বীরেন ঘোষ নামক অপর এক যুবকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর যাত্রা করেন।

এই বাদ-প্রতিবাদের কথা শ্রীঅরবিন্দকে জানান হলে তিনি লিখে জানান (১৯৪৪ সনের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে) সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর বিবরণই ঠিক; রামচন্দ্র মজুমদারের বিবরণ ভুল। শ্রীঅরবিন্দ রামচন্দ্র মজুমদারের ভ্রম সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন; এবং সে প্রসঙ্গে একথাটা বলেছিলেন: Historical and biographical truth has its claim. (Sri Aurobindo on Himself and on the Mother (p 103)

অন্তরের নির্দেশে চলা শ্রীঅরবিন্দের জীবনের মূলনীতি ছিল। তাঁর এই নীতিই ছিল "an absolute law of the being." Sri Aurobindo

On Himself And On The Mother পুস্তকের ৯৬ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : "From the time I left Lele of Bombay after the Surat Sessions……I had accepted the rule of following the inner guidance implicitly and moving only as I was moved by the Divine"। তাই কর্মযোগিন অফিসে যখন রামচন্দ্র মজুমদার আসন্ন খানাতল্লাসের ও গ্রেপ্তারের সংবাদ আনেন তখন অফিসে উপস্থিত লোকেরা উত্তেজিত হয়ে আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু অরবিন্দ ছিলেন ধীর স্থির। তিনি অন্তরে নির্দেশ (Sailing order) পেলেন : 'চন্দননগর যাও।' তখন চন্দননগরে কোথায় উঠবেন, কার আশ্রয় পাবেন এসব কথা ভাবা প্রয়োজন মনে না ক'রে বিনা দ্বিধায় দশ বার মিনিটের মধ্যেই চন্দননগর যাওয়া স্থির ক'রে তিনি অফিস থেকে বের হয়ে পড়েন। বাগবাজার মঠে বা অন্য কোথায়ও যাবার সময় ছিল না।

কলকাতা ত্যাগ করার পর তিনি গোপনে সিষ্টার নিবেদিতার নিকট একটি বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে তাঁকে নিজের অনুপস্থিতির সময় কর্মযোগিন পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। এর পর কর্মযোগিনের মাত্র কয়েকটি সংখ্যা বের হয় ; এবং সিষ্টার নিবেদিতার সম্পাদনায়ই তা বের হয়। কলকাতা ত্যাগের পর শ্রীঅরবিন্দ আর কর্মযোগিনের জন্য কোন প্রবন্ধ লেখেননি। কর্মযোগিনের শেষ সংখ্যা বের হয় ১৯১০ সনের ২রা এপ্রিল। অন্তরের নির্দেশে তিনি চন্দননগর ত্যাগ করে ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরী পৌঁছেন।

কর্মযোগিন বন্ধ হলো, 'ধর্ম'-ও বন্ধ হয়ে গেল। ধর্ম পত্রিকায় মতিলাল রায় মশাই 'নবতন্ত্র' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি বের হলে গভর্নমেণ্ট পত্রিকার নিকট দু'হাজার টাকা জামানৎ দাবী করে। ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

কলকাতায় রচিত সাহিত্য

এই অধ্যায় শেষ করবার পুর্বে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতার কর্ম-ব্যস্ত জীবনেও যে কবিতা রচনার সময় পেয়েছিলেন তার একটু উল্লেখ প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে তাঁর কুমারটুলির বক্তৃতার একটি কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জেল থেকে বের হবার পর তিনি রাজনীতিতে আবার যোগ দেন ইংরেজী পত্রিকাগুলি তা পছন্দ করতো না ; এবং তারা শ্রীঅরবিন্দকে অযাচিত উপদেশও দিয়েছিল। কলকাতার The Englishman পত্রিকা মন্তব্য করেছিল যে

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ সাহিত্য ও ধর্ম নিয়েই থাকবেন, সকলে এই আশাই করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ তার সমুচিত উত্তর দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি তো সাহিত্য ও ধর্ম নিয়েই রয়েছেন—আগের স্থায় তিনি স্বরাজ ও স্বদেশী সম্বন্ধে লিখ্‌ছেন—তা তো এক প্রকার সাহিত্য রচনাই, আর তিনি তো ধর্ম নিয়েই রয়েছেন; কারণ স্বরাজ ও স্বদেশী তাঁর ধর্মেরই অঙ্গ; এবং স্বরাজ ও স্বদেশী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি তাঁর ধর্মই পালন করছেন। সে কথা যাক্, কলকাতা থাকা কালে তিনি যে দুটি বীররসপূর্ণ কবিতা রচনা করেন তার মধ্যে একটি হলো "বিদুলা।" মহাভারতের বিদুলা-উপাখ্যান নিয়ে রচিত এটি একটি উৎকৃষ্ট কবিতা; অপর একটি কবিতার নাম "বাজীপ্রভু"—মহারাষ্ট্রের এক আত্মত্যাগী বীরের কাহিনী। দুটির বিষয়বস্তুই স্বদেশ-প্রেম ও দেশের স্বাধীনতা, এবং শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্বের যুগে কবিতা দুটির রচনা যে স্বাভাবিক তা স্বীকার করতেই হবে।

বিদুলার উপাখ্যান মহাভারতের উদ্যোগপর্বের একটি প্রসিদ্ধ উপাখ্যান। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দূত হয়ে কুরুসভায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যান কিন্তু ব্যর্থ হন। পাণ্ডব-জননী কুন্তী তখন বিদুরের গৃহে বাস করছিলেন। কুন্তী ছিলেন তেজস্বিনী রমণী। যুধিষ্ঠিরকে কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকট বিদুলার উপাখ্যান বর্ণনা করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেন তিনি যেন যুধিষ্ঠিরকে উপাখ্যানটি শোনান। বিদুলার উপাখ্যান নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ যে কবিতা রচনা করেন প্রথমে তার নাম ছিল The Mother to Her Son. কবিতাটি ১৯০৭ সনের জুন মাসে বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উপাখ্যানটি এই: বিদুলার পুত্র সঞ্জয় সিন্ধুরাজ কর্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে নিরাশ ও নিরুদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। বিদুলা পুত্রকে তিরস্কার করে বলেন, "তুমি আমার পুত্র নও। আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ করে তোমাদের মহাকুলে এসেছি। আমি রাজ্যের অধিশ্বরী ও পতির আদরিনী ছিলাম। সঞ্জয়, আমাকে এবং তোমার পত্নীকে যদি হীন দশায় পতিত দেখেও তুমি নিশ্চেষ্ট থাক তবে তুমি ক্লীব, তোর জীবনে ধিক্।" মাতার কথায় মোহমুক্ত হয়ে সঞ্জয় যুদ্ধ করে শেষে জয়ী হন।

'বাজীপ্রভু' কবিতাটি ১৯১০ সনে কর্মযোগিন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাজীপ্রভু ছিলেন শিবাজীর এক অনুচর। মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শিবাজী চলেছেন রায়গড়ের অভিমুখে; উদ্দেশ্য পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে

মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। মুঘল সৈন্য শিবাজীর পিছনে তাড়া করে আসছে। পথে এক গিরিপথ। সেই গিরিসংকটে কিছুকাল শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখা গেলে শিবাজী নিরাপদে রায়গড়ে পৌঁছে যাবেন। শিবাজী বাজীপ্রভুর উপর গিরি-সংকট রক্ষার ভার দিলেন। মাত্র ৫০ জন সৈন্যসহ বাজীপ্রভু ঐ বিপজ্জনক কাজের ভার গ্রহণ করলেন। তাঁর ভরসা ভবানীদেবী। মুঘল সৈন্যদল এসে গেল; তাদের দলে অসংখ্য মুঘল ও রাজপুত বীর যোদ্ধা; বাজীপ্রভু প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাঁর উৎসাহে তাঁর ক্ষুদ্র সৈন্যদল অসাধ্য সাধন করতে লাগলো। শেষে তাঁর গোলাগুলি ফুরিয়ে এলো; ৫০ জনের মধ্যে মাত্র ১৫ জন জীবিত রইলো এবং তিনি নিজেও ভীষণভাবে আহত হলেন। তবু মুঘলগণ গিরিসংকট অতিক্রম করতে পারলো না। ক্রমে দিন শেষ হয়ে এলো। শিবাজী নতুন সৈন্যদল নিয়ে এসে মুঘলদের বিতাড়িত করলেন; কিন্তু বাজীপ্রভু তখন বীরশয্যা আশ্রয় করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই দুটি বীররসপূর্ণ কবিতা স্বভাবতই শ্রীঅরবিন্দের লেখনী থেকে বের হয়েছিল।

এই দীর্ঘ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের কলকাতা পর্বের জীবনী আলোচিত হল। এখানে আর একটি কথার উল্লেখ না করলে শ্রীঅরবিন্দের এই পর্বের জীবন-কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে। এই পর্ব বাংলার গৌরবময় স্বদেশীযুগ। আবার এই সময় বাংলায় সন্ত্রাসবাদ—বোমা-পিস্তলের সাহায্যে নরহত্যার রেওয়াজ দেখা দেয়। শ্রীঅরবিন্দ কি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? এই খণ্ডের শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ

মতিলাল রায় মশাইয়ের গৃহে শ্রীঅরবিন্দ

চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ কোথায় উঠবেন সে সব কিছুই আগে থেকে স্থির করা ছিল না। চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায় মশাই শ্রীঅরবিন্দর পরিচিত ছিলেন চন্দননগরে পৌঁছে রায় মশাইয়ের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে লোক পাঠানো হলো। চারুবাবু নিঃসন্দেহে একজন হৃদয়বান লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত হয়ে বিব্রত হয়েছিলেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে ভয় পেলেন, এবং বলে পাঠালেন আত্মগোপন করার পক্ষে জনবহুল কলকাতাই প্রকৃষ্টতর স্থান। শ্রীঅরবিন্দকে আশ্রয় দিতে না পেরে চারুবাবু যখন দুঃখিত ও চিন্তিত মনে চুপ করে বসেছিলেন তখন তাঁর এক সহযোগী শ্রীশ ঘোষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। চারুবাবু তাঁকে গোপনে শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরে আগমন-সংবাদ দেন। তখন ভোর বেলা। শ্রীশ বাবু হন্তদন্ত হয়ে তাঁর সহযোগী ও বন্ধু মতিলাল রায় মশাইকে সেই সংবাদ দিলেন। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে রায় মশাইয়ের তখনও সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় ছিল না। তবে শ্রীঅরবিন্দের লেখা ও বক্তৃতা, আর দেশের জন্যে তাঁর ত্যাগ-স্বীকার মতিবাবুকে মুগ্ধ করেছিল। মতিবাবু তখন বয়সে যুবক; এবং প্রথম বয়স থেকেই ধর্ম-পিপাসু এবং দেশ-সেবায় ও নানা সৎকার্যে চন্দননগরের একদল যুবকের নেতা। শ্রীঅরবিন্দের আগমন-সংবাদ পেয়ে মতিবাবু তাড়াতাড়ি গঙ্গার ঘাটে শ্রীঅরবিন্দের খোঁজে এলেন। কিছুদূর এসে তিনি একখানা পান্সি নৌকা দেখলেন। পান্সির বাইরে দু'জন অপরিচিত যুবক বসেছিলেন। মতি বাবু যুবকদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই নৌকায় অরবিন্দবাবু আছেন কি?" তারা তাঁকে ভিতরে আসতে বললেন। মতিবাবু ভিতরে গিয়ে দেখেন শ্রীঅরবিন্দ নৌকার ভিতরে নিশ্চিন্তমনে ঘুমাচ্ছেন। রায় মশাই লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে ঐ নৌকায় শ্রীঅরবিন্দকে তাঁর বাড়ীর অদূরস্থিত এক শ্মশান-ঘাটায় নিয়ে আসেন এবং তাঁর নিজগৃহে সংগোপনে শ্রীঅরবিন্দের থাকার ব্যবস্থা করেন।

বীরেন ও সুরেশ কলকাতায় ফিরে যান, মতি বাবু প্রথমে নিজ বাড়ীতে, পরে চন্দননগরে অন্য দু' এক স্থানে গোপনে শ্রীঅরবিন্দের বাসের ব্যবস্থা করেন। মতিবাবুর জনকয়েক বিশ্বস্ত বন্ধু ব্যতীত অপর কেউ শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগরের থাকার কথা জানতে পারেনি। চন্দননগরে শ্রীঅরবিন্দ প্রায় দেড়মাস ছিলেন।

মতিবাবুর উপর শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব

চন্দনগরে শ্রীঅরবিন্দের সময় কাটতো নির্জনে ধ্যান-ধারণায়। শ্রীঅরবিন্দের এই সময়ের কার্যকলাপ মতিবাবু তাঁর "জীবন সঙ্গিনী" পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ঐ পুস্তক থেকে আমরা জানতে পারি শ্রীঅরবিন্দ মতিবাবুর জীবনের উপর কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রের যে দু-একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের ইতিপুর্বে উল্লেখ করতে হয়েছে তার সমর্থন মতিবাবুর ঐ পুস্তক থেকে পাওয়া যায়। মতিবাবু লিখেছেন নির্জনে সারা মধ্যাহ্ণ শ্রীঅরবিন্দের মুখ থেকে যোগ, ভক্তি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে নানা কথা বের হতো; মতিবাবু তন্ময় হয়ে শুনতেন। শ্রীঅরবিন্দ মতিবাবুকে ভগবানে আত্মসমর্পণ রহস্য বুঝিয়ে দেন। মতিবাবু বলেছেন, "আমার সবখানি যেন তাঁর (শ্রীঅরবিন্দের) পরশ-প্রতীক্ষায় স্তম্ভিত ছিল; জীবনের সকল দুয়ার একে একে তাঁর কথায় খুলিতে আরম্ভ করিল।" শ্রীঅরবিন্দ মতিবাবুকে সাধনার অনেক গভীর সঙ্কেত দিলেন। ফলে মতিবাবু শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক প্রভাবের সম্পূর্ণ অধীনে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। মতিবাবু মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষায় ও উপদেশেই তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ খুলে যায়। এরপর কী আধ্যাত্মিক কী রাজনৈতিক কোন ব্যাপারেই মতিবাবু শ্রীঅরবিন্দের আদেশ ও উপদেশ না নিয়ে কিছু করতেন না। উল্লেখযোগ্য যে মতিবাবুর প্রসিদ্ধ পত্রিকা প্রবর্ত্তকের পরিকল্পনা ও নাম শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পরামর্শ করেই নাকি স্থির হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী প্রয়াণের পরও কয়েক বছর মতিবাবু শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের কাছে সাধনার উপদেশ ও রাজনৈতিক কর্মের নির্দেশ মতিবাবু পেতেন। তারপর ১৯২০ সনে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মতিবাবুর মতভেদ হয়; এবং মতিবাবু স্বতন্ত্রভাবে নিজের পথে চলতে থাকেন। দেশের কল্যাণসাধনে মতিবাবুর বিবিধ অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শ্রীঅরবিন্দের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মতিবাবু

আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মূল সূত্র ছিল ভগবানে আত্মসমর্পণ। মতিবাবু "জীবন সঙ্গিনী"-তে লিখেছেন: "শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি কথা কহিলে মনে হইত আর কেহ কথা কহাইলে তবেই তাঁর বাক্যস্ফুরণ হয়। তাঁর হস্তখানির সঞ্চালনেও বোধ হয় কোন তৃতীয় শক্তি কর্তৃক হস্ত যেন চালিত হইতেছে। তাঁর সম্মুখে সকালে (জলখাবারের) রেকাবিখানা ধরিলাম। তিনি যন্ত্রচালিতের মত কিছু খাদ্য গ্রহণ করিলেন। প্রথম দিন দুপুরে দোকানের অবিশুদ্ধ দ্রব্যাদি তিনি কী নির্বাচারে চর্বন করিয়া উদরস্থ করিলেন।" বলা দরকার প্রথমে মতিবাবুর গৃহের কেউ এমন কি তাঁর স্ত্রী-ও তাঁদের গৃহে অরবিন্দের অবস্থানের কথা জানতে পারেননি। মতিবাবুর কাঠের আসবাবের ব্যবসায় ছিল; এবং আসবাব-পূর্ণ এক গুদাম ঘরে মতিবাবু শ্রীঅরবিন্দকে গোপনে রেখেছিলেন। শেষে আকস্মিকভাবে মতিবাবুর স্ত্রী তাঁর গৃহে শ্রীঅরবিন্দের থাকার কথা জানতে পারেন। তারপর থেকে মতিবাবুর স্ত্রী-ই অতি গোপনে শ্রীঅরবিন্দের আহারের ব্যবস্থা করেন; দোকানের খাবার শ্রীঅরবিন্দকে আর খেতে হয় না। কিন্তু মতিবাবু ও তাঁর স্ত্রী ব্যতীত তাঁর গৃহের অপর কেউ জানতেন না যে শ্রীঅরবিন্দ সংগোপনে গুদাম ঘরে অবস্থান করছেন।

আমরা দেখেছি বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ ক্লার্ক সাহেব বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দের চোখে রয়েছে Mystic-এর আলো, এবং শ্রীঅরবিন্দ সম্ভবত সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর নানা দিব্যদর্শন লাভ করতেন। মতিবাবুর লেখাতে ক্লার্ক সাহেবের কথার সমর্থন পাওয়া যায়। মতিবাবু লিখছেন: "শ্রীঅরবিন্দ প্রায়ই চুপ করিয়া উর্ধ্ব দৃষ্টিতে থাকিতেন। যখন কথা বলতেন তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, 'আপনি এরূপ এক দৃষ্টিতে কী দেখেন? তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আজও বুকে উজ্জ্বলভাবে আঁকা আছে। তিনি বলিলেন, 'কতকগুলি লিপি ভাসিয়া আসে, অর্থ বাহির করার চেষ্টা করি।' আবার বলিলেন 'অলক্ষ্য জগতে যে সব দেবতা আছেন তাঁহাদের আকার ফুটিয়া উঠে। অক্ষরের মত এই মূর্তিও অর্থময়—কিছু জমাইতে চাহে; সেগুলিও আবিষ্কার করিতে যত্ন করি।'

মূর্তি-দর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

অবশ্য যুক্তিবাদীর নিকট শ্রীঅরবিন্দের এই সব "দর্শন" দুর্বোধ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে Sri Aurobindo on Himself and on the

Mother পুস্তকের ১৪১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত একখানা চিঠিতে দেখা যায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: I remember when I first began to see inwardly (and outwardly also with the open eye), a scientific friend of mine began to talk of after-images—'these are only after-images !' I asked him whether after-images at a time. He said, 'no', to his knowledge only for a few seconds; I also asked him whether one could get after-images of things not around one or even not existing upon this earth, since they had other shapes, another character, other hues, contours……—he could not reply in the affirmative. That is how these so-called scientific explanations break out as soon as you pull them out of their cloudland of mental theory and face them with the actual phenomena they pretend to decipher"। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের এই সব দর্শন হলো actual phenomena, মনের ভ্রম বা hallucination নয়; এবং বিজ্ঞান এই সবের কোন ব্যাখ্যা দিতে পারে না। বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ ক্লার্ক সাহেব বলেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দের চোখে রয়েছে mystic-এর আলো এবং তিনি সাধারণ লোকের অগোচর নানা দিব্য দর্শন করে থাকেন—একথার অর্থ বোঝা গেল; এবং দেখা গেল মতিবাবুর লেখায় ক্লার্ক সাহেবের কথার সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এ কথাটাও স্মরণ রাখা দরকার যে এই সব দর্শনাদির গুরুত্ব, যোগশাস্ত্রের মতে, অতিসামান্য। "সাধারণ লোকের নিকট সেগুলি সিদ্ধি, বিভূতি; কিন্তু যোগীর নিকট সেগুলি উপসর্গ—অর্থাৎ ঐ সব দর্শনের বেশী কিছু মূল্য নেই; তবে তা হয়ে থাকে।"

পণ্ডিচেরী প্রয়াণ

চন্দননগরে মাস দেড়েক নির্জন সাধনার পর শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী যান; এবং সেখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটান। কেন তিনি দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন ছেড়ে পণ্ডিচেরী যান, এই প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছেন তিনি পণ্ডিচেরী যাবার "আদেশ" পেয়েছিলেন। পণ্ডিচেরী পৌঁছাতে হয় তাঁকে নানা অসুবিধার ভিতর দিয়ে, নানা বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যেতে হয়। সে কথা একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করা দরকার। পুলিশ তাঁর খোঁজে

চারিদিকে তখন সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। শ্রীঅরবিন্দের মাসতুতো ভাই সুকুমার মিত্র, মতিবাবু, স্বদেশী যুগের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ও কর্মী, উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এবং শ্রীঅরবিন্দের এক ছাত্র এবং বিপ্লব-যুগের কাহিনী-লেখক নগেন্দ্রনাথ গুহ রায় অতি সংগোপনে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী যাত্রার সকল ব্যবস্থা করেন। ১৯১০ সনের ৩০শে মার্চ গভীর রাত্রে নৌকাযোগে শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর ত্যাগ করেন। ১লা এপ্রিল ভোরে কলকাতার চাঁদপাল ঘাট থেকে Dupleix নামক এক ফরাসী জাহাজ পণ্ডিচেরী ও কলম্বো হয়ে ইউরোপে যায়। শ্রীঅরবিন্দ একজন সঙ্গীসহ ছদ্মনামে ঐ জাহাজে পণ্ডিচেরী যান। শ্রীঅরবিন্দের ছদ্মনাম ছিল যতীন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁর সঙ্গী বিজয়কুমার নাগ ছিলেন আলিপুর বোমার মামালার এক মুক্তি-প্রাপ্ত যুবক ও শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত। বিজয়বাবুর ছদ্মনাম ছিল বঙ্কিমচন্দ্র বসাক। শ্রীঅরবিন্দ ম্যালেরিয়া থেকে সম্প্রতি ভুগে উঠেছেন; এবং নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে তাঁর সমুদ্রযাত্রা—টিকেট কেনবার সময় এই ছিল অজুহাত। ৪ঠা এপ্রিল যতীন্দ্রনাথ মিত্র অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সঙ্গীসহ পণ্ডীচেরী পৌছেন। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-প্রয়াণের ইতিহাস এই:

পুলিশের চোখ এড়াবার জন্যে ৩০শে মার্চ গভীর রাত্রে চন্দননগরের কয়েকজন বিশ্বস্ত যুবক নৌকায় করে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যাত্রা করে। নিরাপত্তার জন্যে স্থির ছিল ঐ যুবকেরা নৌকা বেয়ে উত্তরপাড়ার এক ঘাটে শ্রীঅরবিন্দকে পৌছে দেবে; সেখান থেকে সুকুমার বাবুর লোক অপর এক নৌকায় শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে চাঁদপাল ঘাটে জাহাজে তুলে দেবে। সুকুমারবাবু দুখানা কলম্বো সেকেণ্ড ক্লাস টিকেট শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীর জন্যে কেনেন; এবং জাহাজে একখানা কেবিনও রিজার্ভ করা হয়। ৩১শে এপ্রিল নগেন্দ্রনাথ গুহ রায়কে সুকুমারবাবু টিকেট দুখানা ও দুটো ট্রাঙ্ক ও বিছানা-পত্র দেন। এবং শ্রীঅরবিন্দের জন্যে রিজার্ভ-করা কেবিনে ট্রাঙ্ক দুটি রেখে এসে শ্রীঅরবিন্দকে আনবার জন্যে নৌকা নিয়ে উত্তরপাড়ার পূর্ব-নির্দিষ্ট ঘাটে যেতে বলেন। নগেনবাবু ট্রাঙ্ক দুটি জাহাজে রেখে যখন নৌকা নিয়ে উত্তরপাড়ায় পৌছান তখন দেরী হয়ে গেছে; এবং অমরেন্দ্রবাবুর দল কলকাতার নৌকার দেখা না পেয়ে চন্দননগরের নৌকাতেই শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। এদিকে নগেনবাবু তাড়াতাড়ি ফিরে এসে সুকুমারবাবুকে জানালেন শ্রীঅরবিন্দের দেখা তিনি পাননি। সুকুমারবাবুর নির্দেশে নগেনবাবু জাহাজ থেকে ট্রাঙ্ক ও

বিছানা নিয়ে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে অমরেন্দ্রবাবু একখানা বন্ধ গাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দকে সঞ্জীবনী আফিস থেকে কিছুদূরে রেখে সুকুমারবাবুর সঙ্গে দেখা করেন; সুকুমারবাবু তাঁদের আবার চাঁদপাল ঘাটে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেন; তাঁরা ঘাটে ফিরে যান। সেখানে অরবিন্দ বন্ধ গাড়ীতে অপেক্ষা করতে থাকেন। অল্প পরেই নগেনবাবু ট্রাঙ্ক প্রভৃতি নিয়ে সঞ্জীবনী আফিসে ফেরেন, এবং সুকুমারবাবুর মুখে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের আগমন সংবাদ পান। তিনি তখনই আবার ট্রাঙ্ক প্রভৃতি নিয়ে ছুটলেন ঘাটের উদ্দেশ্যে। জাহাজ-ঘাটায় পৌঁছে নগেনবাবু শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের দেখা পেলেন কিন্তু রাত ৯টা বেজে গেছে; এবং জাহাজের ডাক্তার যাত্রীদের পরীক্ষা করে চলে গেছেন। জাহাজের কাপ্তেনের কাছে শোনা গেল ঐ দিনই রাত্রি এগারটার পূর্বে জাহাজের ডাক্তারের নিকট থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে জাহাজে উঠতে হবে; নইলে ঐ জাহাজে যাওয়া সম্ভব হবে না; কারণ পরদিন ভোরেই জাহাজ ছেড়ে দেবে। অমরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি নিতান্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন; এত কাণ্ড করার পরও অল্পের জন্যে শ্রীঅরবিন্দের যাত্রা বুঝি বা স্থগিত রাখতে হয়। তখন জাহাজঘাটার এক কুলী জানাল জাহাজের ডাক্তারের বেয়ারার সংগে তার আলাপ আছে এবং কিছু টাকা খরচ করলে সে সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে। তবে তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। ডাক্তার শুয়ে পড়লে আর সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। সকলে ছুটলেন চৌরঙ্গির নিকটে ডাক্তারের বাসায়। ডাক্তার তখন ডিনারে বসেছেন। তাঁদের প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল।

অমরেন্দ্রবাবু প্রভৃতির উদ্বেগের সীমা নেই। কিন্তু যাঁর জন্য তাঁরা এত উদ্বিগ্ন, তিনি ধীর ও স্থির। অমরেন্দ্রবাবুরা নিজেদের মধ্যে অল্প স্বল্প কথা বলছেন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ কোন কথা না বলে চুপ করে আছেন। যিনি ঈশ্বরের হাতে আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁর কেন চিন্তা-ভাবনা হবে? কুলীটা নগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো, "ঐ বাবু (অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ) চুপ করে আছেন কেন? ভয় পেলেন নাকি?" নগেনবাবু বললেন, "না-রে অসুস্থ কিনা তাই চুপ করে আছে।" তখন তাঁদের বিস্মিত করে কুলীটি এক কাণ্ড করে বসলো। সে শ্রীঅরবিন্দের দুই বাহু ধরে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "বাবু, কিছু ভয় নাই, ডাক্তার খুব ভাল মানুষ।" শ্রীঅরবিন্দের মুখে একটু হাসি দেখা দিল কি দেখা দিল না। অমরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি বিস্মিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে

তাকালেন; একটু আমোদও যে না পেলেন তা-ও নয়। যাক আধঘণ্টা পরে যতীন্দ্রনাথ মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বসাককে ডাক্তার ডেকে পাঠালেন।

শ্রীঅরবিন্দের দু-একটি কথা শুনেই ডাক্তার বুঝলেন তিনি একজন উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি এবং তাঁর শিক্ষা হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। ডাক্তার শ্রীঅরবিন্দকে সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি তা স্বীকার করেন। ডাক্তারটি বাস্তবিকই ভালমানুষ ছিলেন। তিনি আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সংগীকে পরীক্ষা করলেন; এবং তাঁর প্রাপ্য ফিজ্ নিয়ে সার্টিফিকেট লিখে দিলেন। তখন সকলে ছুটলেন ঘাটের উদ্দেশ্যে; এবং রাত এগারটা বাজ্বার অল্প আগে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর রিজার্ভ-করা কামরায় পৌছলেন। উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ডাক নাম "মিছরি" বাবু) ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত। তিনি শ্রীঅরবিন্দের জন্যে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন। অমরেন্দ্রবাবু "নেবু মিছরির" নাম করে টাকা শ্রীঅরবিন্দকে দিলেন। তারপর বিষণ্ণ হৃদয়ে অমরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি জাহাজ থেকে নেমে এলেন। ১লা এপ্রিল ভোরে ডুপ্লে জাহাজ চাঁদপাল ঘাট ছাড়ে, ৪ঠা এপ্রিল পণ্ডিচেরী বন্দরে ঐ জাহাজ থেকে দুজন বাঙালী যাত্রী নামেন; তাঁদেরই একজন ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মিত্র বা শ্রীঅরবিন্দ।

পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে সুকুমারবাবু প্রভৃতিকে যে কত সাবধান হতে হয়েছিল সে সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শ্রীঅরবিন্দ নিরুদ্দিষ্ট। তাঁর কোন খবরই নেই। শ্রীঅরবিন্দের মাতামহী (৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পত্নী), শ্রীঅরবিন্দের মাসীমা এবং মেসোমশাই কৃষ্ণকুমার মিত্র মশাই সকলেই উদ্বিগ্ন। স্মরণ রাখতে হবে অল্প কয়েকদিন আগে কৃষ্ণকুমারবাবু মুক্তি পেয়েছেন। সুকুমার মিত্র বাড়ীতে বসেই সব ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সবই জানেন, কিন্তু পিতা, মাতা ও মাতামহীর চিন্তা দূর করবার জন্যেও তিনি ঘুণাক্ষরে কোন কথা প্রকাশ করলেন না। তারপর শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী পৌছাবার সপ্তাহকাল পরে এক ভদ্রলোক এসে গোপনে কৃষ্ণকুমার মিত্র মশাইকে জানালেন যে একটু আগে কলকাতা গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা Sir Carles Cleveland-এর নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় এক তার এসেছে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী গেছেন। এ থেকে জানা যায় কত সাবধানে সুকুমারবাবু, মতিবাবু ও অমরেন্দ্রবাবু প্রভৃতিকে কাজ করতে হয়েছিল। আর একথাও বলা দরকার যে সুকুমারবাবুর উপর তখন পুলিশের কড়া দৃষ্টি; তিনি নিজ গৃহে

এক প্রকার নজর বন্দী ছিলেন। তবু যে তিনি সফলতার সঙ্গে সকল ব্যবস্থা করে শ্রীঅরবিন্দের নিরাপদে পণ্ডীচেরী প্রয়াণ সম্ভব করেন তা-তে একাজে তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের আশ্চর্য কর্মশক্তি ও মন্ত্রগোপন রাখবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাজে তাঁদের নিজেদের বিপদও কম ছিল না; পুলিশ তাঁদের ক্রিয়া-কলাপ টের পেলে কখনও তাঁদের রেহাই দিত না। তাতে একথাটারও প্রমাণ হয়, শ্রীঅরবিন্দকে তাঁরা কী শ্রদ্ধাই করতেন! বস্তুত আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলেরই হৃদয়ের ধন ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ

পণ্ডিচেরী জীবনের পর্বসমূহ

১৯১০ সনের ৪ঠা এপ্রিল থেকে শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুদিন, ১৯৫০ সনের ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট চল্লিশ বছর কাল তিনি পণ্ডিচেরীতে ছিলেন। এই দীর্ঘ চল্লিশ বছরের জীবন প্রধানত নিভৃত সাধনার জীবন। সেই জীবনের সঠিক ইতিহাস দেওয়া একমাত্র শ্রীঅরবিন্দের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তিনি তাঁর পণ্ডিচেরীর জীবনের কোন ইতিহাস রেখে যাননি।

তবে তাঁর চিঠিপত্রাদি, তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহ, তাঁর ভক্তদের সংগে আলাপ-আলোচনার বিবরণ প্রভৃতি থেকে তাঁর পণ্ডিচেরী জীবনের ইতিহাস মোটামুটি রচনা করা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে জীবনী হিসাবে এই ইতিহাস যে অসম্পূর্ণ তা বলাই বাহুল্য।

নিভৃত সাধনাই যখন মুখ্য তখন শ্রীঅরবিন্দের জীবন স্বভাবতই ঘটনা-বহুল ছিল না। তবে তাঁর এই সময়কার বাইরের জীবনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে এই কথাটাই স্পষ্ট হয় যে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের বাইরের জীবন নিরবচ্ছিন্ন একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি—তাঁর জীবন-ধারার মধ্যে পরিবর্তন লক্ষিত হয়ে থাকে। পণ্ডিচেরী জীবনের আদিপর্বে, অর্থাৎ তাঁর পণ্ডিচেরী গমনের পর প্রথম কয়েক বছর, তাঁর সংগে মাত্র গুটি কয়েক যুবক ছিলেন। তখন তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তা গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক নয়। আশ্রম বলে কিছু তখনও গড়ে ওঠেনি। সর্ববিষয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ছোট ভাইদের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক কল্পনা করা যায়, শ্রীঅরবিন্দ ও

তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কতকটা সেইরূপ সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন; এবং দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের সঙ্গে তাঁর নানা বিষয়ে আলোচনা হতো। বাইরের লোকদের সংগে বিশেষ প্রয়োজন না হলে তিনি দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। বাংলার মতিলাল রায়মশাই প্রভৃতি কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীর সংগে তখনও তাঁর যোগ ছিল। তাঁরা শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশের প্রতীক্ষা করতেন এবং নির্দেশ পেতেনও। তাঁর প্রাক্তন সহযোগী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা মশাইরা তাঁর সংগে পত্রালাপ করেছিলেন। এই হলো পণ্ডিচেরীর প্রথম পর্বের মোটামুটি চিত্র।

তারপর এলো আর্য পত্রিকার যুগ—১৯১৪ সন থেকে ১৯২১ সন পর্যন্ত। এই সময় তিনি রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিদায় নেন। আর্যপত্রিকায় তিনি তাঁর যোগসাধনার অভিজ্ঞতা এবং দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে আহরণ করা তাঁর অপূর্ব জ্ঞানরাশি বর্ণনা করেন; এবং বাইরের সঙ্গে তাঁর যোগ, বাইরের লোকদের শিক্ষা-দান কাজ এই পত্রিকার সাহায্যেই সাধিত হয় সাত বছর ধরে। তাঁর কথা : The Arya is the Intellectual side of my work for the world. ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। ১৯২০ সনে অপর এক মহাপ্রাণের সাধনা তাঁর সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়—শ্রীঅরবিন্দ-সঙ্গের 'শ্রীমা' মাদাম মিরা রিশার স্থায়ীভাবে পণ্ডিচেরীতে বাস করতে থাকেন। ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় দেশবিদেশ থেকে পণ্ডিচেরীতে অতিথি-সমাগম হতে থাকে। পণ্ডিচেরী আশ্রমের সূচনা হয়; এবং ১৯২২ সনে মাদাম মিরা রিশার আশ্রমের কর্মভার গ্রহণ করেন।

তারপর এলো ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বর, শ্রীঅরবিন্দের জীবনের সেই মহাদিন যাকে বলা হয় শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি-দিবস। শ্রীঅরবিন্দের জীবন-ধারাও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হলো। গভীরতর সাধনার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে নিলেন। বর্তমান রীতিতে পণ্ডিচেরী আশ্রমের প্রতিষ্ঠানও হয় এ সময়ে, তবে সে আশ্রম আজকের তুলনায় ছিল অনেক ক্ষুদ্র। সেই দিন থেকে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে পণ্ডিচেরী আশ্রমের মূল দ্বিতল গৃহের তাঁর কক্ষ থেকে অরবিন্দ আর বাইরে আসতেন না। চার পাঁচজন সেবক ব্যতীত আশ্রমের অধিবাসীরা পর্যন্ত কেউ তাঁর দেখা পেতেন না। তবে

চিঠি-পত্রের সাহায্যে আশ্রমবাসীগণ তাঁদের প্রশ্ন শ্রীঅরবিন্দকে জানাতেন এবং শ্রীঅরবিন্দও সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কেবল বছরে চার দিন শ্রীঅরবিন্দ সমাগত অতিথি ও ভক্তদের দেখা দিতেন। এই হলো শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী জীবনের বাইরের দিকের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অবশ্য এই চল্লিশ বছর বাইরের জীবন-ধারার পরিবর্তনের মধ্যে যা অপরিবর্তিত ছিল, তা হলো তাঁর সাধনা—সেই সাধনার কখনও বিরাম হয়নি।

পণ্ডিচেরীর প্রথম কয়েক বছর

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-গমনের আগে থেকেই দক্ষিণ ভারতের কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী, দেশকর্মী শ্রীনিবাসাচারী প্রভৃতি কয়েকজন দেশভক্ত ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিচেরীর নিরাপদ আশ্রয়ে তাঁরা ভারতের কল্যাণ চেষ্টায় নিরত ছিলেন। তাঁরা একখানা তামিল পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-গমনের ঠিক আগে, মার্চ মাসের শেষভাগে, মতিলাল রায় মশাই শ্রীঅরবিন্দের আসন্ন পণ্ডিচেরী-গমনের সংবাদ কবি ভারতীকে দেবার জন্য সুরেশ চক্রবর্তীকে তথায় পাঠান। প্রথমে সুরেশ চক্রবর্তীর কথা কবি ভারতীর বিশ্বাস হয়নি; তাঁরা মনে করলেন এ বুঝি পুলিশের কারসাজি। শেষে তাঁদের সন্দেহ দূর হয়; এবং শঙ্কর চেট্টি নামক অতিথিবৎসল একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির গৃহে শ্রীঅরবিন্দের থাকার ব্যবস্থা হয়। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী পৌঁছলে তাঁরা তাঁকে শোভাযাত্রা সহ সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করার কথা প্রথমে ভাবেন। শেষে শ্রীঅরবিন্দ নিভৃত সাধনার জন্যে পণ্ডিচেরী যাচ্ছেন একথা শুনে তাঁরা শোভাযাত্রার সংকল্প ত্যাগ করেন। ১৯১০ সনের ৪ঠা এপ্রিল বিকাল বেলা শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গী ছদ্মনামে ডুপ্লে জাহাজ থেকে পণ্ডিচেরী বন্দরে অবতরণ করেন; কবি ভারতী ও শ্রীনিবাসাচারী প্রভৃতি ব্যক্তিরা সাদরে তাঁকে গ্রহণ করেন। তাঁরা শ্রীঅরবিন্দকে দেশের কাজে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু রাজনীতিতে আর সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে শ্রীঅরবিন্দ নারাজ হন।

শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী পৌঁছার অল্প পরে সৌরীন বসু পণ্ডিচেরী যান। এবং এক বছর পরে আজকের বিখ্যাত লেখক নলিনীকান্ত গুপ্তও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যোগ দেন। এই সৌরীন বসু ও নলিনীকান্ত গুপ্ত আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মুক্তিলাভ করেছিলেন। সুরেশ চক্রবর্তী, বিজয় নাগ, সৌরীন বসু ও নলিনীকান্ত গুপ্ত শ্রীঅরবিন্দের

পণ্ডিচেরীর এই প্রথম সঙ্গীগণ সংসার ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে তাঁদের জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

অর্থাভাব

প্রথম কয়েক মাস শ্রীঅরবিন্দ শঙ্কর চেট্টির গৃহে তাঁর অতিথিরূপে বাস করেন। নিরামিষাশী শঙ্কর চেট্টি তাঁর অতিথিদের সাদাসিধে নিরামিষ খাদ্যই দিতেন। সেকালে শ্রীঅরবিন্দের আমিষ আহারে আপত্তি ছিল না; এবং গৃহকর্তার ধর্ম-সংস্কারে আঘাত না দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীগণ তাঁর জন্যে মাঝে মাঝে ডিম রান্না করতেন। কয়েকমাস পরে শ্রীঅরবিন্দ শঙ্কর চেট্টির এক ভাড়া-বাড়িতে উঠে যান; তখন আমিষ আহার্য প্রস্তুতের পক্ষে আর কোন বাধা রইল না। কিন্তু তখন অর্থাভাব নিদারুণ; এবং পুষ্টিকর আমিষ আহার সংগ্রহ করা সহজ ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীগণ অতি সাদাসিধেভাবে থাকতেন। রান্না করবার কোন স্বতন্ত্র লোক ছিল না; শ্রীঅরবিন্দের সংগীগণই পালা করে রান্না করতেন। ঘরে আসবাব-পত্রের বাহুল্য ছিল না—একখানা খাটিয়া, একখানা টেবিল, দু'খানা চেয়ার ছিল একমাত্র আসবাব। শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত অপর সকলে মেঝেই শয়ন করতেন। চন্দননগর থেকে মতিবাবু মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য করতেন। মতিবাবুর আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না তখন; এবং শ্রীঅরবিন্দের জন্য অর্থসংগ্রহ করতে মতিবাবুকে বেশ বেগ পেতে হতো। এই সময়ে মতিবাবুকে লেখা শ্রীঅরবিন্দের একখানা পত্র তখনকার অর্থভাবের এবং অর্থাভাবের মধ্যেও শ্রীঅরবিন্দের রহস্য প্রিয়তার ও ঈশ্বরে নির্ভরের পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থাভাব প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: No doubt God will provide; but He has contracted a bad habit of waiting till the last moment. I only hope He does not wish us to learn how to live on a minus quantity.—Kali. স্মরণ রাখতে হবে মতিবাবুকে লেখা গোপনীয় পত্রে শ্রীঅরবিন্দ Kali এই ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে উঠে কেন শ্রীঅরবিন্দ Kali বলে নিজের নাম স্বাক্ষর করতেন। তিনি The Ideal of the Karmayogin পুস্তকের ৭৪ পৃষ্ঠায় যা লিখেছেন তা থেকে বোধ হয় এই প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যায়। তিনি সেখানে লিখেছেন: "Those who are commissioned to bring about mighty changes are full of the force of Kali.

Kali has entered into them." তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতায় এবং স্ত্রীর নিকট পত্রে তাঁর এই বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় যে তিনি নিজেকে (ভারতের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য) ভগবৎ শক্তির যন্ত্র মনে করতেন। সে কথা যাক্। এই সময়ের অর্থাভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল। শ্রীঅরবিন্দ মতিবাবুকে এক পত্রে লেখেন তাঁর হাতে মাত্র পাঁচসিকা আছে; এবং যে প্রকারেই হউক মতিবাবুকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই এ কথা শুনে বলেন, শ্রীঅরবিন্দ যদি তাঁর সাগর-সংগীত নামক বাংলা কবিতা পুস্তকখানার ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করেন তবে তিনি এক হাজার টাকা দেবেন। শ্রীঅরবিন্দ সুন্দর ছন্দে সাগর-সংগীতের ইংরেজী পদ্য অনুবাদ করেন এবং দাশ মশাইও প্রতিশ্রুত হাজার টাকা দেন।

শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ব্রিটিশ পুলিশের মনোভাব

পণ্ডিচেরী যাবার পরও কয়েক বছর শ্রীঅরবিন্দের প্রতি ব্রিটিশ পুলিশের বিষদৃষ্টি ছিল। তখনও তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক নম্বর বা প্রধান শত্রু বলে গণ্য ছিলেন। সভ্যজগতের রীতি বহিরাগত রাজনৈতিক কর্মীদের আশ্রয় দেওয়া। নিজ দেশে রাজরোষে জীবন বিপন্ন হলে বিদেশের বহু দেশ-ভক্ত ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করতেন; এবং যতদিন ইংল্যাণ্ডে তাঁরা বে-আইনি সকল প্রকার কাজ থেকে বিরত থাকতেন ততদিন ইংল্যাণ্ডে তাঁরা নিরাপদে বাস করতে পারতেন। ইতালীর মুক্তিমন্ত্রের ঋষি ম্যাট্‌সিনি ইংল্যাণ্ডে তাঁর শেষ জীবন কাটান। ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিরাপদ আশ্রয় থেকে ছলে বলে যে-কোন প্রকারেই হউক শ্রীঅরবিন্দকে ব্রিটিশ ভারতের এলাকায় নিজের কবলে পাবার জন্যে ব্রিটিশ পুলিশ চেষ্টা করেছিল। একবার নন্দগোপাল চেট্টি নামক পণ্ডিচেরীর এক দুষ্ট-প্রকৃতির ধনী লোকের সঙ্গে নাকি ব্রিটিশ পুলিশ শ্রীঅরবিন্দকে ব্রিটিশ এলাকায় আনবার জন্যে ষড়যন্ত্র করে। শ্রীঅরবিন্দকে বলপূর্বক পণ্ডিচেরীর বাইরে ভারতীয় এলাকায় আনবার এক পরিকল্পনা করা হয়। একথা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীগণ টের পান; এবং এ কাজে প্রাণপণে বাধা দেবার জন্যে তাঁরা অস্ত্র হিসাবে কিছু লাঠি, এসিডের বোতল প্রভৃতি সংগ্রহ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল বিপদ কেটে গেল। পণ্ডিচেরীতে এক "ইলেকসনের" ব্যাপারে নন্দগোপাল চেট্টি মামলায় জড়িত হয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে সমনজারি হয়, এবং সে পণ্ডিচেরী থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়।

ফরাসী গভর্নমেণ্টের সম্মতিক্রমে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট শ্রীঅরবিন্দের উপর কড়া নজর রাখবার জন্যে শ্রীঅরবিন্দের গৃহের সম্মুখে এক পুলিশ ঘাঁটি স্থাপন করেছিল; এবং শ্রীঅরবিন্দের গৃহে যারা যেতো, তাদের উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের নজর থাকতো। একবার ফরাসী পুলিশের নিকট এক গোয়েন্দা এই অভিযোগ করে ইউরোপ-প্রবাসী শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা, মাদাম কামা প্রভৃতি ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ; এবং তাঁর বাসগৃহ তল্লাসী করলে বহু আপত্তিজনক লেখা পাওয়া যাবে। ফরাসী পুলিশের বড় কর্তা শ্রীঅরবিন্দের গৃহ তল্লাসী করেন। তল্লাসী করে তিনি পেলেন কোন আপত্তিজনক লেখা নয়, কিন্তু গ্রীক ও লাতিন ভাষায় লেখা শ্রীঅরবিন্দের কতকগুলি পাণ্ডুলিপি। ফরাসী কর্মচারী ইহা দেখে খুবই বিস্মিত হন। শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জন্মে, এবং তিনি শ্রীঅরবিন্দের একজন বিশেষ গুণমুগ্ধ ভক্ত হন।

শ্রীঅরবিন্দের সকল কাজের উপর নজর রাখবার জন্যে এই সময় শ্রীঅরবিন্দের গৃহে এক ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রবেশ লাভ করে। এই গোয়েন্দা ছিল বীরেন নামক এক বাঙালী যুবক। শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরীর সঙ্গীদের কারো রুগ্ন বন্ধু স্বাস্থ্য লাভের আশায় এই সময় কিছুকাল পণ্ডিচেরীতে থাকেন, এবং তার ভৃত্য বা সেবক হিসাবে এই গোয়েন্দা শ্রীঅরবিন্দের গৃহে ঠাঁই পায়। কয়েক মাস পরে সে যে ইংরেজ গভর্নমেণ্টের গোয়েন্দা এ কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যে ভাবে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়ে তা এক হাস্যকর ব্যাপার। কয়েক মাস দেশ থেকে দূরে থেকে লোকটা হাঁপিয়ে উঠেছিল এবং তার পীড়াপীড়িতে ইংরেজ পুলিশ তার বদল অপর একজন গোয়েন্দা পাঠাচ্ছে বলে তাকে জানায়। কিন্তু সমস্যা হলো, কী করে এই নতুন গোয়েন্দা এসে বীরেনকে চিনবে—শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীগণ ও বীরেনের চালচলনের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না—পোষাক, খাওয়া-দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা সকলেই একই প্রকারের সাদাসিধে। বীরেন ভিন্ন অন্য লোকের নিকট তো নতুন গোয়েন্দার আত্মপরিচয় দেওয়া চলবে না। তাই বীরেন ইংরেজ পুলিশকে জানিয়েছিল নতুন গোয়েন্দা তার মুণ্ডিত মস্তক দেখে চিনতে পারবে। তাই সে তার মাথা নেড়া করে। সুরেশ চক্রবর্তীর কী খেয়াল হয়, তিনিও এই সময় মাথা নেড়া করেন। বীরেন মনে করলো সে যে গোয়েন্দা তার এই পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সে তখন আপনা হতেই কবুল করে যে সে একজন গোয়েন্দা; তবে সে

শ্রীঅরবিন্দ বা তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট দেয়নি। তাকে চলে যেতে দেওয়া হয়। মোট কথা পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন, গভর্নমেণ্টের মনে অনেকদিন পর্যন্ত এই ধারণা ছিল।

শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী গেছেন—এ সংবাদ যখন সঠিক জানা গেল, তখন শ্রীঅরবিন্দের প্রাক্তন সহযোগী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মশাই ও মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মশাই শ্রীঅরবিন্দকে লোক মারফৎ এক পত্র পাঠান এবং জাতীয়তাবাদীদের এখন করণীয় কী সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ প্রার্থনা করেন। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের যা লেখেন তার সারমর্ম হলো এই :—ভগবানই ভারতের স্বাধীনতা আনবেন এবং ভারত যথাসময়ে স্বাধীনতা লাভ করবে। এখন আমাদের কর্তব্য যোগস্থ হয়ে কর্ম করা। এবং ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করাই যোগ। শ্রীঅরবিন্দের এভাবে হঠাৎ চলে যাবার কারণ কী? এ সম্বন্ধে কারো কারো এই মত ছিল যে শ্রীঅরবিন্দ দেশের পরিস্থিতিতে নিরাশ হয়ে রাজনীতি বর্জন করেন। আবার কেউ কেউ মনে করছেন যে শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে স্বাধীনতা-আন্দোলন ত্যাগ করা কর্তব্যের অবহেলার সামিল—ইংরাজীতে যাকে বলা হয় escapism বা পলায়নের মনোবৃত্তি অর্থাৎ স্বেচ্ছায় দুঃখ লাঘবের আশায় দুঃসাধ্য কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়া, শ্রীঅরবিন্দ সেই অপরাধে অপরাধী। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিজের মত উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন :

"I did not leave politics because I felt I could do nothing more there; such an idea was very far from me. I came away because I did not want anything to interfere with my *yoga* and because I got a very distinct '*adesha*' in the matter. I have cut connection entirely with politics; but before I did so I know from within that the work I had begun there was destined to be carried forward on lines I had foreseen by others, and that the ultimate triumph of the movement I had initiated was sure without my personal action or presence. There was not the least motive of despair or sense of futility behind my withdrawal."

ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সফল যে হবেই একথা তিনি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মশাইদেরও লিখেছিলেন; এবং সেজন্যে তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টারও আর প্রয়োজন যে নেই এ বিষয়েও তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তিনি তাঁর সম্মুখে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত দেখতে পেয়েছিলেন; এবং সেজন্য তাঁকে যোগে গভীরতরভাবে অনন্যকর্মা হয়ে প্রবৃত্ত হতে হবে, এই ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। এই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র কী তা আমরা দেখবো।

রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ

পণ্ডিচেরী গমনের পরও তিন-চার বছর মতিবাবু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), রাসবিহারী বসু প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতির ক্ষেত্রে যোগ ছিল; তাঁদের মধ্যে অল্প-স্বল্প পত্রালাপ হতো। কিন্তু ১৯১৪ সনে শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে দাঁড়ালেন। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। ভারতের বিপ্লবীরা বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ইংরেজের শত্রু জার্মানির সাহায্যে ভারতে বিপ্লব ঘটাবার আয়োজন করেন; রাউলাট কমিটির রিপোর্টে তা বর্ণিত আছে এবং ইতিহাসের পাঠকের নিকট তা সুবিদিত। রাসবিহারী বসু, বাঘাযতীন প্রভৃতি ছিলেন এই বিপ্লবের নেতা। রাসবিহারী বসুর বন্ধু মতিবাবু বলেছেন যে রাসবিহারী ছিলেন বিরাট প্রতিভার অধিকারী; ক্ষুদ্র লক্ষ্য নিয়ে থাকা ছিল তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। রাসবিহারী তাঁর বন্ধু মতিবাবুকে বলেছিলেন "খুন, ডাকাতি করিয়া দিন কাটাইলে আমরা সেই খুনের দল হইয়া পড়িব। এখন দেশ-ব্যাপী বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া ভারত হইতে ইংরেজকে বিতাড়িত করিতে হইবে। তুমি শীঘ্র শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ লইয়া আইস।" (জীবন-সঙ্গিনী)। তখন মতিবাবুর উপর ইংরেজ পুলিশের কড়া নজর; চন্দন-নগরের বাইরে যাওয়াও তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। তিনি সাহেবের পোষাকে ফিরিঙ্গ সেজে ছদ্মবেশে পণ্ডিচেরী যান এবং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কয়েকদিন থাকেন। দেশে যখন ইংরেজ বিতাড়নের জন্যে বিপ্লবের আয়োজন ঠিক সেই সময়ই শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন—তিনি বললেন "Mati, halt", 'মতি, থামো'। রাসবিহারী প্রভৃতি বিপ্লবীগণ শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতির সংস্রব ত্যাগের সংবাদে স্তম্ভিত ও নিরাশ হলেন; কিন্তু বিপ্লবের পথ ত্যাগ করলেন না। বিপ্লবের ব্যর্থ চেষ্টা ও বিপ্লবের আগুনে বহু মহাপ্রাণ যুবকের আত্মাহুতি ভারতের ইতিহাসে দুঃখজনক হলেও এক গৌরবময় অধ্যায়।

আর রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব-ত্যাগ শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই নতুন অধ্যায়ের মর্ম কী?

তন্ত্র থেকে বেদান্তে, ভারতের স্বাধীনতা থেকে সর্বমানবের অগ্রগতিতে

প্রসিদ্ধ লেখক ও সমালোচক গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মশাই তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ" পুস্তকে লিখেছেন, "১৯১৪ সনে আর্যপত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তন্ত্র হইতে বেদান্তে ফিরিয়া যান।" এক সময় বরোদায় থাকাকালে শ্রীঅরবিন্দ নিষ্ঠার সংগে তান্ত্রিক সাধনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। বরোদায় তাঁর গৃহে নাকি দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বগলার মূর্তি-পুজা হোত, নিত্য প্রাতঃস্নান করে চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি তার প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে মতিবাবু তাঁর "জীবন-সঙ্গিনী" পুস্তকে লিখেছেন, "১৯১০ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যুগগুরুর (অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের) সঙ্কেতেই তন্ত্রসাধনার যে ভীমঅগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা যখন সারা ভারতে প্রলয়-সৃষ্টির উপক্রম করিত, তখন শ্রীঅরবিন্দ বলিলেন 'থামো'। তন্ত্রসাধনার প্রয়োজন ততক্ষণ, যতক্ষণ না উহা বেদান্তের প্রচারক্ষেত্র তৈয়ার করে।" তন্ত্র ও বেদান্তের লক্ষ্য একই, পথ অবশ্য ভিন্ন। তন্ত্র থেকে শ্রীঅরবিন্দ বেদান্তে গেলেন। কথাটির অর্থ যাই হউক, একথা সত্য যে ১৯১৪ সনের পরে শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্জগতে এক গভীর পরিবর্তন ঘটে। তবে একথা মনে করা ঠিক হবে না যে তন্ত্রমত ভ্রান্ত মনে করে শ্রীঅরবিন্দ বেদান্ত মত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর Essays on the Gita গ্রন্থে (৮ম ও ৯ম পৃষ্ঠায়) ও নানাস্থানে তন্ত্র ও বেদান্ত উভয় মতের মূল্যই স্বীকার করেছেন। তবে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তিনিও মনে করতেন জগতের ভাবী কালের ধর্ম হবে বেদান্ত। ইতিপূর্বে আলিপুর বোমার মামলায় দাশ মশাইও একথা বলেছিলেন।

আমরা বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা শ্রীঅরবিন্দের চিঠিতে পাই তিনি রাজনীতি ত্যাগ করেছেন। যে-রাজনীতি তিনি এতকাল করেছিলেন তা ভারতের জিনিষ নয়, বিলাতের আমদানি। দেশকে জাগাবার জন্যে তারও প্রয়োজন ছিল, একথা স্বীকার করেও তিনি রাজনীতির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তবে কি তিনি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্যে লালায়িত হয়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান? এরূপ মনে করা নিতান্তই ভুল। যে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বান তার জীবনে এসেছিল, তা হলো ভারতের স্বাধীনতার অপেক্ষা এক মহত্তর লক্ষ্যের আহ্বান, এবং এই মহত্তর লক্ষ্যের হলো,

কেবল ভারতবাসীর নয়, সমগ্র মানবজাতির অগ্রগতি। সেই অগ্রগতির পরিসমাপ্তি হবে পৃথিবীতে মানবের দিব্যজীবন লাভে; এবং তাঁর পণ্ডিচেরীর সাধনার লক্ষ্যই হলো মানবের দিব্যজীবন লাভে সহায়তা করা। শ্রীঅরবিন্দ দিব্যজীবন বলতে কী বুঝতেন তার আলোচনা শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন প্রসঙ্গে যথাস্থানে হবে। এখন আমরা তাঁর পণ্ডিচেরীর জীবনের বাইরের ঘটনাগুলিতে ফিরে যাই।

পল রিশার ও মাদাম মিরা রিশারের সঙ্গে যোগাযোগ

১৯১১ সনে শ্রীঅরবিন্দ সংঘের পূজনীয়া শ্রীমা বা মাদাম মিরা রিশারের স্বামী ম সিয়ে পল রিশার পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। পণ্ডিচেরী থেকে ফরাসী-পার্লামেণ্ট প্রতিনিধি নির্বাচিত হবার জন্যে তিনি পণ্ডিচেরীতে এসেছিলেন। মাত্র দু'দিন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে তাঁর আলাপ হয়, এবং তিনি শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ মুগ্ধ হন কয়েক বছর পরে ম ঁসিয়ে রিশার তাঁর পুস্তক Dawn Over Asia পুস্তকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে শ্রীঅরবিন্দই হবেন এশিয়ার নবজাগরণের নেতা। শ্রীমার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ১৯১৪ সনের আগে দেখা হয়নি; কিন্তু তার আগেই স্বামীর মারফৎ শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দকে দু'একটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তারপর ১৯১৪ সনে ম ঁসিয়ে রিশার কিছুকাল সস্ত্রীক পণ্ডিচেরীতে বাস করেন। ঐ বছর মার্চ মাসে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে শ্রীমার প্রথম পণ্ডিচেরীতে দেখা হয়।

মাদাম মিরা রিশারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই, ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি ধর্মজীবন লাভের জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হন। শ্রীঅরবিন্দকে দেখেই তিনি বুঝলেন এতদিনে তাঁর সাধনপথের পথ-প্রদর্শক লাভ হলো। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরই শ্রীমা তাঁর ডায়েরীতে লেখেন: "একদিন জগতে অন্ধকারের স্থানে আলো-দেখা দেবে এবং পৃথিবীতে ভগবানের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কাল যাঁর সঙ্গে দেখা হলো তাঁর উপস্থিতিই ইহার প্রমাণ।"

কয়েক মাস ধরে ম ঁসিয়ে পল রিশার ও মাদাম রিশার পণ্ডিচেরীতে সে যাত্রায় বাস করেছিলেন। প্রতিদিন বৈকালে নারকেলের মিষ্টান্ন তৈয়ার করে মাদাম রিশার শ্রীঅরবিন্দের গৃহে যেতেন। ম ঁসিয়ে রিশারও উপস্থিত থাকতেন। প্রতি রবিবারে শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর সঙ্গীদের রিশারদের গৃহে নিমন্ত্রণ

থাকতো। এইরূপে শ্রীঅরবিন্দ ও রিশারদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটবার পর ফরাসী প্রজা বলে মঁসিয়ে রিশারকে ফ্রান্স থেকে যুদ্ধে যোগদানের জন্যে আহ্বান করা হয়। তদনুসারে মঁসিয়ে রিশারকে ১৯১৫ সনে ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়। মাদাম্ রিশারও স্বামীর অনুগমন করেন। যুদ্ধাবসানের পর ১৯২০ সনে তাঁরা পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন।

আর্য পত্রিকা

১৯১৪ সনে পণ্ডিচেরীতে থাকার সময় মঁসিয়ে ও মাদাম রিশার একখানা দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব শ্রীঅরবিন্দের নিকট করেন। পত্রিকার প্রাথমিক ব্যয়ভার বহন করতে তাঁরা স্বীকার করেন। প্রবন্ধাদি লিখে পত্রিকা সম্পাদনায় সাহায্য করতেও তাঁরা রাজী হন। এরূপ একখানা পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা শ্রীঅরবিন্দ সর্বমানবের জন্যে যা করতে চান তার সাহায্য হবে। একথা ভেবে শ্রীঅরবিন্দও রিশারদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তদনুসারে ১৯১৪ সনের ১লা জুন তারিখে স্থির হয়, ঐ সনের ১৫ই আগষ্ট তারিখে, অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে, আর্য পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বের হবে। প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের নামের স্থলে তিনটি নাম ছিল—অরবিন্দ ঘোষ, পল রিশার ও মিরা রিশার। বোঝা গেল শ্রীঅরবিন্দ তখনও শ্রীঅরবিন্দ নাম গ্রহণ করেননি এবং তখনও ঐ নামেই সর্বত্র পরিচিত হননি। আর্য পত্রিকার অর্থ-সংকট কখনই ঘটেনি; পত্রিকার আয় থেকেই পত্রিকার ব্যয় সংকুলান হতো। পত্রিকাটি যে প্রথম থেকেই সমাদর পেয়েছিল, এ হলো তারই প্রমাণ।

পরিচালনায় অন্য রকমের সংকট দেখা দিল। ১৯১৫ সনের প্রথম দিকে ফেব্রুয়ারি মাসে রিশারদের ফ্রান্সে ফিরে যেতে হয়। তখন পত্রিকা সম্পাদনের সকল ভার পড়লো একক শ্রীঅরবিন্দের উপর। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ একটু পরিহাসের সুরে বলেছেন যে তিনি কোন দিন বিশেষভাবে দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা করেননি; কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও রাজনীতিই ছিল এতকাল তাঁর আলোচ্য। তাই নিজেকে দার্শনিক বলে পরিচয় দেবার তাঁর কোন অধিকার নেই। অথচ রিশাররা ফ্রান্সে চলে গেলে তাঁকেই প্রতি মাসে একক ৬৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী দার্শনিক-প্রবন্ধ প্রকাশ করতে হয়। তবে তিনি এ কথাও বলেন যে, একজন যোগীর পক্ষে দার্শনিক প্রবন্ধ লেখা অনধিকার-চর্চা নয়; কারণ যোগসাধনার ফলে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় ভাষায় তা প্রকাশ করলেই দর্শন হয়ে ওঠে। তাই তো শ্রীঅরবিন্দ বলতেন আর্য পত্রিকা প্রকাশ ছিল

"the intellctual side of his work for the world." তাঁর যোগের লক্ষ্য ছিল মানব-কল্যাণ এবং আর্য পত্রিকাও তাঁর এই লক্ষ্যসাধনে সহায়ক হয়েছিল।

আর্য পত্রিকার লক্ষ্য সমূহ

যে সকল লক্ষ্য নিয়ে আর্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তা এই :

প্রথমত বিশ্বরহস্যের ও জগতের চরম তত্ত্বসমূহের দার্শনিক আলোচনা।

দ্বিতীয়ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ধর্ম-মতের তুলনামূলক আলোচনা ও তাদের ঐক্যসূত্র আবিষ্কার, মানবের বিভিন্ন জ্ঞানধারার আলোচনা ও একীকরণ। এই আলোচনার পদ্ধতি হবে কেবল বিচার-বুদ্ধি নয়, কিংবা কেবল অন্তরের অনুভূতিও নয়, কিন্তু বিচার-বুদ্ধি ও অনুভূতির সম্মিলনমূলক।

তৃতীয়ত মানবজাতির একীকরণ। এই একীকরণ যে কেবল বইয়ের স্বার্থ-বুদ্ধির দ্বারা সম্ভব নয় কিন্তু অন্তরে সর্বমানবের ঐক্যবোধের দ্বারাই সম্ভব, যুক্তির সাহায্যে ঐ সত্য প্রতিপালন।

চতুর্থত কেবল দৈহিক, জৈবিক ও আর্থিক প্রয়োজন সিদ্ধির দ্বারা নয়, এমন কি কেবল বুদ্ধি-বৃত্তির চর্চা ও সৌন্দর্যবোধের চর্চার দ্বারাও নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্বারাই যে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ হবে, এবং মানুষ বর্তমান জীবনের ঊর্ধ্বে দিব্যজীবনের পথে অগ্রসর হতে পারবে এই সত্যের প্রতিপাদন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে একথা শ্রীঅরবিন্দের মুখেই শোভা পায়। যিনি নিজে জ্ঞানীর শিরোমণি, অর্থলোভ যিনি সম্পূর্ণ জয় করেছিলেন, যিনি কবি ও আর্টের সমজদার ছিলেন, তাঁরই পক্ষে একথা বলার অধিকার। অন্য কেউ একথা বললে তা নিরর্থক বাচালতা বলে গণ্য হতো। লক্ষণীয় যে আর্য পত্রিকার উল্লিখিত লক্ষ্যের মধ্যে আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-পত্রে উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল বিশ্বভারতীকে একটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র রূপে গড়ে তোলা। বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির একীকরণের উপরই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ঝোঁক দিয়েছিলেন, আর শ্রীঅরবিন্দের ঝোঁক ছিল আধ্যাত্মিকতার উপর। যথাস্থানে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আদর্শ প্রসঙ্গে এ কথার পুনরায় উল্লেখ করা হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম ও জাতীয়তা পুস্তক থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিও স্মরণীয় : "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই যুগের ধর্ম। কিন্তু এই একীকরণে পাশ্চাত্যকে প্রতিষ্ঠা বা মুখ্য অঙ্গ যদি করি, আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব। প্রাচ্যই প্রতিষ্ঠা, প্রাচ্যই মুখ্য অঙ্গ।"

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাপত্রেও বলা হয়েছে যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—বিদ্যার হোল এই দুই ধারা ; বিশ্বভারতীতে প্রাচ্যের দিক থেকে পাশ্চাত্যকে বুঝতে সচেষ্ট হবে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রীঅরবিন্দের চিত্ত সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেনি। ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্রই তাঁকে সেই তৃপ্তি দিয়েছিল এবং ভারতের বেদান্ত, গীতা ও তন্ত্রশাস্ত্রাদির মুল্য, এই দিক থেকে, তাঁর নিকট বেশী ছিল।

আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের বিষয়-বস্তু

আর্য পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরে এই প্রবন্ধগুলিই একটু অদল-বদল করে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এইরূপেই শ্রীঅরবিন্দ The Life Divine, Essays on the Gita, Synthesis of Yoga, The Secret of the Veda, The Ideal of Human Unity, A Defence of Indian Culture, The Psychology of Social Development প্রভৃতি প্রথমে প্রবন্ধাকারে আর্য পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আর্য পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা তো থাকতোই, যার ফলে The Life Divine-এর ন্যায় গ্রন্থ আমরা পেয়েছি। তা ছাড়া, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়েরও আলোচনা হতো। সেই সাংস্কৃতিক আলোচনারই ফল The Ideal of Human Unity, A Defence of Indian Culture প্রভৃতি পুস্তক। The Life Divine-এর ন্যায় গ্রন্থ কি কেবল প্রতিভা-প্রসূত ? যত বড় প্রতিভাবান লেখকই হউক না কেন, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত এইরূপ একখানা গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। সুপ্রসিদ্ধ মনীষী Aldus Huxley "The Life Divine" সম্বন্ধে যা বলেছেন তা স্মরণীয়। তিনি বলেছেন : "I consider "The Life Divine" a book not merely of the highest importance as regards its content, but remarkably fine as a piece of philosophic and religious Literature." উদ্ধৃত উক্তি থেকে একথাটাও জানা গেল যে The Life Divine গ্রন্থখানাকে (দার্শনিক) সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করলেও তা একখানা অসাধারণ সুন্দর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে। বিষয়বস্তুর দিক থেকে পুস্তকখানার গুরুত্বও খুব বেশী। আর্য পত্রিকার মাধ্যমেই শ্রীঅরবিন্দ তার মানব-কল্যাণের বাণী প্রচার করেন। বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ভারতবাসী পেয়েছিল জাতীয়তার বাণী ; আর আর্য পত্রিকায় সর্বমানব পেয়েছে মানব-জীবনের লক্ষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অমর বাণী।

১৯১৪ সন থেকে ১৯২১ সন পর্যন্ত সাড়ে ছয় বছর নিয়মিতভাবে আর্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তারপর শ্রীঅরবিন্দ আর্যপত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করেন।

মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ

১৯১৪ সনে তিনি রাজনীতি ছাড়েন, কিন্তু রাজনীতি ও দেশের লোক তাঁকে সম্পূর্ণ রেহাই দেয়নি; এবং দু-একবার তাঁকে রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে লেখনী ধারণ করতে হয়। আর দেশের রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেও তিনি যে দেশের মঙ্গলা-মঙ্গলের কথা নিয়ে মাথা ঘামাতেন, তারও একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে চিঠিখানা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ও মিত্রশক্তি সমূহ জোর গলায় Self determination বা প্রত্যেক দেশের লোকদের নিজদেশের শাসন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বলে। যুদ্ধ-শেষে ভারতেও Home-rule বা স্বায়ত্ত-শাসন আন্দোলন দেখা দেয়। মিসেস্ এনি বেশান্ত ও লোকমান্য তিলক এ আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। ইংরেজ গভর্নমেণ্টও ভারতবাসীকে কিছু দেওয়া প্রয়োজন মনে ক'রে Mont-ford শাসন প্রস্তাব প্রকাশ করে। স্মরণ রাখতে হবে Mont-ford নামটি ভারতসচিব Montague সাহেবের নামের আদি অংশ Mont আর ভারতের বড়লাট Chelmsford সাহেবের নামের অন্তভাগ ford নিয়ে গঠিত। এ শাসন-প্রস্তাবে দেশের শাসন-বিভাগের কয়েকটি অপ্রধান অংশের ভার ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে দেবার কথা হয়। এই শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশ ও দেশীয় এই দুই বিভাগ থাকবে বলে এই সংস্কার Dyarchy নামেও পরিচিত।

মিসেস এনি বেশান্তের একান্ত অনুরোধে শ্রীঅরবিন্দ মিসেস বেশান্তের পত্রিকা New India-তে এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাব সম্বন্ধে এক পত্র লেখেন। পত্রখানা An Indian Nationalist-এর ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। দেশের লোক প্রসন্নচিত্তে এই শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি; এবং অল্পদিন পরে এই ব্যবস্থা অচল হয়। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর পত্রে প্রস্তাবটির নিন্দা করেন এবং উহাকে একটি Chinese Puzzle বা প্রহেলিকা বলে বর্ণনা করেন। এ হলো ১৯১৯ সনের কথা।

রাজনীতিতে পুনরায় যোগ দেবার আহ্বান

১৯২০ সনে শ্রীঅরবিন্দকে আবার রাজনীতিতে আকৃষ্ট করবার জন্যে তিলকের পরামর্শে Joseph Baptista নামক বোম্বাই অঞ্চলের এক রাজনৈতিক নেতা একখানা নতুন রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব করেন এবং শ্রীঅরবিন্দকে ঐ পত্রিকার সম্পাদক হতে অনুরোধ করেন। শ্রীঅরবিন্দ এ অনুরোধ রক্ষা করতে পারলেন না; এবং কেন পারলেন না সে সম্বন্ধে তিনি যা বলেন তাও উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ বলেন তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন; কিন্তু তাঁর পক্ষে এখন ব্রিটিশ ভারতে ফেরা সম্ভব নয়। ফিরে গেলে সম্ভবত তাঁকে "রাজ-অতিথি" হয়ে জেলে থাকতে হবে। তাঁর হাতে এখন এত কাজ যে তিনি তা পণ্ড করতে রাজী নন। তিনি এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং বিশেষ এক ধরণের সমস্যার মধ্যে পণ্ডিচেরীতে এসেছেন। যতদিন তাঁর সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হবে ততদিন তাঁর পক্ষে অন্য কাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়।

তারপর তিনি ঐ পত্রে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটু আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে ১৯০৩ সন থেকে ১৯১০ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে তাঁর কাজ ছিল দেশবাসীর মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা। তাঁর বিশ্বাস দেশবাসীর মনে সে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, এবং দেশ স্বাধীনতার পথে এগোচ্ছে। স্বাধীনতা-লাভের পর দেশকে কীভাবে এগোতে হবে, তা বিচার্য। সেই প্রশ্ন নিয়ে তিনিও ভাবছেন। দেশের সম্বন্ধে সাম্যপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এ কথা ঠিক; এবং যে ভাবেই তা করা হউক তা যে দেশের চিরদিনের সংস্কার ও ঐতিহ্যের সংগে খাপ খাওয়াতে হবে, সে কথাও ঠিক। কিন্তু এই সাম্যের স্বরূপ কী হবে, সে সম্বন্ধে তাঁর ধারণা এখনও স্পষ্ট হয়নি। তাই দেশের সম্মুখে নতুন অবস্থার উপযোগী কোন আদর্শ স্থাপন করতে তিনি অক্ষম। তাই তাঁকে ধন্যবাদের সঙ্গে Mr. Baptista-র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হয়। রাজনীতিতে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আরো বহুবার চেষ্টা হয়। এই উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী নাকি তাঁর পুত্র দেবদাস গান্ধীকে শ্রীঅরবিন্দের নিকট একবার পাঠিয়েছিলেন। ১৯২২ সনে চিত্তরঞ্জন দাশ মশাইও তাঁকে আবার রাজনৈতিক কর্মে যোগ দিতে আহ্বান করেন। আমরা দেখবো ১৯২৮ সনে যখন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সংগে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয় তখন তিনিও শ্রীঅরবিন্দকে বের হয়ে এসে আবার দেশকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে

অনুরোধ করেন। তাঁকে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার কথাও হয়। কিন্তু তিনি রাজনীতিতে পুনরায় যোগ দিতে রাজী হননি।

লক্ষ্ণৌ-চুক্তি প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ

রাজনীতি ছাড়লেও যে তিনি দেশের খবর রাখতেন এবং দেশের কল্যাণ চিন্তা করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নলিখিত কাহিনী থেকে। কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন স্বদেশীযুগের কর্মী বারীন্দ্রকুমার ও শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সহযোগী অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য। শ্রীঅবিনাশবাবু ছিলেন আলিপুর মামলার অন্যতম আসামী; এবং বিচারে তাঁর প্রতি যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ডের আদেশ হয়। প্রথম যুদ্ধের অবসানে, মিত্রপক্ষের জয়ের জন্যে আনন্দোৎসব উপলক্ষে অনেক রাজবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। অবিনাশবাবু মুক্তিলাভের পর পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সংগে কিছুকাল থাকেন। এখন দেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে, কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের মধ্যে বিরোধ। সেই বিরোধ মেটাবার জন্যে লক্ষ্ণৌতে দুই দলের মধ্যে একটা চুক্তি (Lucknow Pact) হয়। এ কাজে চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই এক প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন "চিত্ত কী ভুল করলেন! এই চুক্তি করার অর্থ হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি বলে স্বীকার করা। এর বিষময় ফল তোমাদের ভুগতে হবে।" অবিনাশবাবু বললেন, "আপনি যোগ-তপ করছেন; সাধু হয়ে গেছেন। আপনার এসব ভাববার কী দরকার?" শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "আমি নিজের মুক্তির জন্যে জপতপ করছি না। সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে আমার সাধনা।" অবিনাশবাবু বললেন, "তা হলে হিন্দু মুসলমান বলে ভেদ করা আপনার উচিত না।" শ্রীঅরবিন্দ বললেন, "আমি তো তাই বলছি। ভারতে হিন্দু মুসলমান বলে কিছু থাকবে না; সবাই এক, সবাই ভারতীয়।" লক্ষ্ণৌ চুক্তির ফল বিষময়ই হয়েছিল। এখানে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির ও ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দেখবো ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষায়ই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে ১৯৪২ সনে কংগ্রেস নেতাদের নিকট স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি এক তার-বার্তা প্রেরণ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁকে যে বিবৃতি দিতে হয়েছিল তাও একটি প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক বিবৃতি। বস্তুত পণ্ডিচেরীতে তিনি গভীর সাধনায় নিমগ্ন থাকলেও প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্যে রেডিয়ো ও খবরের কাগজের সাহায্যে দুনিয়ার বিশেষ ঘটনাগুলির খবর

তিনি রাখতেন ; অবশ্য ঘটনাগুলি কী তাই তিনি জানতে চাইতেন ; সে সম্বন্ধে খবরের কাগজগুলির বা ব্যক্তিবিশেষের মতামত জানবার জন্যে তাঁর কোন আগ্রহ বা সময় ছিল না। দেশের গুরুত্বপুর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার খবর সব তিনি রাখতেন ; কিন্তু রাজনীতির সংগে তিনি আর নিজেকে জড়াতেন না।

১৯২০ সন

এইবার শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী-বাসের কথায় ফিরে আসা যাক। পণ্ডিচেরী আশ্রমের ইতিহাসে এই ১৯২০ সনটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। ১৯২০ সনে মাদাম মিরা রিশার (শ্রীমা) ফ্রান্স থেকে পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। পল রিশার কিছুকাল পরে ফ্রান্সে ফিরে যান। এই সময় মতিলাল রায় মশাই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে মতভেদের দরুণ স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে থাকেন। তিনি লিখেছেন যে প্রথম সাক্ষাতের দিনে যে মনোভাব নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন বিদায়ের দিনেও শ্রীঅরবিন্দের সেই মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি শ্রীঅরবিন্দের নিকট যে প্রেরণা লাভ করেছেন তা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন। ১৯২০ সনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বারীন্দ্রকুমারের আন্দামান থেকে প্রত্যাবর্তন। ঐ সনের ৭ই এপ্রিল তারিখে শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারকে তাঁর প্রসিদ্ধ পত্রখানা লিখেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগ ও তাঁর মত ও পথ সম্বন্ধে অনেক কথাই ঐ পত্রে লিখেছিলেন ; তাই পত্রখানা বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। এই পুস্তকে নানাস্থানে আমাদিগকে ঐ পত্রের অংশবিশেষের উল্লেখ করতে কিংবা উদ্ধৃত করতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে শ্রীঅরবিন্দের নিভৃত সাধনা দেশীয় ও বিদেশীয় অনেকেরই কৌতূহল উদ্রেক করেছে। পুর্বেই বলা হয়েছে ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বরের পর বছরে বিশেষ কয়টি দিন ব্যতীত অন্য সময় শ্রীঅরবিন্দকে কেউ দেখতে পেতো না। ১৯২০ ও ১৯২৬ সনের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সংগে আলাপ করেন। তাঁদের মধ্যে পার্লামেণ্টের সদস্য কর্ণেল ওয়েজউড, মহারাষ্ট্রের নেতা ডাঃ মুঞ্জে, পঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়, চিত্তরঞ্জন দাশ মশাই প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দাশ মশাই কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজদল গঠন করেন। আইন সভার ভিতর থেকে সরকারের সংগে বিরোধ ও অসহযোগ নীতির অনুসরণ কংগ্রেসের স্বরাজদলের ছিল লক্ষ্য ; কংগ্রেসের অপর সদস্যেরা আইনসভা বর্জন ক'রে সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করার

পক্ষপাতী ছিলেন। দাশ মশাই নতুন দল গঠন করে শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ বা অনুমোদন প্রার্থনা করেন। গভীর ধর্মভাব ছিল দাশ মশাইয়ের জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। তিনি রাজনীতি ছেড়ে বিশেষভাবে ধর্মচর্চা প্রভৃতি নিয়ে থাকবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে রাজনীতি ত্যাগ করতে নিষেধ করেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে দাশ মশাইয়ের অবদান অসামান্য।

আশ্রমের সূচনা

এদিকে শ্রীঅরবিন্দের সাধনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সব ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দের সংগে তাঁর আদর্শে জীবন যাপন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে দু-চারটি করে শ্রীঅরবিন্দের ভক্তেরা পণ্ডিচেরীতে বাস করতে আরম্ভ করেন। অতিথি সমাগম ও ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ স্বভাবতই আহার ও বাসস্থানের সংস্থান ও তার তত্ত্বাবধানের প্রশ্ন গুরুত্ব লাভ করে। ১৯২২ সনে মাদাম রিশার সে ভার গ্রহণ করলে পণ্ডিচেরীর আশ্রমের সূচনা হয়। তখনও পণ্ডিচেরীর আশ্রমে অধিবাসীর সংখ্যা ত্রিশের কোঠায় পৌছায়নি। ১৯২৬ সনে শ্রীঅরবিন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে যান; তাঁর দু'বছর আগে প্রসিদ্ধ গায়ক, লেখক ও শ্রীঅরবিন্দভক্ত দিলীপকুমার রায় মশাই পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সংগে দেখা করেন। শ্রীঅরবিন্দের অন্তরালে গমনের প্রায় দেড় বছর পরে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সংগে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়। দিলীপবাবু ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই তাঁদের সাক্ষাৎকারের বিবরণ লিখে রেখেছেন। তাঁদের সেই বিবরণ শ্রীঅরবিন্দকে বুঝবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করবে। দিলীপবাবু তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে" পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের সংগে সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ দিয়েছেন প্রথমে তার উল্লেখ করা যাক্।

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার

ঐ পুস্তকে দিলীপবাবু লিখেছেন শ্রীঅরবিন্দের কাছে তিনি যা পেলেন অন্য কোথায়ও তিনি তা পাননি। বাল্যকালেই দিলীপবাবুর মনে ধর্মজিজ্ঞাসা জাগে। বাল্যে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" পুস্তক খণ্ডগুলি তিনি মুগ্ধ হয়ে পড়তেন। তিনি লিখেছেন অন্তত পঞ্চাশ বার কথামৃতের খণ্ডগুলি তিনি পড়েছেন। পরে নানা ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট পুস্তকের সংগে দিলীপবাবুর পরিচয় হয়েছে; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine পুস্তক পড়বার আগে দিলীপবাবুর নিকট কথামৃতই ধর্মবিষয়ে সেরা পুস্তক মনে হয়েছে। তিনি বলেন যৌবনে তাঁর মনে নানা প্রশ্ন, নানা সংশয় জাগতে থাকে। পরমহংসদেবের প্রতি দিলীপবাবুর

ভক্তির সীমা ছিল না। পরমহংসদেব বলতেন, "কী হবে জীবনের নানা তত্ত্ব নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামিয়ে? তুমি আম খেতে এসেছ আম খাও; আম গাছে কত শাখা, কত প্রশাখা, কত পাতা সে হিসাবে কাজ কী?" মানুষের মনের মধ্যে যে চির-জিজ্ঞাসু রয়েছে এরূপ সরল বিশ্বাসের উক্তিতে সে তো শান্ত হয় না। দিলীপবাবুর চিত্তও তৃপ্তি পেতো না। মানুষের মনের সংশয় সহজে ঘুচবার নয়। আর মানবমনের এই স্বাভাবিক সংশয়কে অনেক মনীষীই অকল্যাণকর মনে করেন না; কারণ সংশয় না এলে, সংশয়ের সংগে বোঝাপড়া না হলে সংশয়ের অতীত শান্তিতে একদিন মানুষের পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। দেশ-বিদেশের বহু মনীষীর সংগেই দিলীপবাবুর পরিচয় ঘটে, কিন্তু কেউ তাঁর মনের সংশয় দূর করতে পারেননি। তারপর ১৯২৪ সনে শ্রীঅরবিন্দের সংগে পণ্ডিচেরীতে তাঁর দেখা হয়। এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু তাঁর শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে পুস্তকে যা লিখেছেন তা এই: "চমকে উঠেছিলাম যেদিন দেখলাম শ্রীঅরবিন্দকে ১৯২৪ সনে; তিনি আমাকে বললেন নিশ্চিতির শান্ত সুরে যে ভগবানকে চাইলে পাওয়া যায়—এ তিনি জেনেছেন প্রত্যক্ষ অপরোক্ষ অনুভবে। বিশ্বাস হলো মুহূর্তে, কেননা তাঁর সুরে বেজে উঠেছিল সেই সুর, যে সুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, অপরোক্ষ অনুভব, বিনা বেজে উঠতে পারে না।" নরেন্দ্রনাথ একদিন পরমহংসদেবের মুখে শুনেছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে স্পষ্ট দেখতে পান, যেমন তাঁর সম্মুখের সব জিনিষ চর্মচক্ষুর দ্বারা তিনি দেখতে পাচ্ছেন। দিলীপবাবুও শ্রীঅরবিন্দের নিকট অনুরূপ কথা শুনলেন। কিন্তু কথামৃত দিলীপবাবুর মনের যে সকল সংশয় দূর করতে পারেনি তা দূর হয় শ্রীঅরবিন্দের উপদেশে, তাঁর The Life Divine গ্রন্থ পড়ে। তাই ১৯২৮ সনে সব ছেড়ে দিলীপবাবু পণ্ডিচেরী আশ্রমে চলে যান।

শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅরবিন্দের সংগে সাক্ষাতের প্রতিক্রিয়া দিলীপবাবুর মনে কী হয়েছিল দেখা গেল; রবীন্দ্রনাথের মনে ঐ সাক্ষাৎ যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তা দেখা যাক্। ১৯২৮ সনের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণে যাবেন বলে কলকাতায় জাহাজে ওঠেন। কিন্তু জাহাজে থাকার ব্যবস্থা তাঁর মনঃপুত না হওয়াতে মাদ্রাজে তিনি জাহাজ থেকে নেমে পড়েন। কুনুর, বাঙালোর প্রভৃতি স্থানে কয়েকদিন কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ থেকে ইউরোপগামী

Chantilly নামক এক জাহাজে ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দকে জানান তিনি শ্রীঅরবিন্দের সংগে দেখা করতে চান। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গ করে দর্শন-দিবস ব্যতীত অন্য দিনে শ্রীঅরবিন্দ কদাচিৎ কারো সংগে দেখা করতেন। এক্ষেত্রেও নিয়মভঙ্গ করে শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরী আশ্রমে তাঁর সংগে দেখা করার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেন। ২৮শে মে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সংগে দেখা করার জন্যে পণ্ডিচেরীতে নামেন। পরে প্রবাসী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সংগে সাক্ষাতের যে সুন্দর বিবরণ প্রকাশ করেন তার উপসংহার এই :

"প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম—ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরে আলো জ্বালাবেন। কথা বেশী বলবার সময় হাতে ছিল না। অতি অল্পক্ষণ ছিলুম। তারি মধ্যে মনে হলো, তাঁর মধ্যে সহজ প্রেরণাশক্তি পুঞ্জিত। কোন খর-দস্তুর মতের উপদেবতার নৈবেদ্যরূপে সত্যের উপলব্ধিকে তিনি ক্লিষ্ট ও খর্ব করেননি। তাই তাঁর মুখশ্রীতে এমন সৌন্দর্যময় শান্তির উজ্জ্বল আভা। মধ্যযুগের খৃস্টান সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি জীবনকে রিক্ত, শুষ্ক করাকেই চরিতার্থতা বলেননি। আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন "যুক্তাত্মনঃ সর্বমেবাবিশন্তি।" পরিপূর্ণযোগে সকলের মধ্যে প্রবেশাধিকার আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। আমি তাঁকে বলে এলুম—আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে শৃণ্বন্তু বিশ্বে।

"প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার সামনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার

আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার সামনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথ অল্প কথায় নীরব ধ্যানী শ্রীঅরবিন্দের যে আলেখ্যখানি এঁকেছেন তা অপূর্ব। রবীন্দ্রনাথের ঋষি-দৃষ্টির নিকট শ্রীঅরবিন্দের অন্তরের সত্য রূপটি কী আশ্চর্যরূপে ধরা পড়েছিল।

পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের দু'দিন পরে রবীন্দ্রনাথ কন্যা মীরাদেবীকে লিখেছিলেন: "অরবিন্দকে দেখে আমার ভারি ভাল লাগল—বেশ বুঝতে পারলুম নিজেকে ঠিক মতন পাবার এই ঠিক পথ।" প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথও সময় সময় সকলের সংস্পর্শ এড়িয়ে কিছুদিন নিভৃত জীবন যাপন করতেন।

এ যাত্রায় অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও তাঁর পত্নী নির্মলকুমারী মহলানবিশ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন। অধ্যাপক-পত্নী (পরিচয় পত্রিকার ১৩৫২ সনের আশ্বিন সংখ্যায়) লিখেছেন, 'শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম থেকে জাহাজে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "অরবিন্দকে দেখে খুব আশ্চর্য লেগেছে। একেবারে উজ্জ্বল চেহারা; চোখ দুটির মধ্যে কী আছে বর্ণনা করা যায় না। এমন আশ্চর্য চোখের ভাব। বুঝলুম অন্তরের মধ্যে কিছু একটা পেয়েছেন, তা না হলে চোখের এরকম দীপ্তি হয় না। বহুদিন পরে দেখা—খুশি হলুম দেখে।"

সে যাত্রায় রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাওয়া হলো না, কলম্বো থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ফিরে এলেন। আশ্রমবাসীরা শুনলেন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দকে দেখে রবীন্দ্রনাথ খুবই মুগ্ধ হয়েছেন। একদিন বিকালের অধ্যাপকদের চায়ের সভায় জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন তা আজ স্পষ্ট মনে পড়ে। তখন ১৯২২ সনের অসহযোগ আন্দোলনের পর দেশে একটা অবসাদ এসেছে। দেশের সম্মুখে চরকা-হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রভৃতি কর্ম ("Constructive Work") অনেকের নিকট ছিল একমাত্র বা মুখ্য কর্মপন্থা। রবীন্দ্রনাথের জীবনের পূর্ণতার আদর্শের সংগে শুধু চরকায় সুতা-কাটা যে খাপ খেতো না তা সুবিদিত। অধ্যাপকদের সভায় তিনি বললেন যে তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বলে এসেছেন শুধু চরকায় দেশের মুক্তি আসবে না। তিনি শ্রীঅরবিন্দকে বলেছেন তিনি আসুন দেশকে আবার lead দিন—প্রকৃত কর্মপন্থা প্রদর্শন করুন। ১৯৩৫ সনে এক চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন তিনি আবার বাইরের কর্মক্ষেত্রে যোগ দেবেন এবং তিনি তা করেননি বলে রবীন্দ্রনাথ দুঃখিত হয়েছিলেন।

অন্তরালে গমনের আগে

এইবার ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বরের অব্যবহিত পূর্বেকার অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের 'সিদ্ধি দিবস' ও লোকচক্ষুর অন্তরালে গমনের অব্যবহিত পূর্বেকার কথায় ফিরে যাওয়া যাক। আশ্রমের অধিবাসী একজন প্রত্যক্ষদর্শী যে বিবরণ দিয়েছেন এখানে তার উল্লেখ করা যাচ্ছে। তাঁর বিবরণ অনুসারে ১৯২৬ সনের প্রথম থেকেই আশ্রমের জীবনে একটা পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছিল। আগে প্রতিদিন সকাল ৯টায় শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের অধিবাসীদের সংগে স্বতন্ত্রভাবে দেখা করতেন এবং সাধন-ভজন সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন। আবার বিকালে তিনি সকলের সংগে একত্র মিলিত হতেন। কিছুক্ষণ সমবেত ধ্যান হতো। তারপর শ্রীঅরবিন্দ সকলের সংগে নানা বিষয়ে সমালোচনা করতেন—সাধন-ভজনের কথাও হতো, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধেও আলাপ-আলোচনা হতো। কিন্তু ১৯২৬ সনের গোড়া থেকেই শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। তিনি ক্রমেই অধিক পরিমাণে নিজের ধ্যান-ধারণা নিয়েই থাকতে লাগলেন; আশ্রমবাসীদের সংগে তাঁর আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা কমতে লাগলো। আর Supermind বা অতিমানসের পৃথিবীতে অবতরণ, তাঁর যোগের সংগে আগেকার যোগ-পন্থার পার্থক্য কোথায়—এসব বিষয়ই তাঁর কথার মধ্যে বেশী থাকতো। ফলে আশ্রমবাসীদের মধ্যেও একটা পরিবর্তন এলো। তাঁরাও এখন আগের অপেক্ষা নিজ নিজ সাধন নিয়ে অধিকতর ব্যাপৃত থাকতে লাগলেন; তাঁদের মধ্যেও পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কমে গেল। তাঁদের অনেকের মনে এরূপ একটা ধারণাও জন্মিল যে জগতে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসন্ন। এই যখন আশ্রমবাসীদের মনের অবস্থা তখন নভেম্বর মাসের, ২৪শে তারিখে তাঁদের বলা হলো বিকালবেলা সকলকে 'সাধন-মন্দিরে' (সমবেত ধ্যানের গৃহে) সমবেত হবার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ সকল আশ্রমবাসীদের আহ্বান করেছেন। তিনি সকলকে আশীর্বাদ করবেন। এরূপ আহ্বান এর আগে কোনদিন আসেনি; তাই আশ্রমবাসীরা বিস্মিত হলেন এবং উৎকণ্ঠার সঙ্গে মিলন-ক্ষণের জন্যে প্রতীক্ষায় রইলেন।

সিদ্ধি-দিবস

নির্দিষ্ট সময়ে আশ্রমবাসীগণ যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীঅরবিন্দ এলেন সঙ্গে শ্রীমা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসলেন; পদতলে শ্রীমা একটি নিম্ন আসনে উপবিষ্ট হলেন। আশ্রমবাসীরা

শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যেন বিশেষ একটা শক্তি প্রত্যক্ষ করলেন যা তাঁরা ইতিপুর্বে কখনও লক্ষ্য করেননি। সাধনমন্দির সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। সেখানে যেন একটা তড়িৎশক্তি খেলে গেল। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে নীরবে ধ্যান চল্‌লো। তারপর শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমায়ের মাথার উপর বাম করতল স্থাপন করে দক্ষিণ করতল দিয়ে ভক্তদের একে একে আশীর্বাদ করলেন। সকলেরই মনে হলো জগতের পক্ষে গুরুত্বপুর্ণ একটা কিছু যেন ঘটে গেল। সাধন-মন্দিরে তখন চব্বিশজন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ভক্তদের একজন Miss Hudson Dutt আবেগভরে বলে উঠলেন, "To-day has the Divine descended on earth"—আজ পৃথিবীতে ভগবান অবতরণ করলেন। পরদিন শ্রীমা আশ্রমবাসীদের বল্‌লেন বিশেষ এক সাধনার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ এখন থেকে নিভৃতে অবস্থান করবেন ; তিনি আর কারো সংগে দেখাসাক্ষাৎ করবেন না।

সিদ্ধি-দিবস কথাটির অর্থ

এই হলো ১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বরের ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। এই দিনটিকে শ্রীঅরবিন্দের "সিদ্ধি-দিবস" বলা হয়। "সিদ্ধি-দিবস" কথাটির দ্বারা কী বুঝতে হবে? আর যে বিশেষ সাধনায় শ্রীঅরবিন্দ এখন থেকে প্রবৃত্ত হবেন তা-ই বা কী? এ সম্বন্ধে পণ্ডিচেরী আশ্রমের অনিলবরণ রায় মশাইয়ের "শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি যুগান্তর পত্রিকার ১৯৫০ সনের ৬ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল তার সার মর্ম নিয়ে দেওয়া গেল : সিদ্ধি বলতে আমরা বুঝি ভগবদ্দর্শন, তবে অনেক পুর্বেই আলিপুর জেলে শ্রীঅরবিন্দের তা লাভ হয়েছিল। উত্তরপাড়ায় বক্তৃতায় শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন জেলে "বাসুদেবঃ সর্বমিতি" এ উপলব্ধি তাঁর হয়েছিল। আমরা দেখেছি তার আগে বরোদায় ১৯০৮ সনের জানুয়ারী মাসে জেলে মহারাজের সংগে ধ্যান-কালে শ্রীঅরবিন্দের দেশকালাতীত নিশ্চল ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়—যার ফলে জগৎ যেন একটা ছায়ামাত্র এরূপ একটা অনুভূতি শ্রীঅরবিন্দের মনকে অভিভূত করে ফেলে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের এরূপ মনোভাব দূর হয় যখন আলিপুর জেলে বাসুদেবঃ সর্বমিতি এই অনুভূতি লাভ হয়। অনিলবরণ বলেন নিশ্চল ব্রহ্মের অনুভূতিকে বাসুদেবঃ সর্বমিতি এই অনুভূতির নিম্নে গীতায় স্থান দেওয়া হয়েছে। তারপর অনিলবরণ বলেন শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ভিত্তি হলো চারটি মহৎ অনুভূতি। বরোদার ও আলিপুরের জেলের অনুভূতি দুটি ব্যতীত অপর দুটি অনুভূতির একটি হলো পুরুষোত্তম তত্ত্বের অপরটি হলো

Supermind তত্ত্বের অনুভূতি। (Supermind তত্ত্বটি বোঝা শক্ত ; এবং "শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন"-ই Supermind তত্ত্ব ব্যাখ্যার উপযুক্ত স্থান।) এখানে সংক্ষেপে একটা কথা বলা যাচ্ছে—পশু চলে তার সহজ-জ্ঞান বা instinct অনুসারে, মানুষ চলে তার মন-বুদ্ধির সাহায্যে। তাই মানুষ পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষই শেষ কথা নয়। মানুষের মন হলো শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় Ignorance-knowledge বা ভ্রান্তজ্ঞানের এলাকা। তাই মানুষ পূর্ণ নয় ; ভ্রান্ত। একদিন মানুষ Supermind বা ঈশ্বরের অভ্রান্ত-জ্ঞানে পৌছবে এবং যেদিন ঈশ্বরের অভ্রান্ত-জ্ঞান অর্থাৎ Supermind পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সক্রিয় হবে, সেদিন মানুষ দেবমানব হয়ে উঠবে।

১৯২৬ সনের ২৭শে নভেম্বর যে সিদ্ধির কথা বলা হয় তা শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত জীবনের সিদ্ধি নয়। তিনি এর পর যে বিশেষ সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন তার লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর মানুষের মধ্যে Supermindকে নামিয়ে আনা, মানুষকে দেবমানব হবার পথে অগ্রসর করা। আর এই দিনটিকে শ্রীঅরবিন্দের "সিদ্ধি দিবস" ও Day of Victory বা বিজয়ের দিবস বলা হয় এজন্যে যে এই দিনে যা ঘটলো তা-তে, অনিলবাবুর ভাষায় "এই সম্ভাবনার ক্ষেত্রই প্রস্তুত হলো।"

সিদ্ধিলাভের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার অবসান হওয়ার কথা। কিন্তু যদিও ব্যক্তিগত সিদ্ধি শ্রীঅরবিন্দের ইতিপুর্বেই লাভ হয়েছিল তবু তিনি এখন গভীরতর সাধনার জন্যে কেন নিভৃত জীবন সুরু করেন, তা বোঝা গেল। তাঁর নিজের সিদ্ধির জন্যে নয়, সর্বমানবের দিব্যজীবন লাভে সহায়তা করার জন্যে নিভৃতে তাঁর এই দুরূহ সাধনা।

অন্তরালে গমনের পর আশ্রমের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা

এই সময়ই বর্তমান পণ্ডিচেরী আশ্রম প্রকৃতপ্রস্তাবে স্থাপিত হয় এবং শ্রীমা আশ্রম পরিচালনা-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। আশ্রমের অধিবাসীরাও আর প্রত্যক্ষভাবে শ্রীঅরবিন্দের সংস্পর্শে আসতেন না। তাঁদের সাধন-ভজন প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশও শ্রীমায়ের মাধ্যমে তাঁদের নিকট পৌছাতো। অনেক সময় সাধকদের সাধনা পরিচালনার ভার শ্রীমাই গ্রহণ করেন। অবশ্য আশ্রমের ও আশ্রমের বাইরের ভক্তদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের পত্রালাপ বন্ধ হলো না। এক সময় শ্রীঅরবিন্দকে এত চিঠির জবাব দিতে হতো যে অনেক দিন জবাব লিখতে লিখতে রাত প্রায় শেষ হয়ে আসতো।

অবশ্য পরে তিনি নিজে চিঠির জবাব দেওয়া বহু পরিমাণে কমিয়ে দেন, এবং এ কাজে দিনে দু-এক ঘণ্টার বেশী সময় ব্যয় করতেন না। শ্রীঅরবিন্দের কথা সাধনপথে সাধারণত গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে (a touch from the Guru) প্রয়োজন হয়। কিন্তু নিজে কিছুকালের জন্যে লেলে ভিন্ন আর কোন গুরুর সংস্পর্শে তিনি আসেননি। তারপর তিনি নিজের অন্তরের নির্দেশেই চলেছেন। কিন্তু অন্তরালে গমনের পর একটি সমস্যা দেখা দেয়—যাঁরা তাঁর সাহায্যপ্রার্থী পত্রালাপ ব্যতীত আর কিভাবে তাঁদের সাহায্য করা যায়। পণ্ডিচেরী আশ্রমের ভার গ্রহণ করার পর শ্রীমাই তাঁকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের ভক্তরা জানেন শ্রীমায়ের নির্দেশ আর শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ অভিন্ন। শ্রীঅরবিন্দই এ ব্যবস্থা করেছেন এবং এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে শ্রীঅরবিন্দ ইচ্ছুক ছিলেন না।

দর্শন-দিবস ও দর্শন-দিবসে কী হয়

বছরে চার দিন শ্রীঅরবিন্দ ভক্ত ও সমাগত অতিথিদের দেখা দিতেন। ঐ চার দিন হলো তাঁর জন্মদিন ১৫ই আগষ্ট; তাঁর সিদ্ধি-দিবস ২৩শে নভেম্বর, শ্রীমায়ের জন্মদিন ২১শে ফেব্রুয়ারী, আর ২৪শে এপ্রিল। ১৯২০ সনের ২৪শে এপ্রিল ফ্রান্স থেকে শ্রীমা পণ্ডিচেরীতে ফিরে আসেন এবং তখন থেকে স্থায়ীভাবে পণ্ডিচেরীতে বাস করতে থাকেন—একথা আগেই বলা হয়েছে। এই চার দর্শন-দিবসেও তিনি দর্শনার্থীদের সঙ্গে কোন কথা বলতেন না। দর্শনার্থীরা এক এক করে সামনে উপবিষ্ট শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের সম্মুখ দিয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চলে যেতেন, এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের প্রত্যেকের দিকে তাকাতেন। এই দর্শনের জন্যে লোকের ভীড় হতো এবং তাদের মধ্যে বিদেশের লোকও থাকতো। সময় সময় দর্শনার্থীর সংখ্যা দু'হাজারের ওপরে উঠেছিল এবং দর্শন দিতে কোন কোন বার কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতো।

এই মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টিপাতের ফলে লোকে শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে কী পেতেন? স্বভাবতই এই প্রশ্ন মনে আসে। সকল দর্শনার্থী শুধু কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে আসতেন না। দূর থেকে নানা অসুবিধা সহ্য করে যে তাঁরা আসতেন তাতেই প্রমাণ হয়, অনেকের নিকট এই দর্শনের বিশেষ মূল্য ছিল। হয়তো এই কথাই ঠিক যে, এই দর্শনের স্মৃতি অনেকের মনে চিরদিনের জন্যে অঙ্কিত হয়ে থাকতো, এবং তাদের মনে উন্নত জীবন-যাপনের স্পৃহা জাগ্রত হতো, তারা ধন্য হতো। আমাদের দেশে তো কথা আছে, সাধুদর্শনে

মহাপুণ্য; এবং "ক্ষণমিহ সজ্জন-সংগতি" চিরদিনের জন্মে হিতকারী হয়ে থাকে—"ভবার্ণব তরণে তরী হয়ে থাকে।" বহু দর্শনার্থীর মনে এরূপ কোন বিশ্বাস হয়তো থাকতো।

অন্তরালে গমনের পরও প্রায় পঁচিশ বছর শ্রীঅরবিন্দ বেঁচেছিলেন। এই দীর্ঘকালে তাঁর বাইরের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংখ্যায় বেশী নয়। একবার ১৯৩৮ সনে পড়ে গিয়ে তাঁর হাঁটুর হাড় ভেঙ্গে যায় এবং কিছুদিন তিনি অসুস্থ থাকেন। নিভৃত ও গভীর সাধনা অবশ্য এই সময়ও অব্যাহত ছিল। বাহিরের দিক থেকে এই সময় তার অন্যতম প্রধান ছিল আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ—The Life Divine, The Essays on the Gita প্রভৃতি দার্শনিক পুস্তকগুলি এই সময় প্রকাশিত হয়। পূর্বে লিখিত তাঁর ছোট কবিতাগুলিও পণ্ডিচেরীপর্বে প্রকাশিত হয়। আর তাঁর সাবিত্রীকাব্য-রচনা যে দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল এবং পণ্ডিচেরীপর্বে শেষ হয়েছিল সে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মৃত্যুর কিছু কাল আগে সাবিত্রীকাব্য সম্পূর্ণ করার ও সংশোধন করার জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত হয়েছিলেন। সাবিত্রীকাব্যের শেষ সর্গ (The Book of Death) তিনি শেষ করে যাননি, কিংবা ইচ্ছা করেই করেননি। আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। অন্তরালে যাবার পরও ক্রমবর্ধমান ভক্তমণ্ডলীর সংগে পত্রালাপে তাকে অনেক সময় দিতে হতো, শেষে স্বহস্তে পর্বতপ্রমাণ চিঠির স্তূপের জবাব দেওয়া প্রায় বন্ধ করতে বাধ্য হন।

দেশের ও ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে মৌন-ভঙ্গ

অল্প পরে পৃথিবীর ইতিহাসে এক মহা বিপর্যয় দেখা যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সুরু হয়। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের সৈন্যবাহিনীর হস্তে ফ্রান্স ও ইংরেজের দ্রুত পরাজয় হতে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ হিটলারের জয়ে জগতে আসুরিক শক্তির জয় দেখেছিলেন। তিনি মনে করেন হিটলারের জয় জগতের মহা অকল্যাণের কারণ হবে; এবং ভারতের অদৃষ্টে ঘটবে ইংরেজের অধীনতা অপেক্ষা অধিকতর পীড়াদায়ক দাসত্ব। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। মিত্রপক্ষের অবস্থা যখন চরম নৈরাশ্যজনক তখন তিনি প্রকাশ্যে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করেন। কিছু অর্থ দিয়ে মিত্রপক্ষকে সাহায্য করেন; এবং হিটলারের বিরুদ্ধে ও মিত্রপক্ষের স্বপক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়া লোকের উচিত, এরূপ এক বাণী প্রচার করেন। কেবল

তা-ই নয়; মিত্রপক্ষের সাহায্যার্থে তিনি নাকি তাঁর যোগশক্তিরও প্রয়োগ করেন। "যোগশক্তির প্রয়োগ" কথাটা অনেকের নিকট হেঁয়ালি মনে হবে; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের জীবনী লিখতে বসে লেখককে এ কথার উল্লেখ করতেই হবে। কৌতূহলী পাঠক "ধর্ম ও জাতীয়তা" গ্রন্থে ৪৪ পৃষ্ঠা যোগশক্তি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত দেখতে পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে লোককল্যাণের জন্যে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে তিনি নাকি যোগশক্তির প্রয়োগ করতেন—অসুস্থ কোন ভক্তকে নিরাময় করবার জন্যে তাঁর যোগশক্তির প্রয়োগ তিনি কখনো কখনো নাকি করতেন। বিশ্বযুদ্ধের সময় Dunkirk-এর ঘোর বিপর্যয়ের পর তিনি ইংরেজের পক্ষে তাঁর যোগশক্তির প্রয়োগ করেন এবং তারপর থেকেই নাকি মিত্রপক্ষের অবস্থার উন্নতি এবং হিটলারের অবস্থার অবনতি হতে থাকে! অনেকে এর মধ্যে কাকতালীয় ন্যায়ের যুক্তি দেখবেন; হিটলারের অবস্থার অবনতির যুক্তিসঙ্গত অপর কারণ বের করতে সহজেই পারবেন। কথাটার উল্লেখ করা গেল; বিশ্বাস করা বা না করা পাঠকের ইচ্ছে।

এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যেই তিনি মৌন-ভঙ্গ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলা কালে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কে এক সংকট দেখা দেয়। ভারতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতালাভের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। তাই ১৯৪২ সনে বিলাতের পার্লামেণ্ট এক নতুন শাসন-প্রস্তাবসহ Sir Stafford Cripps-কে এদেশে পাঠায়। দেশের লোকের নিকট সে প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হলো না। ভারতবাসী চায় যুদ্ধশেষে স্বাধীনতার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। কিন্তু পার্লামেণ্টের প্রস্তাবে সেরূপ প্রতিশ্রুতি ছিল না। আর বিশ্বাস করে ভারতবাসীদের হাতে দেশরক্ষার কোন প্রকৃত দায়িত্ব অর্পণ করার ইচ্ছাও ইংরেজের ছিল না। দেশে তখন মুসলমানদের তরফে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবী দেখা দিয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন সর্বজগতের কল্যাণের জন্যেও ভারতের স্বাধীনতা প্রয়োজন—তাঁর নানা বক্তৃতায় ও পত্রাদিতে একথা যে তিনি বারে বারে বলেছেন তা আমরা দেখেছি। কিন্তু তাঁর এই আশঙ্কাও ছিল যে দ্বিখণ্ডিত ভারতের পক্ষে ভারতের এই বিধি-নির্দিষ্ট দায়িত্ব-পালন সম্ভব হবে না। Cripps প্রস্তাবের অনেক ত্রুটি ছিল; কিন্তু সেই প্রস্তাব গৃহীত হলে দেশ দ্বিখণ্ডিত হতো না। তাই তিনি মৌন-ভঙ্গ করে কংগ্রেসের কর্তাদের নিকট এক টেলিগ্রাম করেন। Cripps প্রস্তাব গ্রহণ করে পরে যুদ্ধশেষে পূর্ণ-স্বাধীনতার আন্দোলন ভারতবাসী করুক এই ছিল তাঁর কাম্য। তাই তাঁর টেলিগ্রামে

তিনি একথাই বলেন যে যখন ইংরেজের অধীনতা অবসান হওয়ার পথে, তখন ভারতের সম্মুখে নতুন ভীষণ জার্মান দাসত্বের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। Cripps প্রস্তাব গ্রহণ করে ইংরেজের সংগে যুদ্ধে সহযোগিতা দ্বারা হিটলারের দাসত্ব থেকে এবং দেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অভিশাপ থেকে ভারতবাসীকে রক্ষার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। তাঁর এই অনুরোধ অবশ্য রক্ষিত হলো না। সমচিত্ত শ্রীঅরবিন্দ তাতে ক্ষুব্ধ না হয়ে শুধু বলেছিলেন, I did a bit of Niskam Karma (নিষ্কাম কর্ম)।

স্বাধীনতা দিবসের বিবৃতি

পাঁচ বছর পরে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা-দিবসে শ্রীঅরবিন্দ যে বিবৃতি দেন তা নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবৃতির সারমর্ম নিম্নে দেওয়া গেল। এই বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন:

আমার প্রথম জীবনে কয়েকটি স্বপ্ন ছিল। সেকালে অনেকের নিকট আমার ঐ স্বপ্নগুলি অবাস্তব ও অসম্ভব মনে হলেও আজ সেই স্বপ্নগুলি বাস্তবে পরিণত হয়েছে কিংবা বাস্তব হবার পথে নিঃসন্দেহে এগোচ্ছে। আমার প্রথম স্বপ্ন ছিল এই যে ভারতে রাষ্ট্র-বিপ্লব দেখা দেবে এবং তাঁর ফলে স্বাধীন ভারতের সৃষ্টি হবে। সে স্বপ্ন আজ আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব ঘটনা।

আমার দ্বিতীয় স্বপ্ন এশিয়ার নব জাগরণ, এবং তার ফলে জগতের উন্নত দেশ সমূহের মধ্যে এশিয়ার আগের ন্যায় গৌরবময় স্থান লাভ। সে স্বপ্নও বাস্তব হতে চলছে।

আমার তৃতীয় স্বপ্ন এই ছিল যে সর্বজগতে একদিন মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং তার ফলে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের অবস্থার সবিশেষ উন্নতি হবে। এই বিশ্বমৈত্রী ব্যতীত ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন থাকবে, এবং বড় রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতাও নিরাপদ হবে না। আজ জগতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে, তবে তার বাধাও বিবিধ। জগতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্যে League of Nations, United Nations Organisation বা U. N. O. প্রভৃতি যে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলি ত্রুটিপূর্ণ সন্দেহ নেই। তবু কাজ সুরু হয়েছে এবং একদিন তা সফল পরিসমাপ্তিতে পৌছবেই। বিরোধ নয় ঐক্যই প্রকৃতির বিধান ও ঈশ্বরের অভিপ্রায়। প্রকৃতির বিধানকে ও ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে চিরদিন রোধ করা সম্ভব নয়।

আমার অপর স্বপ্ন সর্বজগতে ভারতের অধ্যাত্ম তত্ত্ব-সমূহের প্রচার ও প্রসার। তা-ও সুরু হয়েছে—আজ ইউরোপ ও আমেরিকার বহু লোক ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন; এবং দিন দিন এই আকর্ষণ বাড়ছে।

আমার শেষ স্বপ্নটি অবশ্য আমার ব্যক্তিগত আশা মাত্র। সে স্বপ্নটি হলো এই যে জগতের বিবর্তন ধারায় মানুষ আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে। যেদিন থেকে পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে মানুষ বুদ্ধিজীবীর স্তরে উঠেছে সেইদিন থেকেই পূর্ণমানবতার ও পূর্ণ-মানব সমাজের আদর্শের একটি অস্পষ্ট ধারণা মানুষের মনে জেগেছে। জগতের অগ্রগামী কোন কোন চিন্তানায়ক আজ ভাবছেন কী করে মানুষ Superman বা অতিমানুষ হয়ে উঠবে। এ পথে বাধা অতি দুস্তর সন্দেহ নেই। তবে মানবের এই (দিব্য) পরিবর্তনই যদি প্রকৃতির লক্ষ্য ও ভগবানের অভিপ্রায় হয় তবে একদিন না একদিন তা সত্য হয়ে উঠবেই। মানবের এই দিব্য পরিবর্তন ঘটবে অধ্যাত্মবুদ্ধির ক্রমবিকাশের ফলে। এক্ষেত্রেও তার সূচনা হয়ত হবে ভারতে; এবং ভারত থেকে তা সর্বজগতে প্রসারিত হবে।

আজকের দিনে ভারতের স্বাধীনতার মর্ম আমার নিকট হলো এই। আমার আশা পূর্ণ হবে কিনা বা কতদূর পূর্ণ হবে তা নির্ভর করছে স্বাধীন ভারতের ওপর।

শেষ তিন বছর

এই বিবৃতি দেবার পর তিন বছরের কিছু অধিককাল শ্রীঅরবিন্দ জীবিত ছিলেন। তখন পণ্ডিচেরী আশ্রম আর ১৯২৬ সনের অল্প কয়েকটি লোকের আশ্রয়স্থল নয়। আশ্রমের স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ক্রমে প্রায় হাজারের কোঠায় গিয়ে পৌছেছে। শ্রীমায়ের ব্যবস্থায় আশ্রম একটি অপূর্ব প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠেছে। আশ্রমের পূর্ণ বিবরণ কিংবা পরিচালনা-ব্যবস্থার বিস্তৃত আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। সাধারণভাবে আশ্রমের সম্বন্ধে দু-একটি মাত্র কথা এখানে বলা হলো। সেকালে আমাদের দেশে তপোবনে কোন একজন শ্রেষ্ঠ তপস্বী ঋষিকে—কুলপতিকে ঘিরে এক একটি বৃহৎ আশ্রম-পরিবার গড়ে উঠতো। শ্রীঅরবিন্দকে ঘিরে পণ্ডিচেরীতে যে আশ্রম গড়ে উঠেছে তা-ও একটি বৃহৎ আশ্রম-পরিবার। তবে এই আশ্রম-পরিবার একটি আধুনিক কালের উপযোগী প্রতিষ্ঠান। আধুনিক কালের বৈশিষ্ট্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে

বিজ্ঞানের প্রয়োগ, সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ও ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্য-গ্রহণ। আজ পণ্ডিচেরী আশ্রমের কর্ম বিবিধ, কর্মের আয়োজনও বিচিত্র। আশ্রমবাসী প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুসারে আশ্রমের কোন-না-কোন কাজে দিনে কিছু সময় দেন। আশ্রমের প্রায় সকল কর্মই আশ্রমবাসীরা নিজেরাই করে থাকেন। আশ্রমের পাকশালায় আহার্য প্রস্তুত করা, আশ্রমের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ খাদ্য-বস্তু উৎপাদন করা, আশ্রমের ছাপাখানা প্রভৃতি বিভিন্ন কারখানা পরিচালনা আশ্রমবাসীরা নিজেরাই করে থাকেন। এমন কি গৃহ-নির্মাণও যথাসম্ভব আশ্রমবাসীরাই করেন। বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে সব কিছুই সুন্দর ভাবে, সুষ্ঠু ভাবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। আশ্রমবাসীদের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত; তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ—তাই এভাবে সকল কাজ করা সম্ভব হয়ে থাকে। এ হলো আশ্রমজীবনের একটি দিক।

দ্বিতীয়ত আজ আশ্রমে কেবল সাধক-সাধিকা বাস করেন না। আশ্রমের অধিবাসী ছোট ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। ওদের শিক্ষারও সুব্যবস্থা আশ্রমে রয়েছে। ছেলেমেয়েরা মাতৃভাষা ব্যতীত প্রায় সকলেই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা শেখে ও বলতে পারে। আধুনিক রীতিতে শিক্ষা দিতে সক্ষম দেশীয় ও বিদেশীয় শিক্ষকেরা আশ্রমের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করেছেন। এবং ক্রমে একটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও আশ্রম কর্তৃপক্ষের মনে রয়েছে। এ হলো আশ্রম জীবনের অপর একটি দিক।

তৃতীয়ত মৃত্যুর কিছু দিন আগে থেকেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রবাসীদের শরীর-চর্চা ও স্বাস্থ্যরক্ষার (Physical culture)-এর উপর—বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। আশ্রমবাসী প্রত্যেকে খেলাধূলা ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে ব্যায়ামাদির দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান ছিলেন। আশ্রমের বৃদ্ধ অধিবাসীরাও সমুদ্রতীরে নিয়মিত ভ্রমণাদির দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষা করতেন। কিন্তু এদিকে শ্রীঅরবিন্দ নিজে এক দারুণ কষ্টকর রোগের কবলে পতিত হন। তাঁর মূত্রাশয় (Kidney) রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দু-একবার রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করলেও আশ্চর্যরূপে সঙ্কট কেটে যায়। কিন্তু ১৯৫০ সনের ২৪শে নভেম্বরের দর্শন-দিবস যখন নিকটবর্তী হয় তখন রোগ গুরুতর। তখন প্রশ্ন হলো সেবার ঐ অসুস্থ শরীর নিয়ে (দারুণ শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করে) শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে দর্শন দেওয়া কি সম্ভব হবে। এদিকে প্রায় আড়াই হাজার দর্শনার্থী দর্শনের আশায় এসেছেন। শেষে স্থির হলো শ্রীঅরবিন্দ দর্শন দেবেন। দর্শন শেষ হতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগেছিল। ধীর স্থিরভাবে শ্রীঅরবিন্দ

দর্শন দিলেন। দর্শন-দানের সময় শ্রীঅরবিন্দ কী দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন তাঁর মুখ দেখে কেউ তা বুঝলেন না। এর কয়েকদিন পরেই শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যু হয়।

সাবিত্রী কাব্যের সংশোধন

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সাবিত্রী কাব্যের রচনা ও সংশোধনের কাজ শেষ করবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়েছিলেন। এখানে তাঁর সাবিত্রী কাব্য সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার, তিনি তাঁর কাব্যটিকে বলেছেন A legend and a Symbol. সাবিত্রী কাব্যের উপাখ্যান নেওয়া হয়েছে মহাভারতের বনপর্বের প্রসিদ্ধ সাবিত্রী ও সত্যবানের উপাখ্যান থেকে; তাই সাবিত্রী একটি legend। শ্রীঅরবিন্দ মহাভারতের কাহিনীর ভিত্তির উপর তাঁর সাবিত্রী নামক রূপক কাব্যটি রচনা করেছেন। তিনি তাঁর এই কাব্য উপলক্ষ্য করে নিজের সাধনার কথা ও যোগের মর্মবাণীই আমাদের দিয়ে গেছেন। সাবিত্রী ও সত্যবান কিসের Symbol বা প্রতীক তা শ্রীঅরবিন্দ-এর নিজের কথাই বলা যাক্—"আমার কাব্যে সত্যবান আত্মার প্রতীক; মৃত্যুর আঁধার রাজ্যে সে নেমে এসেছে। আর সাবিত্রী হলো দিব্য আলো ও জ্ঞানের প্রতীক। সাবিত্রী মৃত্যুর কবল থেকে সত্যবানকে উদ্ধার করার জন্য নেমে এসেছে। অশ্বপতি হলো তপোশক্তির প্রতীক। যোগী অশ্বপতির সাধনার উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীকে অজ্ঞানতা ও মৃত্যু থেকে উদ্ধার করা।" আর এ কথাও ঠিক যে সাবিত্রী কাব্য শ্রীঅরবিন্দের সাধনারই রূপক। সারাজীবন ধরে অন্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাবিত্রী কাব্য রচনা করেছেন; এবং সাবিত্রী কাব্যে তিনি নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও সাধনাই বর্ণনা করেছেন—দেখিয়েছেন কীভাবে যোগের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করে মানুষ অমর হয়। অশ্বপতি তপস্যা করেই কন্যা জ্ঞানরূপা সাবিত্রীকে লাভ করেছিলেন। তপস্যা ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। সাবিত্রী কাব্যের এই হলো মর্মকথা—সাবিত্রী উপাখ্যানের রূপক ব্যাখ্যা। শ্রীঅরবিন্দ মৃত্যুর কয়েকদিন আগে সাবিত্রী কাব্য সংশোধন করেন; কেবল শেষ সর্গ, The Book of Death অসমাপ্ত থেকে যায়।

মহাপ্রয়াণ

আশ্রমবাসী এক প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীঅরবিন্দের জীবনের শেষ কয়দিনের ও তাঁর মহাপ্রয়াণের বিবরণ গল্পভারতী (১৩৫৭ সনের পৌষ) পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তার মর্ম এখানে দেওয়া গেল :—

সেবার প্রায় আড়াই হাজার দর্শনার্থী আশ্রমে উপস্থিত হন। তাড়াতাড়ি

করেও দর্শন শেষ হতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। শ্রীঅরবিন্দ শান্তভাবে নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন; মুখে রোগ-যন্ত্রণার চিহ্নের লেশমাত্র নেই। তবে যাঁরা তাঁর রোগের সংবাদ রাখতেন তাঁরা জানতেন দর্শনার্থীদের নিরাশ না করতে গিয়ে তাঁকে কী অসহ্য রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল। পরদিন মাদ্রাজের রাজ্যপালকে (ভবনগরের মহারাজাকে) বিশেষ দর্শন দেবার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই স্থির ছিল। রাজ্যপাল সস্ত্রীক এলেন এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সঙ্গে আধঘণ্টা ধরে আলাপ-আলোচনা করলেন। আশ্রমের সব কাজই যথানিয়মে চল্‌ছিল। বস্তুত শ্রীঅরবিন্দের অসুখের কথা নিয়ে আশ্রমে বিশেষ আলোচনা হতো না। নভেম্বর মাস গেল। আশ্রমের বালক-বালিকাদের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস ১লা ডিসেম্বর। দু'দিন ধরে প্রতি বছর এই উপলক্ষে উৎসব হয়ে থাকে; এবারও হলো। গীত, অভিনয়, আবৃত্তি, খেলাধুলা, ব্যায়াম কিছুই বাদ গেল না। ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার বৈকালে খেলার মাঠে নিয়মিত খেলাধুলা সবই হলো, এবং আশ্রমের সকলেই তা-তে যোগ দিলেন। আশ্রমের যে কয়জন সাধক ও সাধিকা শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত পরিচর্যায় নিযুক্ত তাঁরাও সেদিন যথানিয়মে খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন। মোটকথা আশ্রমবাসীরা শ্রীঅরবিন্দের রোগের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি; এবং তাঁদের মনে আশঙ্কাও ছিল না। ৪ঠা ডিসেম্বর রাত্রি ১টা ২৬ মিনিটে অর্থাৎ ইংরেজী মতে ৫ই ডিসেম্বর ভোর রাত্রে শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগ করেন। পরদিন ভোরবেলা আশ্রমবাসী সকলের নিকট এই সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায়ই এসেছিল।

আজকের আণবিক যুগের আতঙ্কের দিনে শ্রীঅরবিন্দ মানবের ও জগতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের পরম আশার বাণীই শুনিয়ে গেছেন। সেই ভবিষ্যৎকে সফল ও সার্থক করার জন্যেই ছিল তাঁর সাধনা। তিনি তাঁর কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই চলে গেলেন। কবি ভবভূতির কথাই মনে পড়ে। বিপুল পৃথিবীতে নিরবধি কালে হয়তো আর একজন এসে শ্রীঅরবিন্দের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবেন। ক্রমবিকাশের ধারায় একদিন মানব যে দেবমানব হয়ে উঠবে, তখন পৃথিবীতে যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হবে, সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধের যে অবসান হবে, এ আশ্বাসের বাণীই শ্রীঅরবিন্দ বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে গেছেন।

পরিশিষ্ট

শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার সন্ত্রাসবাদ

শ্রীঅরবিন্দ যখন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা বাংলাদেশে সেই স্বদেশীযুগে সন্ত্রাসবাদ দেখা দেয়। স্বভাবতই এ প্রশ্ন ওঠে যে শ্রীঅরবিন্দ কি সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন? যদি সংশ্লিষ্ট থেকে থাকেন তবে সন্ত্রাসবাদে তাঁর ভূমিকা কী ছিল?

বাংলার একজন প্রসিদ্ধ সমালোচক গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী মশাই তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশীযুগ" পুস্তকে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রশংসা করেছেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এই যে সেই যুগে শ্রীঅরবিন্দ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ও তাঁর বক্তৃতায় তাঁর দেশবাসীদের প্রকাশ্যে বলতেন যে দেশের তৎকালীন অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃষ্ট ও একমাত্র কর্মপন্থা হলো নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা Passive Resistance; কিন্তু গোপনে তিনি সন্ত্রাসমূলক কর্মে প্ররোচনা দিতেন। গিরিজাবাবু এ কথাও বলেছেন যে শ্রীঅরবিন্দই পশ্চিম ভারত থেকে বাংলায় সন্ত্রাসবাদের আমদানি করেন, এবং আজকাল শ্রীঅরবিন্দের জীবনের এই অধ্যায়টি গোপন করবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে—ঐতিহাসিক সত্য গোপন করবার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে গিরিজাবাবুর আর একটি কথারও উল্লেখ করা যেতে পারে। গিরিজাবাবুর মতে আলিপুর বোমার মামলায় কৌঁসিলী দাশ মশাই বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশিত Passive Resistance বিষয়ক প্রবন্ধগুলির সাহায্যেই শ্রীঅরবিন্দকে মুক্ত করেন; এবং ঐ প্রবন্ধগুলি ছিল বিপিন পাল মশাইয়ের লেখা। আমরা এই পুস্তকে বোমার মামলার বিচারপ্রসঙ্গে দেখেছি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বিষয়ক প্রবন্ধ গুলি শ্রীঅরবিন্দের নিজের লেখা এবং যখন বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয় তখন পাল মশাইয়ের বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না। পরে প্রবন্ধগুলি The Doctrine of Passive Resistance নামে Calcutta Arya Publishing House কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং পুস্তকের রচয়িতার নাম দেওয়া আছে শ্রীঅরবিন্দ। সে কথা যাক্। আমাদের দেখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ এক সময়ে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন কি না।

গোড়াতে প্রশ্ন হবে এ বিষয়ে আলোচনা কি লেখকের পক্ষে অনাবশ্যক? না আলোচনায় বিরত থাকার অর্থ লেখকের কর্তব্যের হানি—লেখকের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া? শ্রীঅরবিন্দের নিজের কার্য ও উক্তি থেকে লেখকের কর্তব্যের নির্দেশ পাওয়া যাবে। আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের চন্দননগর যাত্রা-প্রসঙ্গে

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ও রামচন্দ্র মজুমদারের মধ্যে যখন বাদ-প্রতিবাদ হয় তখন শ্রীঅরবিন্দ সে প্রসঙ্গে চুপ করে থাকেন নি; এবং তার কারণ হিসাবে বলেছিলেন historical and biographical truth has its claim (Sri Aurobindo on Himself And The Mother) কাজেই উপেক্ষণীয় নয়। আমরা শ্রীঅরবিন্দের এ কথাই শিরোধার্য করবো। আর এখানে এ কথাও আমরা বলবো যে শ্রীঅরবিন্দ শ্রীঅরবিন্দই; তিনি মহিমার যে আসনে অধিষ্ঠিত সে আসন অটল। শ্রীঅরবিন্দভক্ত কেউ যদি মনে করেন উপরোক্ত প্রশ্নের আলোচনা অনাবশ্যক ও শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতির প্রতি অবমাননাকর তবে আমরা তার সঙ্গে একমত নই। উপরোক্ত প্রশ্নের আলোচনা দ্বারা শ্রীঅরবিন্দের মহিমার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হবে না, এই আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত; এবং এই সিদ্ধান্তের কারণও আমরা পাঠকের নিকট নিবেদন করবো। আমাদের বিশ্বাস সত্য গোপন দ্বারা শ্রীঅরবিন্দের মহিমার বৃদ্ধি আর সত্য প্রকাশ দ্বারা শ্রীঅরবিন্দের মহিমার হ্রাস—দুই-ই অসম্ভব।

আমাদের আলোচ্য প্রশ্ন সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য দীর্ঘ আলোচনা অনাবশ্যক। আমরা শ্রীঅরবিন্দের একখানা পত্র এবং বারীন্দ্রকুমারের দুটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করবো, এবং তাই যথেষ্ট হবে। পত্রখানা বোমার মামলায় সরকার পক্ষ প্রমাণ হিসাবে কোর্টে দাখিল করেছিল এবং সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। আর তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে বারীন্দ্রকুমার তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী নিয়ে যুগান্তর পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উল্লিখিত প্রবন্ধ দুটি সেই প্রবন্ধগুলির অন্তর্গত। ১৯৫৮ সনের জুন মাসে প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯০৬ সনের জুন মাসে তাঁর শ্বশুরকে শিলংএর ঠিকানায় পত্রখানা লিখেছিলেন। পত্রখানার প্রাসঙ্গিক অংশ এই:—......"বারীন অসুস্থ; আমি তাহাকে হাওয়া পরিবর্তনের জন্য শিলং যাইতে বলিতেছি। সে গেলে আপনি নিশ্চয়ই তার যত্ন করিবেন। বারীন কিছুটা খামখেয়ালি ধরনের। বাড়ীতে থাকিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি করা তার দরকার। কিন্তু তাহা না করিয়া মাঝে মাঝে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াইতে সে ভালবাসে। তাহাকে বাধা দিতে গেলে সে হয়ত আরো বিগড়াইয়া যাইবে।" সরকার পক্ষের কৌঁসিলী পত্রখানার প্রকৃতি মর্ম হয়ত জানতেন না। তিনি পত্রখানা সম্বন্ধে শুধু এই মন্তব্য করেছিলেন যে শ্রীঅরবিন্দ স্নেহশীল ভ্রাতা এবং বারীন্দ্রকে খুব

ভালবাসতেন। হয়ত তাঁর ইঙ্গিত ছিল এই যে দু'ভায়ের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল, এবং শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারের ক্রিয়াকলাপ অবগত ছিলেন না, এ অসম্ভব। কিন্তু বারীন্দ্রকুমারের শিলং গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল স্বাস্থ্যোন্নতি নয়; পূর্ববাংলা ও আসামের তৎকালীন ছোট লাট ফুলার সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর গতিবিধির সংবাদ সংগ্রহ করাই ছিল বারীন্দ্রকুমারের শিলং গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মাঝে মাঝে অকারণে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যও ছিল তাই। বারীন্দ্রকুমার ১৯৫৮ সনের একটি প্রবন্ধে ফুলার সাহেবকে হত্যার জন্য বিপ্লবীদের ব্যর্থ চেষ্টা প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন তা এই: "ভূপালবাবু তাঁর উগ্র আদর্শবাদী চরমপন্থী জামাতাটিকে পরম শ্রদ্ধায় ভালবাসিতেন।...শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রেম ও বিপ্লবী প্রয়োজনের জন্য তাঁর ছিল সর্বস্ব পণ। এই লাটবধের পরবর্তী নির্যাতন যা ভূপালবাবুকে সুনিশ্চিত ভোগ করতে হবে—তার বিন্দুমাত্র চিন্তা এই অসংসারী চরমপন্থী মানুষটির মনের কোণেও স্থান পায় নাই। ভূপালবাবু পরে নিজের পদমর্যাদার জোরে এবং ঘটনা সম্বন্ধে নির্দোষিতার প্রমাণে কোনগতিকে পার পেয়ে যাবেন এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের ও আমাদের আশা।" মন্তব্য অনাবশ্যক। তবে সুখের কথা ভূপালবাবুকে বিপদে পড়তে হয়নি, কারণ ফুলার সাহেব বিপ্লবীদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে ১৯০৬ সনের আগষ্ট মাসে নিরাপদে বিলাতে প্রস্থান করেন।

দেখা গেল এক্ষেত্রে বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপ শ্রীঅরবিন্দ অবগত ছিলেন, এবং তিনি তার সমর্থন করুন বা না করুন তাতে বাধা দেন নি। কিন্তু সন্ত্রাসবাদে এই কি ছিল শ্রীঅরবিন্দের একমাত্র ভূমিকা? এ প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের দ্বিতীয় প্রবন্ধ থেকে আরো কিছু জানা যায়। আমরা ইতিপূর্বে ১৯০৭ সনের ডিসেম্বর মাসে নারায়ণগড়ে বাংলার ছোটলাট ফ্রেজার সাহেবকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টার উল্লেখ করেছি। বারীন্দ্রকুমার তাঁর ১৯৫৮ সনের জুন মাসের দ্বিতীয় প্রবন্ধে লাটসাহেবের হত্যা-চেষ্টার বিবরণ দিয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন: "বিপ্লব চক্রের মূল কেন্দ্রী The big three ("রাজা" সুবোধ মল্লিক, I.C.S. চারু দত্ত ও শ্রীঅরবিন্দ) যে রাজপুরুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন তাহার আর রক্ষা ছিল না। ভাগ্য যাহাকে রক্ষা করিত......দৈব কৃপায় তিনি রক্ষা পাইতেন।" শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রকুমারের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র; তাঁর অযথা নিন্দা করা বারীন্দ্র-কুমারের পক্ষে অসম্ভব। আর বারীন্দ্রকুমার যা বলেছেন তা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা; তাই তাঁর কথা নিশ্চয়ই নির্ভরযোগ্য। তাহলে সন্ত্রাসবাদে শ্রীঅরবিন্দের

ভূমিকা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে তিনি বিপ্লবীদের কর্ম কেবল সমর্থন করেন নি; অন্তত ক্ষেত্র বিশেষে যাঁদের দ্বারা বিপ্লবকর্মের নির্দেশ দেওয়া হতো তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। কথিত আছে কিংসফোর্ড সাহেবের হত্যার নির্দেশ এসেছিল The big three-র কাছ থেকে; বারীন্দ্রকুমারের দলের দুটি বালক সেই নির্দেশ পালন করতে গিয়ে নিজেদের প্রাণ হারায়।

অথচ শ্রীঅরবিন্দ যে অযথা রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন বারীন্দ্রকুমারের নিজের কথা থেকেই তা জানা যায়। স্বদেশীযুগে চন্দননগরের মেয়র তার্দিভেল সাহেব সন্ত্রাসবাদীদের বিরাগভাজন হন। তাঁর অপরাধ তিনি চন্দননগরে বে-আইনি অস্ত্র আমদানি নিষেধ করেছিলেন। তার্দিভেল সাহেবের হত্যায় সম্মতি সেবার জন্য বারীন্দ্রকুমার শ্রীঅরবিন্দের নিকট প্রার্থনা করেন। শ্রীঅরবিন্দ প্রথমে আপত্তি করেন। শ্রীঅরবিন্দের কথা যে ঐরূপ হত্যায় লাভ নাই। আর ঐরূপ হত্যা কত করতে হবে, তার শেষই বা কোথায়? তাই তিনি প্রথমে সম্মতি দিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বারীন্দ্রকুমারের পীড়াপীড়িতে সম্মতি দেন। শ্রীঅরবিন্দ দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বপণ করেছিলেন,—এ কথা বলেছেন বারীন্দ্রকুমার, আর একথা তো সকলেরই জানা। তাই তিনি নিজে দুঃখ বরণ করতে যেমন প্রস্তুত ছিলেন পরিবারের আত্মীয় স্বজনকেও দুঃখ দিতে দ্বিধা করতেন না। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে আমরা প্রথমটির পরিচয় পাই; আর স্ত্রীর প্রতি তাঁর ব্যবহার ও শ্বশুরের বিপদের আশঙ্কার প্রতি ঔদাসীন্য দ্বিতীয়টির প্রমাণ। অপর লোকের বেলায় ক্ষেত্র বিশেষে হত্যার নির্দেশ পর্যন্ত দিতে হয়ত তাঁর দ্বিধা হবার কথা নয়, যদি তার ফলে দেশের লোক জাগে। বারীন্দ্রকুমারের কথা থেকে তো এই সিদ্ধান্তই করতে হয়। তবে এই স্বভাবত কোমল প্রকৃতির লোকটির এরূপ আচরণের কারণ কী?

আমরা দেখেছি তিনি ইউরোপের যে পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন সেই পরিবেশের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীয়তাবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ। ইউরোপীয় পরিবেশের এই দুটি বৈশিষ্ট্যই এককালে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা তাঁর উত্তরপাড়ার বক্তৃতা থেকে জানতে পাই যে একসময় তিনিও অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। কিন্তু এই নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদীই আবার ভারতে এসে বরোদার পর্বে হয়ে ওঠেন ঈশ্বরবিশ্বাসী যোগী। অর্থাৎ ভারতে আসার অল্প পরেই তিনি অজ্ঞেয়বাদের মোহ কাটিয়ে ওঠেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ইউরোপের জাতীয়তাবোধের রাজনীতির মোহ কাটাতে তাঁর আরো কিছু সময়

লাগে। স্বদেশীযুগে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ভাবধারায় মশগুল। অবশ্য সে যুগেও তাঁর জাতীয়তা আর সাম্রাজ্যবাদীদের জাতীয়তা এক জিনিস ছিল না; স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবাসীদের আচরণ পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের আচরণের অনুরূপ হবে না, সে কথা স্বদেশীযুগেই তিনি বলেছেন। আর ধর্মপত্রিকায় আর্য নীতি সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন, তা থেকে একথাটাই প্রমাণ হয় যে আর্য নীতিতে হিংসা দ্বেষের স্থান নেই। কিন্তু একথা সত্য যে তিনি ছিলেন বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদী, পতিত ভারতের উদ্ধারের পক্ষপাতী। একথা স্বীকার করতেই হবে এই জাতীয়তাবাদ কিছু সম্পূর্ণ মন্দ জিনিস নয়; তবে একথাও ঠিক যে ব্যক্তিগত জীবনে যে মানুষের আচরণ অনিন্দনীয়, Nationalism Patriotism, Imperialism প্রভৃতির 'ism'-এর প্রভাবে এসে সেই অনিন্দনীয় চরিত্রের মানুষই প্রয়োজন হলে নিজ দেশের বা সাম্রাজ্যের স্বার্থে অতি নিষ্ঠুর ও ক্রূরকর্মা হয়ে উঠেন বা উঠতে পারেন। ভারতের ইংরেজ আমলের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

এক সময় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বস্ব পণ করে শ্রীঅরবিন্দ আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন; পণ্ডিচেরী যাবার অল্প পরে তিনি রাজনীতির সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। রাজনীতির সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ হিসাবে তিনি বারীন্দ্রকুমারকে লিখেছিলেন: "রাজনীতি ছেড়েছি কেন? আমাদের রাজনীতি ভারতের আসল জিনিস নয় বলে, বিলাতী আমদানি, বিলাতী ঢঙের অনুকরণ মাত্র।" (শ্রীঅরবিন্দের পত্র ৩২ পৃষ্ঠা) কথাটার সোজা অর্থ এই যে শ্রীঅরবিন্দ একদিন বুঝলেন তিনি এতকাল যে রাজনীতি করেছিলেন তা ইউরোপীয় ধরনের রাজনীতি, এবং সে পথ ভুল পথ। অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মুলনীতি ছিল Killing is no murder অর্থাৎ রাজনৈতিক নরহত্যা আর মানুষ খুন এক কথা নয়। রাজনৈতিক হত্যাকারী আর সাধারণ খুনে এক পর্যায়ের লোক নয়। ইউরোপীয় রাজনীতির অপর একটি মূল সূত্র এই যে The end sanctifies the means অর্থাৎ উদ্দেশ্য যদি ভাল হয় তবে মন্দ উপায়েও তা সিদ্ধ করা দোষের নয়। এতকাল শ্রীঅরবিন্দ এই ইউরোপীয় রাজনীতির মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন, পরে তাঁর এই মোহ কাটে—এই কি তা হলে সত্য? ইউরোপীয় পরিবেশের একটি প্রভাব—অজ্ঞেয়বাদ বা নাস্তিকতার মোহ—তিনি কাটিয়ে উঠেন ভারতে আসার অল্প পরে বরোদায় বাস-কালে। ইউরোপীয় পরিবেশের

দ্বিতীয় মোহ ও তাঁর একদিন কাটলো, কিন্তু কিছু বিলম্বে, পণ্ডিচেরী-পর্বের প্রথম দিকেই। ইতিমধ্যে ১৯০৬ সন থেকে ১৯১০ সন পর্যন্ত কলকাতায় তিনি ইউরোপীয় ধরনের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তবে বারীন্দ্রকুমারকে লেখা উপরোক্ত পত্রে তিনি একথাও বলেছিলেন যে ভুল হোক আর যা-ই হোক ঐ রাজনীতির ফলে দেশ জেগেছে।

শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর জেলের যে কক্ষে এক বছর যাপন করেন সে কক্ষে আজ স্বাধীন ভারত-সরকারের নির্দেশে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে মর্মর ফলক স্থাপিত হয়েছে; এবং আলিপুর জেলের সে কক্ষ আজ তীর্থের গৌরব লাভ করেছে। দেশবাসী তাঁকে কী চোখে দেখে এ তারই প্রমাণ। আর বিদেশীরা তাঁকে কী চোখে দেখে তা জানা যায় রোমাঁ রোঁলা প্রভৃতি মনীষীদের উপরে উদ্ধৃত অভিমত থেকে। এখানে আর একজন বিদেশীয় মনীষীর অভিমত উল্লেখ করা গেল। শ্রীঅরবিন্দের নামের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য নাম হলো মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের নাম। এই বিদেশীয় মনীষী মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে বলেছেন: Gandhi is one of the greatest saints, Tagore one of the greatest poets of modern India, but Sri Aurobindo is one of the greatest thinkers; indeed he has attained incomparable triune greatness as poet, philosopher and saint.

সত্যের খাতিরে একথা বলা দরকার যে এক সময় শ্রীঅরবিন্দ সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে মানুষকে বিচার করতে হবে তার দু-চার বছরের কাজের দ্বারা নয়; কিন্তু সারাজীবন ধরে সাধনা করে মানুষ যা হয়ে উঠে তাই হবে তাকে বিচার করবার সত্য মাপকাঠি। মাত্র চার বছর কাল শ্রীঅরবিন্দ বাংলার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মধ্যে এক বছর তিনি ছিলেন আলিপুর জেলে। পণ্ডিচেরী যাবার পর দু'চার বছর রাজনীতির সঙ্গে তাঁর অল্পস্বল্প যোগ ছিল। এই অল্প কয়েক বছরের ক্রিয়া-কলাপ দ্বারা তাঁকে বিচার করা ঠিক নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য লেঙ্গলি (Langly) সাহেব শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একখানা ক্ষুদ্র কিন্তু উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখেছেন। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় বাংলার ভূতপূর্ব গভর্নর Marquis of Zetland'ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। বারীন্দ্রকুমার তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন কলকাতায় প্রদর্শনী-জাতীয় একটা অনুষ্ঠানে Lord Zetland উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানে যোগদান ছিল উপলক্ষ মাত্র; ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল

বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে নিভৃতে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা। বাংলার প্রথম গভর্নর লর্ড কারমাইকেল শ্রীঅরবিন্দকে দার্জিলিং-এ বাসস্থান ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের উপযোগী বৃত্তিদানের প্রস্তাব করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "লর্ড কারমাইকেল তাঁর লোক মারফৎ যে একটি প্রস্তাব করেন তাতে বলেন যে আমি যেন দার্জিলিং-এ গিয়ে থাকি। সেখানে তাঁর সঙ্গে দর্শন আলোচনায় আমাদের দিন কাটবে ভাল।" (কার্তিক, নভেম্বর ১৯৬০ দ্রষ্টব্য)। শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন নি—তাঁর তপস্যা ও সাধনা ত্যাগ ক'রে গভর্নমেণ্টের নজরবন্দী হয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু এ কথাটা লক্ষণীয় যে ভারতের পুলিশের মতে যিনি ছিলেন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক নম্বর শত্রু তাঁর সঙ্গ লাভের জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য আগ্রহান্বিত গুণগ্রাহী ইংরেজের অভাব সেকালেও ভারতে ছিল না।

শ্রীঅরবিন্দ তপস্যা করে কী হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ১৯২৮ সনে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণে তা অতি সুন্দর ভাষায় বলেছেন। তার পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেবল রবীন্দ্রনাথের একটা কথাই পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিই—রবীন্দ্রনাথের কথা শ্রীঅরবিন্দ আত্মাকেই সত্য করে চেয়েছিলেন এবং সত্য করে পেয়েছিলেন; তাই শ্রীঅরবিন্দের মুখশ্রীতে ও তাঁর দৃষ্টিতে এমন কিছু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যা তাঁকে একেবারে মুগ্ধ করেছিল। শ্রীঅরবিন্দের বিচার করতে হবে তাঁর চার বছরের কর্ম দ্বারা নয়, কিন্তু তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনার দ্বারা। আর একথাটাও স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দের ঐ চার বছরও ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, যৌবনের তপস্যার ক্ষেত্র—ভুলভ্রান্তি কিছু যদি থেকে থাকে তবে তা সত্ত্বেও তিনি সে যুগেও ছিলেন একজন মহান তপস্বী। যদি পরবর্তী পণ্ডিচেরী পর্বের তপস্যার সুযোগ শ্রীঅরবিন্দের জীবনে না-ও আসতো তবু তিনি, কৌঁসিলী দাস মশাইয়ের ভাষায়, Poet of Nationalism বলে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁর পণ্ডিচেরীর দীর্ঘ সাধনার ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রায় একজন অতিমানব—Superman, এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। সাধারণ লোককে বিচার করবার মাপকাঠি আর শ্রীঅরবিন্দকে বিচার করবার মাপকাঠি এক নয়। ধর্মাশোকই ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন; চণ্ডাশোককে লোকে ভুলে গেছে। শুধু কলকাতা পর্বের শ্রীঅরবিন্দের জীবনের অধ্যায়টুকু দ্বারা তাঁকে বিচার করলে ভুল করা হবে।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবন-দর্শন ও তার ভূমিকা

জীবন্-দর্শন কথাটির অর্থ

শ্রীঅরবিন্দ দার্শনিক ও যোগী

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া এই পুস্তকের লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র পুস্তক শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের ভূমিকা বই আর কিছু নয়। শ্রীঅরবিন্দের দর্শন না বলে কেন জীবন-দর্শন কথাটি ব্যবহার করা হলো প্রথমে সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। তিনি কেবল একজন দার্শনিক ছিলেন না; যদি তিনি কেবল দার্শনিক হতেন তবে তিনি শ্রীঅরবিন্দ হতেন না। অবশ্য দর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ The Life Divine প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে সমভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁকে পাশ্চাত্যের এক মনীষী বলেছেন ভারতের 'King of Thinkers', পাশ্চাত্যের অপর এক মনীষী Aldous Huxley তাঁর The Life Divine গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছেন: "I consider 'The Life Divine' a book not merely of the highest importance as regards its contents, but remarkably fine as a piece of philosophic and religious literature." শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় শুধু এই নয় যে, তিনি একজন দার্শনিক; তিনি আবার একজন যোগীও। এই দু'য়ের পার্থক্য কী?

তত্ত্বজ্ঞান ও তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার

মানুষ বুদ্ধিজীবী। বুদ্ধির পরিতৃপ্তি জ্ঞানে; তাই মানুষের অফুরন্ত জ্ঞান-তৃষ্ণা, সম্মুখের এই বিচিত্র জগৎ তার কৌতূহল জাগায়। কেবল বাইরের জগৎ নয়, তার অন্তর্জগৎকেও মানুষ জানতে চায় তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়: জগতের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে? জগৎ-স্রষ্টা কেউ আছেন কি? থাকলে তাঁর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী? মানুষ স্বরূপত কী? তার পরিণামই

বা কী ? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা থেকেই দর্শন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর দার্শনিক গ্রন্থসমূহে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রশ্ন হতে পারে: দর্শনের কাজ কী কেবল মানুষের জ্ঞানের পরিতৃপ্তি? একদল লোক আছেন যাঁরা জ্ঞানের পরিতৃপ্তিকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে করেন। দার্শনিকদের কেউ কেউ জ্ঞানের পরিতৃপ্তির অতিরিক্ত অন্য কিছু দর্শনের নিকট প্রত্যাশা করেন না। দার্শনিক কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ Philosopher—কথাটির অর্থ হলো 'জ্ঞান যার প্রিয়'। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ পাশ্চাত্য দর্শন ও ভারতীয় দর্শনের মধ্যে এই একটি পার্থক্য দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় দার্শনিক হলেন "a metaphysical thinker doubled with a yogi." (The Riddles Of This World, p.-28)—অর্থাৎ ভারতীয় দার্শনিক হলেন একধারে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু জ্ঞানী ও যোগী। দার্শনিকের লক্ষ্য তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ; আর যোগীর লক্ষ্য তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করা অর্থাৎ উপলব্ধি করা। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভারতীয় দর্শনে তত্ত্বালোচনার সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপায় অর্থাৎ যোগপথেরও উল্লেখ থাকতো। যে জ্ঞান আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক নয়, শ্রীঅরবিন্দের নিকট সে জ্ঞানের সমাদর ছিল না।

মানুষ বুদ্ধিজীবী। বিচার-বুদ্ধির বলেই প্রাণিজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু মানুষ তো কেবল বুদ্ধিজীবী নয়; সে আবার আদর্শবাদীও। পশুর ন্যায় শুধু বেঁচে থেকেই সে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। সে এখন যেমন আছে চিরদিনই তেমন থাকলে তার জীবন সার্থক হবে এ কথা সে মনে করে না। একটা উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করে জীবনে তাকে কিছু হয়ে উঠতে হবে—এই তার চিরদিনের কামনা ও সাধনা, তার 'eternal quest'। কবি ও দার্শনিকেরা বলেন, এবং শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন, মানুষ যেন একজন 'eternal piligrim'; কোন এক সুদূরের আহ্বান তাকে স্থির থাকতে দেয় না। অবশ্য শিক্ষা ও রুচির পার্থক্য অনুসারে আদর্শেরও পার্থক্য হয়ে থাকে—শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের আদর্শ এক নয়, একজন নাস্তিক ও একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসীর জীবনাদর্শ এক নয়। আমরা দেখবো শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অপর প্রধান গ্রন্থ The Synthesis of Yoga-এ মানব জীবনের বিভিন্ন আদর্শের বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর নিজস্ব পূর্ণজীবনের আদর্শেরও বিবরণ দিয়েছেন। তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়টিকে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন না বলে শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন বলাই সমীচীন। তিনি কেবল তত্ত্বজ্ঞানের কথাই শোনান নি, তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপায়ও দেখিয়েছেন

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে "শ্রদ্ধা"

মানুষের আদর্শের মূলে থাকে তার শ্রদ্ধা। গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" অর্থাৎ যার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেইরূপই হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ গীতার এই কথাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন; এবং তাঁর নানা গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে কথাটির উল্লেখ করেছেন। 'শ্রদ্ধা' কথাটির ব্যাখ্যা তিনি এইভাবে করেছেন: "a faith, a will-to-be, a belief in itself and existence." (Essays On The Gita. p.-429) অর্থাৎ মানুষ মনে-প্রাণে যা হতে চায়, নিজের আত্মা সম্বন্ধে, জগৎ ও জগৎকারণ সম্বন্ধে তার যেরূপ বিশ্বাস তা-ই হলো তার শ্রদ্ধা। দু'জন মানুষের শ্রদ্ধা যদি ভিন্ন হয়, তবে তাদের জীবনাদর্শও ভিন্ন হবে।

সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর 'The Life Divine' গ্রন্থের গোড়ায় বলেছেন যে মানুষ যেদিন থেকে অসভ্য অবস্থার ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তা করতে শিখেছে, সেদিন থেকেই সে বিশ্বাস করে এসেছে যে জগতের স্রষ্টা একজন ঈশ্বর আছেন, আর মানবের আত্মা অমর, এবং পরকাল সত্য। এই হলো সভ্য মানবের আদিম বিশ্বাস। তবে শ্রীঅরবিন্দ এ কথাও বলেন যে মানুষের ইতিহাসে বারবার এমন যুগ এসেছে যখন নাস্তিকতার জয় হয়েছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন নাস্তিকতার সে-জয় সাময়িক মাত্র। প্রতিবারই মানুষ আবার তার পূর্বেকার আদিম বিশ্বাসে ফিরে এসেছে, নাস্তিক্ মনোভাবকে মানুষ চিরদিন আমল দিতে পারে নি। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা: The ages of materialistic atheism have always been short-lived··· for that cannot be the last word of knowledge." (The Life Divine, p.-614) আবার তিনি তাঁর The Synthesis of Yoga গ্রন্থের ৫২২ পৃষ্ঠায় অনুরূপ কথা বলেছেন: "an age of strong materialism and scepticism is always followed by an age of···· mystical creeds, of new religions and profounder seeking after the Infinite and the Divine." বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের জয়-জয়কারের যুগ। আজ অনেক মানুষই তার আদিম শ্রদ্ধা হারিয়েছে। কিন্তু আজ মানুষের তৃপ্তি কোথায়? বরং নানা বিভীষিকার আশঙ্কায় আজ তার

মন আচ্ছন্ন, অবসন্ন। শ্রীঅরবিন্দের কথা সভ্য মানুষের আদিযুগের শ্রদ্ধাই—ঈশ্বরে, মানবাত্মার অমরত্বে ও পরলোকে বিশ্বাসই—তাকে আর সত্যিকার শান্তির পথ দেখিয়ে দিতে পারে ও দেবে।

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন ও দিব্যকর্মের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ সর্বমানবের সম্মুখে যে জীবনাদর্শ তুলে ধরেছেন তার নাম তিনি দিয়েছেন 'দিব্যজীবন' বা ' The Life Divine'। এই আদর্শের তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'The Life Divine' নামক প্রধান গ্রন্থে। আমরা এই পুস্তকে তার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো। আর শ্রীঅরবিন্দের মতে দিব্যজীবন লাভের উপায় হলো যোগ। তার ব্যাখ্যা তিনি করেছেন তাঁর The Synthesis of Yoga নামক গ্রন্থে। আমাদের দেশে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি নানা যোগমার্গ বহুকাল ধরে প্রচলিত আছে। সাধারণত ঐ সকল যোগমার্গের কোন একটির উপরই ঝোঁক দেওয়া হয়ে থাকে; এবং বিভিন্ন যোগ-পন্থার সমর্থকদের মধ্যে বিরোধের অন্ত নাই। যথা জ্ঞানী ভক্ত ও কর্মীর বিরোধী; এবং ভক্ত আবার জ্ঞানযোগের ও কর্মযোগের বিরোধী। আমরা দেখবো শ্রীঅরবিন্দের মতে বিভিন্ন যোগমার্গ পরস্পর বিরোধী নয়, একে অন্যের সহায়ক। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য—যোগীদের অনেকের মতে যোগ-পথের প্রথম সোপান হিসাবে কর্মের মূল্য থাকলেও মুক্তজীবের পক্ষে কর্ম অনাবশ্যক। আমরা দেখবো শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের এই একটি মূল কথা যে মুক্তকেও আমরণ কর্ম করতে হয়। এবং সে কর্ম হলো 'মুক্তস্য কর্ম' বা 'দিব্যকর্ম'। এই দিব্যজীবন ও দিব্যকর্ম শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের দু'টি প্রধান কথা, এবং এই পুস্তকে আমাদের সর্বশেষ ও সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীবন-দর্শনের ভূমিকা

দর্শনের ভূমিকা

দর্শন-শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হলো জগৎ-সৃষ্টি, জগতের স্রষ্টা এবং জগৎ-স্রষ্টার সঙ্গে জীবের সম্পর্ক ও জীবের পরিণাম প্রভৃতি। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত কী তা দেখবো।

সেই দার্শনিক আলোচনার ভূমিকা হিসাবে কতকগুলি প্রশ্নের আলোচনা প্রথমে আবশ্যক। যথা বিজ্ঞান ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী কী এবং দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী? দর্শনশাস্ত্র যে সত্যের সন্ধান করে তার স্বরূপ কী? দার্শনিক সত্যনির্ণয়ে প্রমাণ বলে কী গ্রাহ্য করেন? বিচার-বুদ্ধির সাহায্যেই কি সব সত্য জানা যায়? যদি না যায় তবে বিচার-বুদ্ধির অতিরিক্ত জানবার কোন উপায় আছে কি? তার প্রকৃতি ও মূল্যই বা কী? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পরিচ্ছেদে এই সব প্রশ্ন আমাদের আলোচ্য। শ্রীঅরবিন্দও এইসব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং উত্তরে তিনি কী বলেছেন তা আমরা দেখবো।

বিজ্ঞান ও দর্শন

প্রথমে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রকৃতি, আর জীবনে বিজ্ঞান দর্শনের মূল্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মতের একটু উল্লেখ করা যাক্। বিজ্ঞানের আলোচ্য প্রধানত এই দৃশ্যজগৎ। জগতের আলোচনা বিভিন্ন দিক থেকে সম্ভব। বিভিন্ন বিজ্ঞানে জগতের এক একটি বিশেষ দিকের আলোচনা হয়ে থাকে; তাই বিজ্ঞান বহুবিধ; যথা ভূতত্ত্ব, জ্যোতিঃশাস্ত্র, প্রাণ-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি। সকল দর্শনের আলোচ্য হলো দৃশ্যজগতের পিছনে যেসব চরমতত্ত্ব বিদ্যমান সেইসব তত্ত্ব—যথা জগতের স্রষ্টা, জগতের ভোক্তা জীব ও জগৎ স্বরূপত কী তার আলোচনা। দর্শনের ইংরেজী নাম Metaphysics কথাটির অর্থ (Meta=after, Physics=Nature)। শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন 'intellectual expression of the Truth'. (The Riddles Of This World p.-26)। এখানে The Truth বলতে তিনি বোঝেন বিশ্বজগতের অতীত চরমতত্ত্ব সমূহ—ঈশ্বর, জীবাত্মা প্রভৃতি। ঐসব তত্ত্বের জ্ঞান-লাভ কী উপায়ে সম্ভব, সেই প্রশ্নের বিচার একটু পরে আমাদের করতে হবে; এখানে দর্শনশাস্ত্রের কাজ বুদ্ধিজীবী মানুষের বোধগম্য ভাষায় ঐসব তত্ত্বের ব্যাখ্যা, শ্রীঅরবিন্দের এই মতটিরই উল্লেখ করা গেল। দর্শন হোল এক, বিজ্ঞানের ন্যায় বিবিধ নয়।

শ্রীঅরবিন্দ বিজ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। বিজ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত সংক্ষেপে এই: বিজ্ঞানের চর্চার অভাবে পার্থিব জীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে—ভারতবর্ষই তার দৃষ্টান্ত। আর বিজ্ঞানের কল্যাণে জনগণের অগ্রগতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় পাশ্চাত্য জগতে। কিন্তু বিজ্ঞানের মূল্য স্বীকার করলেও বিজ্ঞান যে একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ এ কথাটাও তিনি খুব জোর দিয়েই বলেছেন।

তাঁর কথা বৈজ্ঞানিক জড়জগতের অতীত, আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বা প্রত্যক্ষের বাইরের পদার্থ নিয়ে মাথা ঘামান না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে জড়জগৎই একমাত্র সত্য নয়; জড়জগতের অতীত যেসব supra-physical পদার্থ বিদ্যমান (এবং যা হলো দর্শনের বিষয়বস্তু) তাদের সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞান কিছু জানে না। এই কথাটাই খুব জোর দিয়ে তিনি বলেছেন যে জড়জগতের অতীত পদার্থসমূহ সম্বন্ধে—অর্থাৎ ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান সম্বন্ধে "all science put together is a bagatelle" বা ছেলেখেলা (The Riddles Of This World p.-43)। মনে হতে পারে শ্রীঅরবিন্দের বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই অভিমত অত্যন্ত অসংগত। আজকার বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে বিজ্ঞানের মূল্য অস্বীকার করা তো অন্যায় স্পর্ধা বলেই বিবেচিত হবার সম্ভাবনা। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মূল্য শ্রীঅরবিন্দ অস্বীকার করেন না। তাঁর কথা, বৈজ্ঞানিক যতদিন প্রত্যক্ষ জগতের বাইরের চরমতত্ত্ব সমূহ সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন ততদিন বৈজ্ঞানিকের কাছে প্রত্যক্ষের অতীত তত্ত্বসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান আশা করা যায় না। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক না কেন ঐসব তত্ত্ব ততদিন বৈজ্ঞানিকের অনায়ত্ত থাকবে।

তবে শ্রীঅরবিন্দ আশা করেন ভবিষ্যতে বিজ্ঞান এই অসম্পূর্ণতার উর্ধ্বে উঠবে। তাঁর কথা এই যে 'the very soul of science is search for knowledge, and it will be unable to cry a halt'. অর্থাৎ জ্ঞান-স্পৃহা ও জ্ঞানের সন্ধানই হলো বিজ্ঞানের প্রাণ; এবং এই সন্ধান-কার্যে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আর অগ্রসর না হওয়া, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত থামা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হবে না। বিজ্ঞানের জ্ঞানানুসন্ধান চলতেই থাকবে; কোনোদিন তার বিরাম হবে না; এবং প্রত্যক্ষের অতীত তত্ত্বসমূহও ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু বলে পরিগণিত হবে। তার একটু সূচনা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে—বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেউ কেউ Hypnotism, Clairvoyance, Telepathy প্রভৃতি ব্যাপারের অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক রীতিতে করার প্রয়োজন অনুভব করছেন (The Life Divine p.-15) অন্যত্র (Synthesis of Yoga p.-517) তিনি বলেছেন: Future science delivered from its sole pre-occupation with the material world may re-discover the truths of the supra-material world behind

the material world; অর্থাৎ (যেদিন ভবিষ্যতে বিজ্ঞান জড়জগতের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না সেদিন জড়ের অতীত চরমতত্ত্ব সমূহ বিজ্ঞানের নিকট অনাবিষ্কৃত থাকবে না। সেবদিন বিজ্ঞানে আর দর্শনে হবে "কোলাকুলি"। আর এ কথা সত্য যে বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হতে থাকে ততই তার আলোচ্য বিষয় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম হতে থাকে; অর্থাৎ বিজ্ঞান তখন প্রায় দর্শনের সীমায় উপনীত হয়।)

আমাদের দেশের স্বনাম-ধন্য বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু মশাই বিজ্ঞান ও দর্শনের "কোলাকুলির" প্রমাণ। উদ্ভিদের প্রাণের সাড়া পর্যবেক্ষণ করতে করতে তিনি এই সত্য আবিষ্কার করেন যে কেবল উদ্ভিদদেহে নয়, প্রাণী দেহের ন্যায় জড়দেহেও প্রাণ-শক্তির অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। নিজের তৈরী সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির সাহায্যে তা তিনি প্রমাণ করেন: এবং ইউরোপ ও আমেরিকায়ও তাঁর এই আবিষ্কার যন্ত্রের সাহায্যে সত্য প্রমাণিত হয়। তিনি যন্ত্রসাহায্যে দেখালেন যে চেতন-পদার্থের ন্যায় জড়-পদার্থেরও যেন ক্লান্তি আসে। তিনি দেখালেন জড়-যন্ত্রগুলি ব্যবহারের ফলে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, পুর্ববৎ কাজ দিতে পারে না; আবার কিছুকাল বিশ্রামের পর কাজ দিতে সক্ষম হয়। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে উদ্ভিদ, প্রাণী ও জড় জগতে একই প্রাণশক্তি কাজ করছে; এটি একটি দার্শনিক সত্য, এবং এখানে বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র দার্শনিকের কোঠায় উপনীত হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দও জীবনের সর্বস্তরে প্রাণের প্রকাশ দেখতে পান। জগদীশচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ যেন কঠোপনিষদের এই কথাটিরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন:

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্।"

অর্থাৎ "এই যাহা কিছু চরাচর বস্তু দৃষ্ট হয় পরব্রহ্ম আছেন বলিয়াই সেই সমস্ত তাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া স্পন্দিত হইতেছে।" (কঠোপনিষদ্ ২।৩।২, স্বামী গম্ভীরানন্দের ব্যাখ্যা)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "মানুষের ধর্ম" পুস্তকে কঠোপনিষদের উপরোক্ত শ্লোকার্ধটির ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন: "যা কিছু সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণে কম্পিত হচ্ছে।"

জগদীশচন্দ্র বসু পশ্চিমের এক বৈজ্ঞানিকদের সভায় (তাঁর উপরোক্ত আবিষ্কার যন্ত্রসাহায্যে প্রমাণিত করার পর) যা বলেছিলেন তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকদের বলেছিলেন: "ত্রিশ শত বছর আগে গঙ্গা নদীর তীরে আমাদের যেসব পুর্বপুরুষ এই সত্যের

সন্ধান পেয়েছিলেন যে, সর্বজগতে একই প্রাণশক্তির কাজ চলছে তাঁরাই মূল সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, অপরেরা পান নি।" বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের এই উক্তি পাশ্চাত্য জগতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এখানে বিজ্ঞান ও দর্শনের ঐক্য দেখা গেল।

বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে মূলত যে কোন বিরোধ নেই নানা স্থানেই শ্রীঅরবিন্দ সেকথা বলেছেন। তাঁর The Life Divine গ্রন্থের ১৫শ পৃষ্ঠায় আছে: "Nothing can be more remarkable and suggesitive than the extent to which modern science confirms in the domain of Matter the conceptions······arrived at, by a very different method,·· ···in the Upanishads. And these, on the other hand, often reveal their full significance, their richer contents only when they are viewed in the new light shed by the discoveries of modern science—for instance, that vedantic expression which describes things in the cosmos as one seed arranged by the Universal Energy in multitudinous forms······(Swetaswatara Upanishad VI 12.)" অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞান উপনিষদের ঋষিদের দার্শনিক মতসমূহ যেভাবে সমর্থন করে তার চেয়ে বিস্ময়কর আর কিছু হতে পারে না। বৈজ্ঞানিকের ও উপনিষদের ঋষিদের আলোচনা-রীতি স্বতন্ত্র (বৈজ্ঞানিকগণের আলোচনা সুরু হয় জড়জগতের দিক থেকে ; আর ঋষিগণ অন্তরের দিক থেকে, আত্মার দিক থেকে আলোচনা সুরু করতেন)। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির নতুন আলোকে ঋষিদের মতগুলির আলোচনা করলে অনেক সময় ঋষিদের ঐ মতগুলির প্রকৃত মর্ম বোঝা সম্ভব হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ (শ্রীঅরবিন্দ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন। ঐ শ্লোকে বলা হয়েছে যে একটি মাত্র বীজ থেকে এক সর্বব্যাপী শক্তি বিশ্বের বিচিত্র রূপের বিকাশ করেছেন। শ্বেতাশ্বতর ঋষির মতে আদিতে সমস্তই বীজরূপে ব্রহ্মে নিহিত ছিল। ব্রহ্মের ইচ্ছায় তা নামে এবং রূপে বিভিন্ন সত্তায় প্রকটিত হল।) ব্রহ্মকে যাঁরা স্ববুদ্ধিতে দেখেন তাঁদেরই শাশ্বত সুখ হয়, অপরের নয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ The Life Divine গ্রন্থে ঐ পৃষ্ঠায় আরো বলেছেন: Significant especially is the drive of Science towards a Monism, which is

consistent with multiplicity, towards the vedic idea of the one essence with its many becomings. অর্থাৎ বেদের ঋষিগণ দেখেছিলেন একই মূল পদার্থ বহুরূপে অভিব্যক্ত হয়; বিজ্ঞানের গতিও সেই মূল একতত্ত্ববাদের বা অদ্বৈতবাদেরই দিকে। জগতের মূল তত্ত্ব দুই নয়, এক।

কথাটার আরো একটু আলোচনা দরকার। জগতের পিছনে যে মূল শক্তি বা তত্ত্ব সক্রিয়-তা এক, না দুই, না বহু? দর্শনশাস্ত্রে সে প্রশ্নের আলোচনা হয়ে থাকে। আধুনিক ইউরোপীয় জড়বিজ্ঞান আর ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দর্শন বেদান্ত দুইটি ভিন্ন দিক থেকে আলোচনা স্বরু করে শেষ পর্যন্ত একই অদ্বৈত তত্ত্বে উপনীত হয়েছে। এক সময় ইউরোপীয় বিজ্ঞান জগতের পিছনে নানারকম elements বা মৌলিক পদার্থের কল্পনা করেছিল; আজ বিভিন্ন elements যে এক মূল পদার্থেরই বিভিন্ন রূপ, তা ইউরোপীয় বিজ্ঞানে স্বীকৃত। সাধারণ মানুষ Matter (জড়) ও Mind (চিৎ) দুইকে দুটি বিভিন্ন জাতের পদার্থ মনে করে। এ দুয়ের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে জড়বিজ্ঞান আর ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত যে এক সে প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন: "Materialistic science asserts that Mind cannot be another force than Matter, but must be merely development and outcome of material energy. Indian thought at its deepest affirms, on the other hand, that Mind and Matter are rather the different grades of the same energy." এখানে Materialistic science বলতে শ্রীঅরবিন্দ অবশ্য জড়বাদী দর্শনশাস্ত্রের কথাই বলেছেন। ইউরোপীয় জড়বাদী দার্শনিক ও ভারতীয় দার্শনিকের চরম সিদ্ধান্ত এই যে জগতের পিছনের মূল তত্ত্ব এক। তবে জড়বাদীর মতে সেই চরমতত্ত্ব হলো জড় এবং মন জড়েরই প্রকারভেদ মাত্র; আর ভারতীয় দর্শনে সেই চরমতত্ত্বকে বলা হয় চিৎ বা এক চেতন-শক্তি অর্থাৎ মন। শ্রীঅরবিন্দের জড় ও চেতনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমাদের একথাটার পুনরুল্লেখ করতে হবে।

সত্যের একটি সংজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রমাণ

দর্শনের বিষয়বস্তু জীবজগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে দার্শনিককে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়—সত্য কী, এবং যা সত্য তা আমরা জানি কী প্রকারে? দ্বিতীয় প্রশ্নটি অন্য ভাবেও করা যায়—জ্ঞানের প্রমাণ কী এবং আমাদের জ্ঞানের দৌড় কতদূর পর্যন্ত?

(দার্শনিকগণ সত্যের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে থাকেন। আমাদের সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে লোকমান্য তিলক তাঁর "গীতা-রহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র" গ্রন্থে সত্যের একটি সংজ্ঞা মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। সেই সংজ্ঞাটি স্মরণ রাখলে আমাদের কাজে লাগবে। সংজ্ঞাটি এই :

সত্যং নামাব্যয়ং নিত্যম্ অবিকারী তথৈব চ।

অর্থাৎ "যাহা অব্যয় অর্থাৎ যাহা কখন বিনাশ পায় না, নিত্য অর্থাৎ চিরকাল সমান থাকে এবং অবিকারী অর্থাৎ যাহার পরিবর্তন কখনই হয় না তাহাই সত্য।") (লোকমান্যের গীতারহস্য ২২১ পৃঃ)

জ্ঞানের প্রমাণ কী এই প্রশ্নটি বিশেষভাবে ন্যায়দর্শনে আলোচিত হয়েছে। ন্যায়দর্শনে চারিটি প্রমাণ স্বীকৃত—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। আমরা যা চোখে দেখি, কানে শুনি, অর্থাৎ আমাদের পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য-জগতের যে জ্ঞান লাভ করি তা হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অনুমানের সহজ দৃষ্টান্ত এই : একস্থান থেকে ধোঁয়া আস্‌ছে, তা দেখে আমরা অনুমান করি ওখানে আগুন ধোঁয়ার মূলে রয়েছে। অনুমানের ভিত্তি প্রত্যক্ষ। উপমানও এক প্রকারের অনুমান। দুটি জিনিসের মধ্যে অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা গেলে আলোচ্য অপর একটি বিষয়েও তাদের মধ্যে ঐক্য থাকার সম্ভাবনা—এরূপ অনুমানকে উপমান বলা হয়। কেউ কেউ উপমানকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ মনে না করে তাকে অনুমানেরই এক প্রকারভেদ বলে গ্রহণ করে। শেষ বা চতুর্থ প্রমাণ শব্দে কথাটির অর্থ শ্রুতিবাক্য বা আপ্তবাক্য অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বাক্য। সকল হিন্দু-দর্শনে শ্রুতিবাক্য অভ্রান্ত প্রমাণ বলে গৃহীত। যে দর্শন, যথা বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন, বেদকে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে না তা 'হিন্দু-দর্শন' এই পদবাচ্য নয়। হিন্দু-দর্শনের মতে যুক্তিবিচারে যা সত্য বলে মনে হয়, শ্রুতিবিরোধী হলে তা-ও অগ্রাহ্য। এককথায় যা প্রত্যক্ষ তা আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানি। যা প্রত্যক্ষ নয় তা যুক্তিসংগত বিচারের বা অনুমানের সাহায্যে জানতে পারি। আর যা প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়ের অগোচর তার অনেক কিছু শ্রুতিবাক্য ও আপ্তবাক্য থেকে জানা যায়—এই হলো অধিকাংশ হিন্দু-দর্শনের মত।

জ্ঞানের প্রমাণ কী, এই প্রশ্নের অবতারণা শ্রীঅরবিন্দকে করতে হয়েছে; তিনি তার উত্তরও দিয়েছেন। তা আমাদের দেখতে হবে।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দুটি মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন—প্রত্যক্ষ আর প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত অনুমান। অবশ্য নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে থাকেন—চর্ম-চক্ষে যা দেখা যায় না বৈজ্ঞানিক অনুবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে তা প্রত্যক্ষগোচর করে থাকেন। তারপর এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তির উপর তাঁর মার্জিত বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা অর্থাৎ যুক্তি-সংগত অনুমানের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক তাঁর জ্ঞানের প্রসার করে থাকেন। প্রত্যক্ষের বাইরে যা, কিংবা প্রত্যক্ষের ভিত্তির উপর অনুমানের সাহায্যে যা অলভ্য, তার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষের অতীত ঐ সকল বিষয়ই তো দার্শনিকের আলোচ্য। Metaphysics কথাটির অর্থই যে তাই। দর্শন বা Metaphysics-এর বিষয়বস্তু ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি তো প্রত্যক্ষ-গোচর নয়; এবং নয় বলে অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে সেখানে যুক্তি-বিচার আর অনুমানের প্রয়োগের অবকাশই বা কোথায়? তবে কি ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়? উত্তরে অজ্ঞেয়-বাদী বলবেন, "না, সম্ভব নয়। (ঈশ্বরকে আমরা জানি না, কোনদিন জানবোও না।" তবে কি "More light" আরো আলো চাই; কিছুই জানা গেল না", এই আপসোস নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করাই মানুষের অদৃষ্টলিপি?

ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয় জানবার উপায়—Intuition বা সাক্ষাদ্দর্শন

শ্রীঅরবিন্দ তা মনে করেন না। ভারতীয় কোন কোন ঋষিও তা মনে করতেন না; যদি করতেন তবে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি জোর গলায় বলতেন না "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্"—আমি সর্বব্যাপী এই পুরুষকে জানি। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি তত্ত্ব ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের অতীত সন্দেহ নেই; তা সত্ত্বেও ঐসব তত্ত্ব জানবার শক্তি মানুষের অন্তরেই রয়েছে—এই হলো শ্রীঅরবিন্দের মত। সেই শক্তি কী? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতও উল্লেখযোগ্য। তিনিও একই কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথা এই যে বাইরে যা প্রকাশিত তা জানবার জন্য আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রয়েছে; তেমনি যা গূঢ় বা গভীর (স্মরণীয় যে ধর্মের তত্ত্ব নিহিতম্ গুহায়াং) তাকে উপলব্ধি করবার জন্যও আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। মানুষের সেই শক্তি বা অন্তরিন্দ্রিয় হলো পবিত্র অন্তরের সাক্ষাদ্দর্শনের বা অপরোক্ষানুভূতির শক্তি। ইংরাজীতে এই অপরোক্ষানুভূতিকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন Spiritual experience; এবং তার প্রাথমিক অবস্থাকে তিনি বলেছেন intuition। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে

বারবার Spiritual experience ও intuition কথা দুটির ব্যবহার হয়েছে। intuition-এর প্রকৃতি ও মূল্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন হবে। Intuition-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ 'সাক্ষাদ্দর্শন' কথাটি তাঁর "ধর্ম ও জাতীয়তা" গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি, অনুভূতি, বোধি, অন্তর্জ্ঞান প্রভৃতি কথাগুলিও ঐ intuition কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছেন "হৃদয়ের স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধ-শক্তি।" এভাবে যে জ্ঞান লাভ হয় তা-ও একপ্রকারের প্রত্যক্ষ জ্ঞান—সাক্ষাদ্দর্শন ও অপরোক্ষানুভূতি কথা দুটির অর্থই তাই।

সাক্ষাদ্দর্শনের দৃষ্টান্ত

অপরোক্ষানুভূতি বা সাক্ষাদ্দর্শন অর্থাৎ intuition সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: উপনিষদের ঋষিগণের জীবন ছিল পূত-জীবন। তাঁরা শব্দ বা অপৌরুষেয় বাণী শুনবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষি বুদ্ধির সাহায্যে বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন একথা ঠিক নয়; বেদমন্ত্র তাঁরা শুনেছিলেন, অর্থাৎ বেদমন্ত্র তাঁদের নিকট প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রুতি শব্দের মর্মার্থও তা-ই। (ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি উদ্দালক আরুণি-পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন, শ্রদ্ধস্ব সোম্যেতি"। আরুণির উপদেশ এই যে সত্যকে শ্রদ্ধান্বিত বিচার দ্বারা বুঝতে হয়; তপস্যা বা সাধনা-প্রসূত অনুভব দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়। ঋষি তাঁর সাধনাপূত জীবনের অন্তর্দৃষ্টি বা সাক্ষাদ্দর্শনের বলে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে ঈশ্বর ও জীব এক; এবং বারবার নানা ভাবে তিনি পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝিয়ে দিলেন "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—শ্বেতকেতু, তুমিই সেই। শ্রীঅরবিন্দ বলেন বেদের মহাকাব্যগুলি—"তত্ত্বমসি", "সোঽহং", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "একমেবাদ্বিতীয়ং", "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ঋষিদের সাক্ষাদ্দর্শনের দৃষ্টান্ত। এবং উপনিষদের এইসব ঋষি আমাদের দেশে mystic-এর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত।)

Intuition-এর প্রকৃতি

Intuition প্রসঙ্গে স্বভাবতই দুটি প্রশ্ন মনে আসে; যথা, intuition-এর প্রকৃতি ও intuition-এর মূল্য। intuition-এর প্রকৃতি প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন: "intuition brings to mind those brilliant messages from the unknown which are the beginning of higher knowledge." এই বর্ণনা থেকে তিনটি জিনিস জানা যায়। প্রথমত intuition বাক্য মনের

অতীত অজানা রাজ্যের সংবাদ আনে। দ্বিতীয়ত intuition যে সংবাদ আনে তা উজ্জ্বল, সুস্পষ্ট, অতএব নির্ভরযোগ্য। তৃতীয়ত intuition মানবের উচ্চতর অর্থাৎ পূর্ণ-জ্ঞানের গোড়া-পত্তন মাত্র ; intuition জ্ঞানের শেষ কথা নয়। intuition হলো মনের ব্যাপার, এবং আমরা দেখবো শ্রীঅরবিন্দের মতে মানব-মনের পক্ষে চরম জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। কথাগুলি একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

আমাদের মন ও বিচার-বুদ্ধি কেন পূর্ণ জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে না সে কথার আলোচনা আমাদের যথাস্থানে করতে হবে ; এখানে intuition-এর প্রকৃতি সম্বন্ধে এ কথাটা বলা দরকার যে intuition হলো inspiration ও revelation-এর সমজাতীয় জিনিস। (inspiration বলতে বোঝায় যা বাইরে থেকে ভিতরে নেওয়া হয়, যেমন প্রশ্বাস। মনের বাইরে থেকে যে জ্ঞান মনের ভিতরে আসে তা হলো inspiration-এর দৃষ্টান্ত। বেদ, বাইবেল ও কোরানকে inspired writing বলা হয় এইজন্য যে ঋষিগণ, খ্রীষ্ট-শিষ্যগণ কিংবা মহম্মদ বুদ্ধির সাহায্যে, অনেক ভেবে-চিন্তে বেদ, বাইবেল বা কোরান রচনা করেছিলেন, এ কথা ঠিক নয় ; তাঁরা inspired হয়ে অর্থাৎ বাইরের দৈব-শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বেদ প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। প্রকৃত কবি তাঁর কাব্য-রচনা-কালে, চিত্র-শিল্পী তাঁর চিত্র-অঙ্কনে, ভাস্কর তাঁর মূর্তি-গঠনে অনেক সময় অনুভব করেন বাইরের কোন শক্তি যেন তাঁর মনে ভাব যোগায়, তাঁর দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। intuition-এর বেলায়ও একথা সত্য।)

Spiritual experience ও Intuition-এর মূল্য

গোড়াতে এই কথাটা বলা দরকার যে intuition-এর মূল্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৈজ্ঞানিকের মতে ক্রমবিকাশের ধারায় চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ হলো মানবের বিচার-বুদ্ধি বা reason ; এবং reason governing thought and conduct—এই হলো আদর্শ জীবনের পরিচায়ক এবং ক্রমবিকাশের ধারার লক্ষ্য। বৈজ্ঞানিকের মত এই যে Mystic-গণ intuition-এর উপর নির্ভর করে "live in a land of chimeras" ; অর্থাৎ তাঁরা এক অবাস্তব কল্পলোকে বাস করেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন বৈজ্ঞানিকের এই মত যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা ভ্রান্ত। তাঁর কথা : This judgment proceeds from a false perception of the material as alone real and the outward life as alone of

importance (The Life Divine p.-785) Intuition বা সাক্ষাদ্দর্শনের মূল্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত এই : আমরা সচরাচর যা চোখে দেখি সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ—আমরা যখন বলি এ আমার স্বচক্ষে দেখা, তখন এ কথাটাই বলতে চাই যে সে বিষয়ে আমাদের মনে অবিশ্বাসের কোন অবকাশ নেই। Spiritual experience বা intuition এরূপ একটি নির্ভরযোগ্য জিনিস। এই সম্বন্ধে তিনি তাঁর Essays on the Gita গ্রন্থের ৩২৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন: Spiritual consciousness is much more tremendously real than any mental perception of the thinkable or any sensuous experience of the sensible. অর্থাৎ চিন্তার গোচর কিংবা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচর কোন বিষয়ের জ্ঞান অপেক্ষা spiritual consciousness অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাক্ষাদ্দর্শনের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান আরো অনেক বেশী সত্য।

এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এক ভক্তের নিকট যা লিখেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর ভক্তটি এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে Supermind সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ যা বলেন তা অতি দুর্বোধ্য; কেউ তা বোঝেও না, বিশ্বাসও করে না। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে লিখেছিলেন যে একটিও লোক যদি Supermind সম্বন্ধে তাঁর কথা বিশ্বাস না করে তবু তাঁর নিজের বিশ্বাস বিন্দুমাত্র শিথিল হবে না, কারণ Supermind যে তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভবের বিষয়, অর্থাৎ Spiritual experience বা intuition; তাই Supermind-এর সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "ধর্ম ও জাতীয়তা" গ্রন্থে বলেছেন "আধ্যাত্মিক অনুভূতি" বা সাক্ষাদ্দর্শনই হলো জ্ঞানের 'অন্তিম প্রমাণ' অর্থাৎ যার উপর আর কথা চলে না।

সাক্ষাদ্দর্শন লাভের উপায়

শ্রীঅরবিন্দের কথা "সাক্ষাদ্দর্শন যোগেই লভ্য।" অর্থাৎ যোগ-পূত চিত্তেই কেবল তা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, যে সংযতচিত্ত যোগীগণ এই আত্মাকে দেহে অবস্থিত দেখেন; কিন্তু যত্ন করলেও "অকৃতাত্মা" অর্থাৎ অবিশুদ্ধ অবিবেকী ব্যক্তিরা আত্মাকে দেখতে সমর্থ হয় না। 'অকৃতাত্মা' কথার অর্থ হলো যার বুদ্ধি অসংস্কৃত, অর্থাৎ যার চিত্ত অবিশুদ্ধ। কঠোপনিষদেও বলা হয়েছে: 'যে ব্যক্তি দুরাচার থেকে বিরত হয় নি, শান্ত সমাহিত হয় নি, সে আত্মাকে জানতে পারে না।" বস্তুত কেবল পূতচরিত্র যোগীই সাক্ষাদ্দর্শনের অধিকারী।

যদি অসংযত-চরিত্র প্রত্যেক ব্যক্তি সত্যের সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করেছে বলে দাবি করে তবে, শ্রীঅরবিন্দ বলেন, life will become intolerable—জীবন দুর্বহ হয়ে উঠবে। ইতিহাসে দেখা যায় অনেক "কালা-পাহাড়"ই এই সাক্ষাদ্দর্শনের দোহাই দিয়ে জগতে বিপর্যয় ঘটায়।

পূর্বে বলা হয়েছে intuition জ্ঞানের শেষ কথা নয়। আমাদের মনের ভ্রান্ত সংস্কারসমূহ অনেক সময় intuition-এর আলোকে ম্লান আবিল করে থাকে। আমাদের দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে শ্রীঅরবিন্দ একথার সমর্থন পেয়েছেন।

কবি ও মনীষী

উপনিষদে কবি ও মনীষী কথা দুটির উল্লেখ দেখা যায়। কবি হলেন seer বা সত্যদ্রষ্টা ঋষি, যিনি তাঁর পুতচিত্তের intuition-এর সাহায্যে সত্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। মনীষী হলেন বুদ্ধিজীবী, সত্য নির্ণয়ে যাঁর প্রধান সম্বল তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি। অর্থাৎ মনীষী কবির ন্যায় সত্যদ্রষ্টা নন। আমাদের দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের আদিযুগ হলো বেদ ও উপনিষদের যুগ, সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের যুগ। সেই আদিযুগে যুক্তি-বিচার অপেক্ষা উপলব্ধির মূল্যই ছিল অধিক—এই হলো শ্রীঅরবিন্দের অভিমত। তিনি বলেন একথা সত্য সেকালে রাজাদের অনেকে ছিলেন ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভে আগ্রহশীল। তাঁরা নিজেরা ব্রহ্ম-বিদ্যার অনুশীলন করতেন, সময় সময় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁদের শরণাপন্ন হতেন; এবং রাজসভায় অনেক সময় ঋষিদের সম্মিলন হতো। কিন্তু ঐসব সভায় যুক্তি-বিচার, তর্ক-বিতর্ক বলতে যা বোঝায় তার স্থান ছিল না—তর্ক দ্বারা অপরের মত খণ্ডন করে স্ব-মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কেউ করতেন না। ঋষিগণ পরস্পরের উপলব্ধির তুলনা করতেন। হয়তো এক ঋষির উপলব্ধি অপরের উপলব্ধি অপেক্ষা উজ্জ্বলতর, শ্রেষ্ঠতর বলে স্বীকৃত হতো। এইভাবে পরস্পরের উপলব্ধির তুলনা করে, তর্ক-বিতর্কের দ্বারা নয়, ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধ সত্যের সন্ধান মিলতো। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় এবং তাঁর ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যায় একথা বলেছেন।

তাঁর এমতের সমর্থনে শ্রীঅরবিন্দ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত জনক-রাজার সভায় বিখ্যাত সমাবেশের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। ঐ সমাবেশে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে বহু ঋষির নিকট প্রমাণ করতে হয়েছিল যে তিনি শ্রেষ্ঠ

ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁকে বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে কারো সঙ্গে তর্ক করে স্বমত প্রতিষ্ঠা করতে হয় নি। ঋষিরা যাজ্ঞবল্ক্যকে যেসব প্রশ্ন করেছিলেন তার ধরন ছিল এই রকম: "আচ্ছা, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি এ বিষয়ে কী জানেন?" ঋষিগণ যাজ্ঞবল্ক্যের নিশ্চিত উপলব্ধির কথা জানতে চেয়েছিলেন। তাঁর উত্তর শুনে ঋষিগণ যাজ্ঞবল্ক্যের উপলব্ধির সত্যতা ও শ্রেষ্ঠতা বুঝতে পারলেন, এবং তর্ক-বিতর্কের সাহায্যে যাজ্ঞবল্ক্যের মত খণ্ডন করবার চেষ্টা না করে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ বলে মেনে নিলেন। বস্তুত সেই আদিযুগ ছিল সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের সাক্ষাদ্দর্শনের যুগ।

পরবর্তী যুগে ঋষিসুলভ সত্যদৃষ্টির অভাবে চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে আগেকার মতন কারো আর সুস্পষ্ট অনুভূতি-লাভ সম্ভব হতো না। বিশেষত আদিযুগের ভাবধারা ও ভাষা পরবর্তী যুগের লোকদের নিকট সহজ-বোধ্য রইল না। অথচ আদিযুগের ঋষিগণের উপলব্ধ সত্যসমূহই আর্যজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বেদ বলে পরিগণিত ছিল। যেযুগে লেখার প্রচলন ছিল না, সেযুগে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ সহ সমগ্র বেদ মুখে মুখে রক্ষা করা হতো। এই ব্যবস্থায় বেদের বিকৃতি ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। যাতে কোন বিকৃতি না ঘটে তার জন্য আর্যদের আপ্রাণ চেষ্টা থেকেই প্রমাণ হয় বেদ আর্যদের নিকট কী পরম সম্পদ রূপে পরিগণিত ছিল। পরবর্তী যুগে স্বভাবতই আদিযুগের সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের উপলব্ধ সত্যসমূহ সত্যদৃষ্টিহীন বুদ্ধি-মাত্র-সম্বল লোকদের নিকট তাদের বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখা দিল। ফলে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগের—দর্শনের যুগের, উদয় হলো। শ্রীঅরবিন্দের মতে দর্শনের সংজ্ঞা intellectual expression of the Truth। এযুগের দার্শনিকদের কাজ হলো পূর্ববর্তী যুগের ঋষিদের উপলব্ধ সত্যসমূহ যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন প্রথম প্রথম দার্শনিকগণ ঋষিদের কবিদৃষ্টি ও নিজেদের বিচার-বুদ্ধির মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতেন—বেদ উপনিষদের উক্তির উপরই নিজেদের যুক্তিগুলি স্থাপিত করতেন। আমাদের প্রাচীন দার্শনিকগণ যুক্তি নিয়েই আলোচনা সুরু করতেন; কিন্তু প্রথমে তাঁরা যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতিকেই, ঋষিদের উপলব্ধ সত্যসমূহকেই, অধিকতর নির্ভরযোগ্য, এমনকি অভ্রান্ত বলে মনে করতেন। শ্রুতি-বিরোধী কোন যুক্তি তাঁদের নিকট গ্রাহ্য ছিল না। যুক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও প্রথম প্রথম তাঁরা শ্রুতি-বিরোধী কোন

যুক্তিকে আমল দিতেন না। তাঁদের মত ও পথ মহাভারতের নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তান্ তর্কেন সাধয়েৎ।" অর্থাৎ যে পদার্থের চিন্তা করা অসাধ্য তার নির্ণয় কেবল তর্কের দ্বারা করিবে না। স্মরণীয় কঠোপনিষদের উক্তি "নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া"—যম নচিকেতাকে বলেছিলেন নচিকেতা যে জ্ঞান লাভ করেছেন তা তর্কের দ্বারা লভ্য নয়। এই প্রসঙ্গে লোকমান্য তিলক তাঁর "গীতা-রহস্য অথবা কর্মযোগ শাস্ত্র" নামক প্রসিদ্ধ গীতাভাষ্যে যা বলেছেন তা-ও উল্লেখযোগ্য। তিনি সেখানে বলেছেন যে বেদান্ত শাস্ত্রের অভিমত "অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিষয় স্বসম্বেদ্য, অর্থাৎ পবিত্র ও বিশাল মনবিশিষ্ট মহাত্মাদিগের অপরোক্ষ অনুভবের বা সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয়। শঙ্করাচার্য আপন বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে এই সিদ্ধান্তই দিয়াছেন।"

শ্রীঅরবিন্দ বলেন বিচার-বুদ্ধির, তর্ক-স্পৃহার প্রকৃতিই হলো নিজের উপর অত্যধিক আস্থা—যা নিছক বিচার-বুদ্ধির আয়ত্তের বাইরে তা নিয়েও তর্ক করা। এখানে দার্শনিকের ব্যর্থতা—সত্যের সন্ধানে অক্ষমতা। অনেক সময় দার্শনিকের চেষ্টা হয় সত্য-নির্ণয় নয়, স্বমত-প্রতিষ্ঠা। আমাদের দেশে দর্শনের যুগে প্রত্যেক দার্শনিককেই বেদের দোহাই দিতে হতো, চেষ্টা করতে হতো এ কথাটা প্রমাণ করতে যে তাঁর মত বেদের অবিরোধী। তাই যে সব শ্রুতি-বাক্য কোন দার্শনিকের মতের পরিপোষক হতো না দার্শনিক হয় ঐ শ্রুতিবাক্য-গুলি আদৌ উল্লেখ করতেন না, না-হয় বাক্যগুলির অপব্যাখ্যা করতেন। অতি অল্প দার্শনিকই এই দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারতেন। ফলে দর্শনের যুগে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন দার্শনিক মতের উদ্ভব হতে লাগলো। ঋষিদের স্বচ্ছ অনুভূতিগুলি তর্কজালে আবিল হয়ে উঠতে লাগলো। উপনিষদের উক্তি ও দর্শনের যুক্তির মধ্যে ব্যবধান বিপুল হয়ে পড়লো। শেষে বেদান্ত দর্শন বা বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বিভিন্ন দর্শনের মত খণ্ডন করে নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করে। বেদান্ত-দর্শন যুক্তির বিরোধী নয়, কিন্তু শ্রুতি-বিরোধী যুক্তি গ্রহণ করে না।

শ্রীঅরবিন্দের নিকট বিচার-বুদ্ধির মূল্য

উপরে যা বলা হলো তা থেকে কেউ যদি মনে করেন যে শ্রীঅরবিন্দের মতে বিচার-বুদ্ধির বিশেষ কোন মূল্য নেই, তাহলে তিনি মহা ভুল করবেন। বুদ্ধিজীবী মানুষের পক্ষে বিচার-বুদ্ধির দাবী অস্বীকার করা অসম্ভব।

শ্রীঅরবিন্দের মতে আধ্যাত্মিক সত্য জানবার জন্য intuition-এর যেমন প্রয়োজন, জ্ঞানের উন্নতির জন্য গভীর চিন্তাশক্তিরও তেমনি প্রয়োজন। তাঁর নিজের লেখা থেকেই এর প্রমাণ দেওয়া যায়। বারীন্দ্রকুমার দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এলে, ১৯২০ সনের ৭ই এপ্রিল তারিখে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে যে পত্র লিখেছিলেন তার কথা সকলেরই জানা আছে। নিম্নে ঐ পত্রখানার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল। ঐ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন :

"আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের দুর্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয় ; দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধর্মের অভাব নয় ; কিন্তু চিন্তাশক্তির হ্রাস— জ্ঞানের জন্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার। সর্বত্রই দেখি inability or unwillingness to think (চিন্তা করবার অক্ষমতা বা অনিচ্ছা) বা "চিন্তা-ফোবিয়া" "চিন্তা-আতঙ্ক"। মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবটি ঘোর অবনতির লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল রাত্রিকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দিন। আধুনিক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ। যে বেশী চিন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্তি বাড়ে। য়ুরোপ দেখ ; দেখবে দুটি জিনিস— অনন্ত বিশাল চিন্তার সমুদ্র, আর প্রকাণ্ড বেগবতী অথচ সু-শৃঙ্খল শক্তির খেলা। য়ুরোপের সমস্ত শক্তি সেইখানে ; সেই শক্তির বলে জগতকে সে গ্রাস করতে পারছে ; ....লোকে বলে য়ুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবিত। আমি তা মনে করি না।.........

"তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন solitary giants (একক অতিকায় মহাপুরুষ) ছাড়া সর্বত্রই......সোজা মানুষ, অর্থাৎ average man (সাধারণ গড়পড়তা মানুষ), যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারত চায় সরল চিন্তা, সোজা কথা ; য়ুরোপ চায় গভীর চিন্তা, গভীর কথা।" জ্ঞান-তপস্বী ও দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দের নিকট চিন্তাশক্তির ও বিচার-বুদ্ধির যে বিশেষ মূল্য থাকবে, এই তো স্বাভাবিক।

Intuition ও Reason-এর কাজ স্বতন্ত্র

শ্রীঅরবিন্দের মতে intuition আর বিচার-বুদ্ধির (reason-এর) কাজ স্বতন্ত্র। intuition-এর কাজ হলো সত্য আবিষ্কার করা ; আর reason-এর কাজ হলো প্রধানত ভুল-ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করা। তাঁর নিজের কথা : "Logical reasoning is much more efficiently a guardian against error then a discoverer of truth,—

than

although by deduction from knowledge already acquired it may happen upon new truths and indicate them for experience or for the higher and larger truth-seeing faculties to confirm." (The Life Divine p.-331)। এখানে শ্রীঅরবিন্দ intuition আর reason-এর কাজ যে বিভিন্ন তা স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন। তাঁর মতে সত্য আবিষ্কার হলো intuition-এর কাজ। ভুল-ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষার সহায় হলো reason। শ্রীঅরবিন্দ একথাও বলেছেন যে reason অপেক্ষা আধ্যাত্মিক experience বা intuition শ্রেষ্ঠতর, এবং reason যে সত্যে উপনীত হয় তাও intuition-এর দ্বারা অর্থাৎ অনুভূতি দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। আবার এ কথাও সত্য যা অনুভূতি বা intuition বলে বিবেচিত হয় তা-ও বিনা বিচারে গ্রহণ সব সময় নিরাপদ নয়। একটি সাধারণ উপমা দ্বারা এই দুয়ের কাজের পার্থক্য বোঝানো যেতে পারে। বিচার-বুদ্ধি যেন জাহাজের হাল। জাহাজকে এগিয়ে নেয় বাষ্প-শক্তি বা তড়িৎ-শক্তি। হালের এমন শক্তি নেই যে সে জাহাজকে এগিয়ে নেবে। তবে হাল জাহাজকে তার লক্ষ্যে স্থির রাখে, বিপথে যেতে দেয় না। শ্রীঅরবিন্দের কথা: "Logical reasoning is useful and indispensable in its own field". শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্য এবং যা intuition বলে মনে হয় তাও বিচার-পূর্বক গ্রহণ না করলে ভুল-ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। এখানেই বিচার-বুদ্ধির মূল্য। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে বোধি (intuition) ও বিচার-বুদ্ধি (reason) পরস্পরের সহায়।

শ্রীঅরবিন্দ যদি Reason বা বিচার-বুদ্ধির মূল্য স্বীকার না করতেন তবে কি The Life Divine-এর ন্যায় যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হতো? তিনি তো কেবল তাঁর উপলব্ধি সম্বন্ধে উক্তি করেই ক্ষান্ত হন নি, যুক্তির সাহায্যে তাঁর উক্তির স্বপক্ষে প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের প্রকৃত ভিত্তি

বৈদান্তিক দার্শনিকগণ তাঁদের যুক্তির সমর্থনে প্রধানত তিনটি শাস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করেন—প্রথম বেদ ও উপনিষদ্, দ্বিতীয় ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন আর তৃতীয় গীতা। এই তিনটি শাস্ত্র প্রস্থানত্রয় নামে পরিচিত। শ্রীঅরবিন্দও প্রস্থানত্রয়কে বলেছেন, The three recognised authorities for the Vedantic teaching." (Eassays on the Gita p.-62)।

প্রস্থানত্রয়ের মূল্য এতই অধিক যে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বাচার্য প্রভৃতি প্রত্যেক বৈদান্তিক সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতাকে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করতে হয়েছে, এবং দেখাতে হয়েছে যে তাঁর বিশেষ দার্শনিক মতটি প্রস্থানত্রয়ের সঙ্গে সুসংগত। নইলে তাঁর দার্শনিক মতকে এ দেশের পণ্ডিতগণ মোটেই আমল দিতেন না। শ্রীঅরবিন্দ যে বেদ-উপনিষদ্ ও গীতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা নিঃসন্দেহ। তার The Life Divine গ্রন্থের অধ্যায়ের সংখ্যা ছাপ্পান্ন। প্রত্যেক অধ্যায়ের গোড়াতে অধ্যায়ের মর্ম-সূচক যে সব শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত তার প্রায় প্রত্যেকটি বেদ-উপনিষদ্ ও গীতা থেকে নেওয়া। অবশ্য প্রস্থানত্রয় ব্যতীত তন্ত্র ও পুরাণাদির সঙ্গেও তিনি সম্যক পরিচিত ছিলেন; এবং তিনি পুরাণের, বিশেষ ভাবে তন্ত্রের মূল্য স্বীকার করতেন। তাই স্বভাবতই এই প্রশ্ন ওঠে যে তাঁর দর্শনের ভিত্তি কি প্রস্থানত্রয় ও তন্ত্রাদি শাস্ত্র?

শ্রীঅরবিন্দ গীতা-উপনিষদাদির মূল্য স্বীকার করেন, এবং তাঁর দর্শনের ব্যাখ্যায় তাদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন; কিন্তু আসলে তাঁর দর্শনের (ও যোগের) মূল ভিত্তি ছিল তার নিজ জীবনের অনুভূতি সমূহ। বরোদায় লেলে মহারাজের সঙ্গে ধ্যান-কালে তাঁর প্রথম প্রধান অনুভূতি, এবং আলিপুর জেলে তার দ্বিতীয় প্রধান অনুভূতি লাভ হয়েছিল। তার অপর দুটি প্রধান অনুভূতির প্রথমটি হলো পুরুষোত্তমের অনুভূতি; দ্বিতীয়টি তাঁর অতিমানসের অনুভূতি। এই দুটি অনুভূতির কথা আমরা পরে পড়বো। এখানে এই কথাটা বলা দরকার যে তাঁর দর্শনের ভিত্তি প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব অনুভূতি। আর্য পত্রিকায় যখন তাঁকে দার্শনিক প্রবন্ধ লিখতে হয়েছিল তখন তিনি তাঁর যোগজ অনুভূতিগুলিকেই বিচার-বদ্ধ প্রণালীতে ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। তাঁর The Life Divine, Synthesis of Yoga, Essays on the Gita প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থগুলির মূল তাঁর আর্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহ। তাই এ কথা বলা অসংগত নয় যে তাঁর দর্শনের প্রকৃত ভিত্তি তাঁর নিজের আধ্যাত্মিক অনুভূতি সমূহ।

অনুভূতির উৎস অন্তর্যামী

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আর একটি মতেরও উল্লেখ প্রয়োজন। তাঁর মতে যুক্তি-বিচারের অপেক্ষা অনুভূতি বা intuition অধিকতর নির্ভরযোগ্য একথা সত্য, তেমনি এই কথাটাও সত্য যে অনুভূতির মূল উৎস হলেন সাধকের

"চৈত্যগুরু" বা অন্তর-দেবতা বা অন্তর্যামী ; শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় The Guide in the heart (The Synthesis of Yoga p-70)। তাঁর যোগের নাম Integral Yoga'। তিনি বলেন: "For the Sadhaka of the 'Integral Yoga it is necessary to remember that no written Sastra, however great its authority or however large its spirit, can be more than a partial expression of the Eternal knowledge. He will use but never bind himself even by the greatest scripture." (Synthesis of Yoga p.-61)। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে:শাস্ত্র যতই শ্রেষ্ঠ হউক না কেন, কোন শাস্ত্রই শাশ্বত জ্ঞান বা পরাজ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ নয়। তাঁর দর্শনের যেমন যোগেরও তেমনি প্রকৃত ভিত্তি হলো তাঁর নিজের অনুভূতি সমূহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মত

সৃষ্টিতত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

এই অধ্যায়ে আমরা শ্রীঅরবিন্দের কয়েকটি দার্শনিক মতের একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের মূল কথা হলো এই যে সৃষ্টির ক্রম-বিকাশের ধারায় একদিন পৃথিবীতে দেব-মানবের আবির্ভাব সুনিশ্চিত। তাই প্রথমে তিনি সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার আলোচনাই আমরা করবো। জগৎ-সৃষ্টির প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একথাটা স্মরণীয় যে যুক্তি-বিচারের সাহায্যে সৃষ্টির ব্যাখ্যার চেষ্টা হয়েছিল প্রথমে সাংখ্য-দর্শনে। স্বামিজীর মতে সাংখ্য-দর্শনকার কপিল মুনি হলেন "দর্শন-শাস্ত্রের জনক।" সাংখ্য-দর্শনের বিশ্ব-সৃষ্টির ব্যাখ্যা ভারতের অন্যান্য দর্শনের সৃষ্টি-তত্ত্বের মূল। শ্রীঅরবিন্দকেও সাংখ্য-দর্শনের সৃষ্টিক্রমের উল্লেখ নানাস্থানে করতে হয়েছে। তাই প্রথমে সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধের কিছু বলা প্রয়োজন।

সাংখ্য ও বেদান্ত

আমাদের দেশের দর্শন-শাস্ত্রগুলির মধ্যে সাংখ্য-দর্শনের স্থান উচ্চ। সাংখ্যের রচয়িতা কপিলকে গীতায় ভগবানের অন্যতম বিভূতি এবং সিদ্ধগণের

মধ্যে প্রধান বলা হয়েছে। কিন্তু সাংখ্য-দর্শনের মূল্য স্বীকার করেও বলতে হবে আমাদের দর্শনগুলির মধ্যে বেদান্ত-দর্শনই সগৌরবে মুখ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা: "শঙ্করাচার্য দেশময় বেদান্ত প্রচারের স্থায়ী ও অপূর্ব ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেদান্তের আধিপত্য বদ্ধমূল করিলেন" (ধর্ম ও জাতীয়তা ২৫ পৃষ্ঠা)। বস্তুত বিভিন্ন দর্শনের যুক্তি খণ্ডন করে বেদান্ত যে মত প্রতিষ্ঠিত করেছে তাই আমাদের পণ্ডিত-সমাজে জ্ঞানের শেষ-কথা বলে স্বীকৃত। এ কথা সত্য যে বেদান্তের এই দাবী অযৌক্তিক নয়; কারণ জ্ঞান কথাটির অর্থ হলো বহুর মধ্যে এককে দেখা—বহুকে একের কোঠায় আনা। বেদান্তের মতে "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", অর্থাৎ বিশ্বের সব কিছুকেই বেদান্ত একের মধ্যে দেখে; এবং এই দেখাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। বেদান্তকে কেউ কেউ বলেছেন সকল দর্শনের চরম পরিণতি। নিম্নের শ্লোকটি বেদান্ত-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক:

তাবৎ গর্জন্তি শাস্ত্রানি জম্বুকো বিপিনে যথা।
ন গর্জতি মহাশক্তিঃ যাবৎ বেদান্ত-কেশরী ॥

অর্থাৎ সিংহের সম্মুখে শৃগাল যেমন চুপ করে যায় তেমনি বেদান্তের সম্মুখে অন্য সব শাস্ত্র নীরব হয়ে যায়।

বেদান্ত সাংখ্যের কোন কোন মত গ্রহণ করে অনেক কিছু আবার গ্রহণ করে না। বেদান্ত সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের কিছু গ্রহণ করেছে কিছু বর্জন করেছে। গীতা একখানা শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক গ্রন্থ। শ্রীঅরবিন্দ বলেন গীতায় বেদান্তের দিক থেকে সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে; এবং তিনি গীতার সে ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তাই শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা বুঝবার জন্য আমরা প্রথমে সাংখ্যের, পরে গীতার সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা আলোচনা করবো। আবার সেই প্রসঙ্গে সাংখ্য ও গীতার অতিরিক্ত নতুন কিছু তত্ত্বেরও আমরা উল্লেখ করবো; কারণ সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ গীতার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করেছেন।

সাংখ্য-দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি

সাংখ্য-দর্শনে যে দুই অনাদি ও স্বতন্ত্র চরমতত্ত্বের সাহায্যে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তা হলো পুরুষ আর প্রকৃতি। উপনিষদ্ থেকে ভারতের দার্শনিকগণ তাঁদের তত্ত্বের মূল গ্রহণ করতেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রকৃতিকে একটি ত্রিবর্ণের অজা আর পুরুষকে অজ বলা হয়েছে। প্রকৃতি

অজা অর্থাৎ তা অনাদি ; আর ত্রিবর্ণের অর্থ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের আধার। আবার পুরুষও অজ অর্থাৎ অনাদি—সৃষ্টির পূব থেকেই প্রকৃতি ও পুরুষ বিদ্যমান।

সাংখ্য মতে পুরুষ আর প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক নিত্য নয়, যদিও ঐ দুই আদি তত্ত্বের সাময়িক সংযোগেরই ফল সৃষ্টি-ব্যাপার। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি-ব্যাপার সম্ভব হয় না।

পুরুষ আর প্রকৃতি আবার কেবল পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র নয় ; ধর্মেও তারা পরস্পরের বিপরীত। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন, জড়। পুরুষ অকর্তা বা সাক্ষী ও অনুমন্তা মাত্র—জানা ও দেখা ছাড়া অন্য কোন কাজ করিতে পারে না ; আর প্রকৃতিই হলো সর্ব কর্মের উৎস। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী ; আর পুরুষ নিগু'ণ। অকর্তা হলেও পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে ; আর সুখ-দুঃখ যদিও প্রকৃতির অর্থাৎ দেহমনের ধর্ম—পুরুষ বা আত্মার সুখ-দুঃখ বস্তুত কিছু নেই ; তবু পুরুষ নিজেকে সময়ে সুখী সময়ে দুঃখী মনে করে। কেন? উত্তরে সাংখ্য বলে যে পুরুষ সাক্ষীমাত্র ও অকর্তা হলেও একটি কাজ করতে পারে—প্রকৃতির কর্তৃত্ব-ব্যাপার আর প্রকৃতির ধর্ম সুখ-দুঃখাদি প্রকৃতির সান্নিধ্যে পুরুষ নিজের উপর প্রতিবিম্বিত করে থাকে। একটি উপমা দ্বারা সাংখ্য-দর্শন কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করে। উপমাটি এই : নির্মল স্ফটিক নিজে বর্ণহীন ; কিন্তু তার সম্মুখে রক্ত পুষ্প বা নীল পুষ্প আনা হলে, এবং পুষ্পের ছায়া স্ফটিকের উপর পড়লে, বর্ণহীন হলেও স্ফটিক রক্তবর্ণ বা নীলবর্ণ মনে হয়। তেমনি প্রকৃতির কর্তৃত্বের ছায়া পুরুষের উপর পড়ায় অকর্তা পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করে। আবার প্রকৃতির ধর্ম সুখ-দুঃখের ছায়া পুরুষের উপর পড়ায় পুরুষ নিজেকে সুখী বা দুঃখী মনে করে।

সৃষ্টি-ব্যাপারের সাংখ্য ব্যাখ্যা

চেতন পুরুষ আর অচেতন প্রকৃতির সংযোগের ফল সৃষ্টি-ব্যাপার, এ কথাটা বোঝাবার জন্যে সাংখ্য একটি উপমা দিয়ে থাকে। পুরুষ চেতন হলেও অকর্তা ; তাই পুরুষ চলৎশক্তিহীন খঞ্জের সঙ্গে তুলনীয়। আর প্রকৃতি অচেতন, তাই তার তুলনা অন্ধ। অন্ধের পক্ষেও একা চলা অসম্ভব। শ্রীঅরবিন্দের কথা Prakriti is inert without the conscious soul, active only by juxtaposition to the consciousness of Purusha (Essays on the Gita p.-87)। খঞ্জ পুরুষ আর অন্ধ প্রকৃতি উভয়ের পক্ষেই একক চলা

অসম্ভব ; কিন্তু খঞ্জ যদি অন্ধের কাঁধে চড়ে অন্ধকে চালায় তবে দুয়ের সমবায়ে চলা-কার্য সম্ভব হয়। এই অন্ধ-খঞ্জ ন্যায়ের দ্বারা সাংখ্য সৃষ্টি-ব্যাপারের ব্যাখ্যা করে থাকে। কিন্তু উপমাটি ত্রুটি-হীন নয়। সৃষ্টি-ব্যাপারে পুরুষের কোন সক্রিয় অংশ নেই, সাংখ্যের এই বক্তব্যের সঙ্গে এই উপমা ঠিক খাপ খায় কী? এই উপমায় খঞ্জ পুরুষ "চালক"-এর ভূমিকা গ্রহণ করে ; কিন্তু পুরুষের সান্নিধ্য-মাত্রেই প্রকৃতির সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি হয়, এই সাংখ্য মত।

সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রকৃতির প্রবৃত্তি কেন হয়

অচেতন প্রকৃতির পক্ষে সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি কীভাবে সম্ভব হয়? সাংখ্য-দর্শনকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। সাংখ্যের উত্তর এই : চুম্বকের সম্মুখে অচেতন লৌহ-খণ্ডের মধ্যে গতি-সঞ্চার হয় ; তেমনি পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রেই অচেতন প্রকৃতি সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।

সৃষ্টি-ব্যাপারে পুরুষের সান্নিধ্যমাত্রই প্রয়োজন ; ঐ ব্যাপারে পুরুষের পক্ষে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ প্রয়োজন নয়। এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত রসায়ন-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। রসায়ন-শাস্ত্রে catalysis বলে একটি কথা আছে। দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি বস্তুর রাসায়নিক মিশ্রণ তৃতীয় একটি বস্তুর উপস্থিতি ব্যতীত সম্ভব হয় না ; কিন্তু এই তৃতীয় বস্তুটির উপস্থিতিই রাসায়নিক মিশ্রণ কার্যের জন্য পর্যাপ্ত। তার দৃষ্টান্ত নাকি বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় ওষুধ মকরধ্বজ তৈরি করবার সময় স্বর্ণ-খণ্ডের ব্যবহার। ঐ ওষুধ তৈরি করতে যে সোনার ব্যবহার হয় তার পরিমাণগত বা গুণগত কোন পরিবর্তন নাকি হয় না ; তা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সৃষ্টি-ব্যাপারে পুরুষ নিষ্ক্রিয় সাক্ষীমাত্র, এই সাংখ্যের সিদ্ধান্ত।

সাংখ্যের কৈবল্য বা মুক্তি

আমাদের সকল দর্শনেরই দাবী মুক্তির পথ দেখানো। মুক্তি বলতে সাংখ্য কী বোঝে, এবং সাংখ্য মতে মুক্তি কী ভাবে সম্ভব হয়, তা দেখা যাক্। ওপরে যা বলা হয়েছে তা থেকে দেখা গিয়েছে যে সৃষ্টি-ব্যাপার পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের ফল হলেও পুরুষ প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাংখ্যের ভাষায় "কেবল"। কিন্তু পুরুষ আত্ম-বিস্মৃত—সে যে 'কেবল' সে কথা সে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু যখন পুরুষের এই জ্ঞান হয় যে প্রকৃতির সঙ্গে তার বস্তুত কোন সম্পর্ক নেই ; সে দেহ, প্রাণ, মন নয় এবং দেহাদির ধর্ম পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখাদি তার ধর্ম নয় ; এবং সে প্রকৃতির অধীন নয়, উপনিষদের ভাষায় সে

'অনীশ' নয়, 'ঈশ' ;—তখন পুরুষ আর প্রকৃতির লীলা অনুমোদন করে না। প্রকৃতি তার সম্মুখে এই বিচিত্র জগতের পশরা সাজিয়ে যেন নৃত্যপরায়ণা নটীর ন্যায় এতদিন অভিনয় কর্ছিল। পুরুষের জ্ঞান হলে, অর্থাৎ প্রকৃতি-নটীর লীলার অনুমোদনে পুরুষ ক্ষান্ত হলে, প্রকৃতিও যেন লজ্জিত হয়ে তার পশরা গুটায় এবং নৃত্যে ক্ষান্ত হয়। পুরুষের তখন মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ হয়। এইরূপ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় সাংখ্যের মুক্তির বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

সাংখ্যের সৃষ্টি-ক্রম

পূর্বেই বলা হয়েছে সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা আমাদের সকল দর্শনের সৃষ্টি-ব্যাখ্যার মূল। গীতায়ও সাংখ্যের সৃষ্টি-কর্মের ব্যাখ্যা একটু পরিবর্তিত আকারে গৃহীত হয়েছে, এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতার সৃষ্টি-ক্রম গ্রহণ করেছেন। তাই শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা বুঝবার জন্য সাংখ্যের সৃষ্টি-ক্রমেরও একটু উল্লেখ প্রয়োজন, একথা পূর্বেও বলা হয়েছে।

সাংখ্যের প্রথম কথা জগতে নতুন কিছুই উৎপন্ন হয় না। শ্রীঅরবিন্দের কথা : Everything becomes, nothing is made (The Ideal of The Karmayoga in p.-64). আমরা দেখি দুধ থেকে দই হয়, জল থেকে দই হয় না ; তিল থেকে তেল হয়, বালি থেকে তেল পাওয়া যায় না। অর্থাৎ দই আর তেল দুধ আর তিলের পরিণাম মাত্র ; যা ছিল না তার উদ্ভব হলো, এমন কোন নতুন জিনিস দই আর তেলকে বলা যায় না। পরিণামের অর্থ কারণের কার্যে পরিণতি। এক্ষেত্রে দুধ কারণ আর দই কার্য। কার্যকে দর্শনের ভাষায় আবার বিকার ও বিকৃতি বলা হয় ; তাই বলা যায় দই দুধের বিকার। এই হলো দর্শনের "পরিণাম-বাদের" সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। সাংখ্য-দর্শন পরিণাম-বাদী। আধুনিক বিজ্ঞানের দুটি মূল সূত্র, Matter is indestructible এবং Conservation of Energy কথা দুটিও এই পরিণাম-বাদেরই ভিন্ন রূপ। কোন পদার্থের বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে ; যথা দেহ দগ্ধ হলে বিনষ্ট হলো বলা যায় না ; দেহ তার বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হলো ; "পঞ্চভূতের" সমবায়ে যে দেহ গঠিত হয়েছিল তার "পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি" হলো। শক্তি বা energy সম্বন্ধেও সে কথা সত্য ; শক্তির রূপান্তর হয় বিনাশ নেই, যথা বাষ্পশক্তির গতিতে পরিণতি।

সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের মূল কথা এই যে সৃষ্টির সূচনা হলে প্রকৃতি বা প্রধান ধাপে ধাপে একটি ক্রম-অনুসারে শেষে জগৎ-প্রপঞ্চের রূপ ধারণ করে। সেই

ক্রমটির বিবরণ এই :—সৃষ্টির সূচনায় প্রকৃতি বা প্রধান মহৎ বা বুদ্ধিতে পরিণত হয়; অর্থাৎ মহৎ বা বুদ্ধি হলো প্রকৃতির প্রথম বিকার বা বিকৃতি। দ্বিতীয় পর্যায়ে মহৎ অহংকারে পরিণত হয়। অহংকার হলো বুদ্ধির বিকৃতি। অহংকারের বিকৃতি দ্বিবিধ - একদিকে অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র (বা ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি পঞ্চ স্থূল ভূতের সূক্ষ্ম কারণ সমূহ) উদ্ভূত হয়ে থাকে; অপর দিকে চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত-পদাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন বা একাদশ ইন্দ্রিয় হলো অহংকারের দ্বিতীয় বিকৃতি। স্মরণ রাখতে হবে যে ইন্দ্রিয় বলতে বোঝায় বাইরের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নয় কিন্তু সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তি বা মস্তিষ্কের এক-একটি স্নায়ুকেন্দ্র যার সাহায্যে রূপরস-স্পর্শ প্রভৃতির জ্ঞান সম্ভব হয়। সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে পঞ্চতন্মাত্র থেকে স্থূল পঞ্চভূতের এবং তাদের বিবিধ সংমিশ্রণের ফলে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতি, বিকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি

প্রকৃতি ও বিকৃতি কথা দুটির এবং প্রকৃতি-বিকৃতি যুক্ত কথাটির অর্থ মনে রাখতে হবে। প্রকৃতি কথাটির অর্থ মূল পদার্থ বা উপাদান। ব্যাকরণে প্রকৃতি-প্রত্যয় এই যুক্ত শব্দটিতে এই অর্থেই প্রকৃতি শব্দাংশটির ব্যবহার হয়েছে। যথা কর্তব্য, করণীয় ও কার্য শব্দ তিনটির প্রকৃতি বা মূল শব্দাংশ হল √কৃ ধাতু; এবং তব্য, অনীয়, যৎ প্রত্যয় যোগে √কৃ ধাতু থেকে কর্তব্য, করণীয় ও কার্য শব্দগুলি নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। আর প্রকৃতি-বিকৃতি বলতে বোঝায় যা একদিকে প্রকৃতি অপরদিকে বিকৃতি। যথা, মহৎ বা বুদ্ধি। মহৎ থেকে অহংকারের উদ্ভব, অতএব মহৎ অহংকারের প্রকৃতি; আবার মহৎ প্রকৃতির প্রথম বিকৃতি। সেইরূপ অহংকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি এবং মহতের বিকৃতি। প্রকৃতি-বিকৃতি সংখ্যায় সাতটি; যথা, মহৎ, অহংকার ও পাঁচটি তন্মাত্র।

সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব

শ্রীঅরবিন্দ বলেন বিশ্ব-সৃষ্টির পেছনে যে সব তত্ত্ব বা পদার্থ আছে তাদের বিশ্লেষণ করে সংখ্যা নির্ণয় করা সাংখ্য-দর্শনের কাজ; তাই এই দর্শনের নাম সাংখ্য-দর্শন। সাংখ্য-দর্শনের মতে তত্ত্ব-সংখ্যা হলো পঁচিশ। যথা,

মুল প্রকৃতিরবিকৃতি র্মহাদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্তঃ।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥

সাংখ্যকারিকায় উপরোক্ত শ্লোকে পঁচিশ তত্ত্বের নিম্নের তালিকা দেওয়া হয়েছে।

মূল প্রকৃতি বা প্রধান অবিকৃতি বা কারো বিকার নয় ; মহদাদি সাত প্রকৃতি-বিকৃতি ; আর মন সহ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোলটি শুধু বিকার। পুরুষ প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়। এইরূপে মূল প্রকৃতি, মহদাদি সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত নিয়ে হয় চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ; তার সঙ্গে পুরুষ যোগ করে সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের হিসাব মিলানো হয়ে থাকে।

বুদ্ধি বা মহৎ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা

সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের তালিকা পাওয়া গেল। এখানে কয়েকটি প্রশ্ন উঠবে ; যথা প্রকৃতির প্রথম বিকার বুদ্ধি বা মহৎ আর দ্বিতীয় বিকার অহংকার ও তৃতীয় বিকার মন প্রভৃতি, জড়, সাংখ্যের এ মতের পেছনে যুক্তি কী? দ্বিতীয়ত মহৎ ও অহংকার স্বরূপত কী? এবং তৃতীয়ত শ্রীঅরবিন্দের নিকট সাংখ্যের সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যার মূল্য কী?

গোড়াতে একটা কথা বলা দরকার: পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের মতে বুদ্ধি, অহংকার, অর্থাৎ অহং জ্ঞান ও মন হলো চেতন পদার্থ। আর যা চেতন নয় তা হলো জড়। সাংখ্য মতে পুরুষ একমাত্র চেতন পদার্থ ; বুদ্ধি, অহংকার, মন সকলই জড়। পাশ্চাত্য দর্শনে একদিকে মন অপরদিকে জড় দুই পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব বলে গৃহীত। নিম্নের দুটি প্রশ্ন ও তাদের উত্তরে সে কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথম প্রশ্ন: What is Matter? উত্তর: Never Mind। দ্বিতীয় প্রশ্ন: What is Mind? উত্তর: No Matter। উত্তর দুটিতে আবার Mind ও Matter কথা দুটি যে দ্ব্যর্থ-বোধক এবং শ্লেষালংকারের (ইংরেজী Pun-এর) দৃষ্টান্ত তাহা পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন। উত্তর দুটিতে Mind ও Matter কথা দুটি পরস্পর-বিরোধী বলা হয়েছে এবং প্রশ্ন দুটি নিরর্থক, একথাও বলা হয়েছে। সে কথা যাক্ ; সাংখ্যের উক্তির পেছনে যুক্তি কী তা দেখা যাক্। সাংখ্য পরিণাম-বাদে বিশ্বাস করে। পরিণাম-বাদের মূল কথা এই যে কারণ কার্যের সূক্ষ্মতর অবস্থা ; এবং কারণ ও কার্যের মধ্যে "সত্তা-সাম্য"—অর্থাৎ কারণ ও কার্য দুয়ের সত্তাই এক শ্রেণীর। প্রকৃতি কারণ, বুদ্ধি বা মহৎ কার্য। প্রকৃতি জড়, অতএব প্রকৃতির কার্য বুদ্ধি ও জড়। আবার বুদ্ধি কারণ, তার কার্য অহংকার। তাই বুদ্ধি যখন জড়, তখন তার কার্য অহংকার, পরিণাম-বাদের মূল সূত্রানুসারে, জড় না হয়ে পারে না। সাংখ্যের যুক্তি যে logical বা বিচার-সম্মত তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু বুদ্ধি, অহংকার ও মন জড় কথাটা বোঝা শক্ত।

বুদ্ধি বা মহৎ স্বরূপত কী, তার লক্ষণ ও কাজ কী দেখা যাক্। বুদ্ধিকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন 'discriminating and deciding power'। তাঁর মতে বুদ্ধি হলো 'the power that specially decides (গীতার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কথাটি স্মরণীয়) and persists in the decision'। সোজা কথায় শ্রীঅরবিন্দের মতে বুদ্ধি হলো Intelligence and will, সংক্ষেপে intelligent will; এবং বুদ্ধির কাজ হলো প্রথমে নিশ্চয় করা ও সংকল্প করা; পরে সেই সংকল্পকে কাজে পরিণত করা। সৃষ্টি প্রসঙ্গে মহৎ বা বুদ্ধির কাজ এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়: "কোন কাজ করিবার পূর্বে মনুষ্যের তাহা করিবার বুদ্ধি বা সংকল্প প্রথমে হওয়া যাই। সেইরূপ প্রকৃতির স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি হওয়া চাই। মানুষ সচেতন হওয়া প্রযুক্ত তাহার বুদ্ধি মনুষ্য বোঝে। প্রকৃতি অচেতন ও জড় হওয়া প্রযুক্ত নিজের বুদ্ধির তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। মানুষী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্তু অস্বয়ং বেদ্য (অর্থাৎ নিজের অজ্ঞাত) কোন শক্তি জড় পদার্থেও আছে একথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।" (তিলকের গীতা ১৭৪ পৃঃ)। অর্থাৎ অচেতন ও জড় মহৎ বা বুদ্ধি সংকল্প করে তবে সে সম্বন্ধে মহৎ সচেতন নয়—কথাটা ধারণা করা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে শক্ত বই কী। কিন্তু সাংখ্যের ব্যাখ্যা বুঝতে হলে এ ধারণাটাই মনে বদ্ধমূল হওয়া চাই; পাশ্চাত্য দর্শনের বুদ্ধি ও মন চেতন পদার্থের দৃষ্টান্ত একথাটা ভুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ কী বলেন এবং এ সমস্যার তিনি কী সমন্বয় করেছেন দেখা যাক্।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Essays on the Gita গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: If we find it difficult to realise how intelligence and will can be properties of the inconscient and themselves mechanical (Jada), we have only to remember that modern science itself has been driven to the same conclusion. Even in the mechanical action of the atoms there is a power which can only be called an inconscient will; and in all the works of Nature that pervading will does inconsciently the works of intelligence. What we call mental intelligence is precisely the same thing in its essence as that which discriminates and co-ordinates subconsciously all the activities of the

material Universe." এই উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় শ্রীঅরবিন্দের মতে আধুনিক বিজ্ঞান যা জড়রূপে প্রতীয়মান হয়, তার মধ্যেও চেতনের অস্তিত্ব ও ক্রিয়া স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এ কথার নজির হিসাবে তিলক তাঁর গীতায় প্রসিদ্ধ জড়বাদী জার্মান দার্শনিক Haeckel-এর নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করেছেন: "Without the assumption of an atomic soul the commonest and most general phenomena of Chemistry are inexplicable." অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে বুদ্ধি বা সাংখ্যের মহৎ-তত্ত্ব স্বরূপত intelligence কিন্তু inconscient intelligence, mental intelligence নয়। Intelligence-এর কাজ হলো শ্রীঅরবিন্দের মতে to discrimate and co-ordinate। বুদ্ধি বা মহৎ-তত্ত্ব, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় subconsciously আর তিলকের ভাষায় "অস্বয়ং বেদ্য ভাবে", নিশ্চয় করে, সংকল্প করে। মানুষের বুদ্ধি আর সাংখ্যের বুদ্ধিতত্ত্ব এ দুয়ের পার্থক্য দেখাবার জন্য শেষোক্ত বুদ্ধিতত্ত্বকে "সমষ্টি বুদ্ধি" বলা হয়। "সমষ্টি" বিশেষণটি প্রয়োগের উদ্দেশ্যই তাই।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখও বাহুল্য হবে না। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক Max Muller (মোক্ষমূলর) তাঁর "The Six Systems of Indian Philosophy" গ্রন্থে মহৎ বা বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে যা বলেছেন তা স্মরণীয়। তিনি সেখানে কথাটা পরিষ্কার করে বলেছেন। পাঠক তাঁর কথায় দেখতে পাবেন প্রকৃতির প্রথম বিকার বুদ্ধি আর mental intelligenceএ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়। Max Muller বুদ্ধিতত্ত্বকে বলেছেন Cosmic intellectuality অর্থাৎ "সমষ্টি" বুদ্ধি; এবং তার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে মহৎ হলো Prakriti illuminated and intellectualised and rendered capable of becoming at a later stage the germs of Ahankar (distinction of Subject and Object) Manas and Indriyas। মহৎ বা বুদ্ধিকে illuminated ও intellectualised প্রকৃতি বলা হয়েছে; কারণ প্রকৃতিকে তার প্রথম বিকার বুদ্ধিতে পরিণত হতে হলে পুরুষের সান্নিধ্য প্রয়োজন; এবং পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির উপর চেতন পুরুষের চৈতন্য প্রতি-বিম্বিত হয়। আর মানব মন অহংকারের বিকার এবং অহংকার বুদ্ধির বিকার; তাই বুদ্ধি বা মহৎ-তত্ত্বকে অহংকার ও মন প্রভৃতি পরবর্তী—বিকৃতি সমূহের germs বা seed state বলা হয়েছে।

সাংখ্যের অহংকার-তত্ত্বের ও ব্যক্ত জগতের ব্যাখ্যা

সাংখ্যের অহংকার-তত্ত্ব প্রসঙ্গে প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের একথা কয়টি স্মরণীয়। তিনি বলেন: "আমাদের ভাষায় অহংকার শব্দটির এমন বিকৃত অর্থ হইয়া গিয়াছে যে আর্যধর্মের প্রধান প্রধান তত্ত্ব বুঝাইতে অনেক সময় গোল হইয়া পড়ে।.....সাধারণতঃ অহংকার শব্দের গর্ব অর্থই বোঝা যায়।......প্রকৃতপক্ষে অহংজ্ঞান মাত্রই অহংকার। প্রকৃতির অন্তর্গত তিনটি গুণের ক্রিয়ায় তাহার তিন প্রকার বৃত্তি বিকশিত হয়—সাত্ত্বিক অহংকার, রাজসিক অহংকার ও তামসিক অহংকার। সাত্ত্বিক অহংকার জ্ঞান প্রধান, সুখ প্রধান। আমার জ্ঞান হইতেছে, আমার আনন্দ হইতেছে এই ভাবগুলি সাত্ত্বিক অহংকারের ক্রিয়া। সাধকের অহং, ভক্তের অহং, জ্ঞানীর অহং সত্ত্বপ্রধান, জ্ঞান প্রধান, সুখ প্রধান। রাজসিক অহংকার কর্মপ্রধান—আমি জয় করিতেছি, আমি বলবান, আমি সুখী আমি দুঃখী ইত্যাদি।... ..তামসিক অহংকার অজ্ঞতা ও নিশ্চেষ্টতায় পূর্ণ—আমি অধম, আমি নিরুপায়। যাহারা তামসিক অহংকারে ক্লিষ্ট তাহাদের গর্ব নাই অথচ অহংকার পূর্ণ-মাত্রায় আছে।" (শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম ও জাতীয়তা ৩০ পৃষ্ঠা)। গীতার ষোড়শ অধ্যায়েও এই ত্রিবিধ অহংকার বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ অহংকার কথাটির ইংরাজী করেছেন Ego-sense। Ego-sense বা অহংকারের প্রকৃত অর্থ হলো আমি, আমার এই স্বাতন্ত্র্য বোধ—অহংকার ও মমকার। এই অহংকারের একটি বৈশিষ্ট্য ভেদজ্ঞান, আমি ও আমার নয় এই ভেদজ্ঞান। আমি কর্তা এই অভিমানও অহংকার। আমি সুখী আমি দুঃখী এই বোধও অহংকারের অঙ্গ। আর অহংকারের অপর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ. বিষয়ী (Subject) ও বিষয় (Object) এই ভেদ। Subject কথাটির অর্থ 'that which perceives' বা জ্ঞাতা; আর Object বলতে বোঝায় 'that which is perceived' বা জ্ঞেয়।

সাংখ্য-দর্শনের লক্ষ্য এই বিশ্বজগতের একটা যুক্তিপূর্ণ-ব্যাখ্যা দেওয়া। বিশ্বজগৎকে দুই দিক থেকে দেখা যায়—বস্তুজগৎ, বা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় Objective aspect of Cosmic Energy (প্রকৃতি) আর মনোজগৎ বা Subjective aspect of Cosmic Energy। আমরা দেখেছি প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম অংহকারের বিকার দ্বিবিধ—একদিকে অহংকার থেকে পঞ্চতন্মাত্র ও তাদের বিকার পঞ্চভূত। এই মহৎ বা বুদ্ধি, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র ও তাদের বিকার পঞ্চভূতের সমবায়ে বস্তুজগৎ উদ্ভূত। আর

মনোজগৎ ? সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথা : "Thirteen other principles constitute the subjective aspect of the Cosmic Energy—Buddhi or Mahat, Ahankar, Manas (মন) and its ten sense-functions, five of Knowledge, five of action" (Essays on the Gita p.-66)

সাংখ্যের দার্শনিক যুক্তির মূল্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত কী দেখা যাক্। তিনি বলেন : There are certainly plenty of things in our existence which Sankhya does not explain at all or does not explain satisfactorily ; but if all we need is a rational explanation of the Cosmic processes in their principles as a basis for the great object common to the ancient philosophies—the liberation of the soul from the obsession of Cosmic Nature, then the Sankhya explanation of the world and the Sankhya way of liberation seem as good and as effective as any other (Essays on the Gita p.-67)

এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা যা জানতে পাই তার সারার্থ এই :—প্রথমত সাংখ্যের বিশ্বসমস্যার ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত ; তবে সাংখ্য-দর্শন বিশ্বসমস্যার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছে একথা বলা যায় না। (সাংখ্যের যুক্তির যে প্রধান ত্রুটি তা এই অধ্যায়ে পরে "বেদান্ত ও গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।) দ্বিতীয়ত আমাদের সকল দর্শনের লক্ষ্য মুক্তির পথ-প্রদর্শন ; এবং সাংখ্যের বিশ্বসমস্যার ব্যাখ্যা এবং সাংখ্য-দর্শন মুক্তি বা কৈবল্য লাভের জন্য যে পথ নির্দেশ করেছে তা অপর কোন দর্শনের ব্যাখ্যা বা পথের অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়। সাংখ্যের মূল্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন সাংখ্যের যুক্তিতে যে দুএকটি ত্রুটি আছে তা বেদান্ত দর্শনে দূর করা হয়েছে। "কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিশ্বসমস্যার প্রথম ব্যাখ্যা করার গৌরব সবই সাংখ্যকার কপিলের প্রাপ্য। প্রায় সম্পূর্ণ অট্টালিকাকে সম্পূর্ণ করা অতি সহজ কাজ।" অর্থাৎ সাংখ্যই প্রথমে বিশ্বসমস্যার যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা করেছে ; এবং সেই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ না হলেও প্রায় সম্পূর্ণ। বেদান্ত সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করে, তার মধ্যে যে দুএকটি ত্রুটি ছিল তা দূর করেছে মাত্র। শ্রীঅরবিন্দও তা-ই বলেন।

জড় ও চেতন সম্বন্ধে বিভিন্ন মত

চরমতত্ত্ব এক না দুই—দর্শনের এই একটি সমস্যা। সাংখ্য-মতে জগতের পেছনে যে চরমতত্ত্ব তা দুই ; কিন্তু বেদান্তবাদীর এবং আরো অনেক দার্শনিকের মতে এই চরমতত্ত্ব এক। যাঁরা জগতের পেছনে এক চরমতত্ত্বকে দেখেন তাঁদের মধ্যে কারো কারো মত এই যে সে তত্ত্ব হলো জড় ; আবার কোন কোন দার্শনিক মনে করেন ঐ চরমতত্ত্ব জড় নয়, চেতন। প্রথম দল হলেন জড়বাদী ; অপর দলের নাম পাশ্চাত্য জগতে idealist, আর, আমাদের দেশের ভাষায় "বিজ্ঞানবাদী"। জড়বাদী দার্শনিকগণ জড় ছাড়া চেতনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে চেতন মন জড়েরই প্রকার-ভেদ মাত্র। তাঁরা বলেন মস্তিষ্ক তো জড় পদার্থ এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়াই মানুষের জৈবলীলার মূল। আমাদের মানসিক ক্রিয়াগুলি, যথা, আমাদের জ্ঞান, সুখ-দুঃখের অনুভূতি ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতি, মস্তিষ্কের ক্রিয়া ব্যতীত সম্ভব হয় না, এবং তারাও মস্তিষ্কের এক প্রকার বিশেষ ক্রিয়া মাত্র। যেমন গাড়ি চলে। চলাটাই আসল কথা ; চলার সঙ্গে সঙ্গে যে শব্দ হয় তা চলারই আনুষঙ্গিক ফল মাত্র ; তেমনি মস্তিষ্কের ক্রিয়ারই আনুষঙ্গিক ফল আমাদের মানসিক ব্যাপার-গুলি। অপর পক্ষে বিজ্ঞানবাদীর কথা আমাদের সকল জ্ঞানই আমাদের কতকগুলি প্রত্যয়ের সমষ্টি মাত্র। সামনে যে দেয়ালটি রয়েছে সাধারণ লোকের মতে তা একটা জড় বস্তু ; এমন একটা জড় বস্তু যা অচল ও অটল, এবং যাকে অস্বীকার করলে দেয়ালে মাথা ঠোকার অবশ্যম্ভাবী ফল দারুণ বেদনা। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকের মতে যা বাইরে দেয়াল নামক জড় বস্তু বলে প্রতীয়মান হয় তা আমাদের মনের কতকগুলি প্রত্যয় সমষ্টি বই অন্য কিছু নয়—দেয়াল একটা রূপের রংয়ের প্রত্যয় মাত্র ; এবং মাথা ঠোকার ফলে যে বেদনার অনুভূতি হয় তা-ও তো একটা অনুভূতিই। এ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। ইংল্যাণ্ডে প্রথম idealism বা বিজ্ঞানবাদ প্রচার করেন বিশপ বার্কলে (Berkeley) নামক এক ইংরেজ দার্শনিক। ডাঃ সেমুয়েল জনসন ছিলেন সে যুগের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। জনসন সাহেবের বার্কলের বিজ্ঞানবাদে বা idealism-এর প্রতি অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। একদিন বার্কলের বিজ্ঞানবাদের প্রসঙ্গ উঠলে জনসন সাহেব সজোরে মাটিতে পা ঠুকে বললেন : Thus do I trample on this foolish doctrine। জনসন সাহেব মনে করলেন তিনি বিজ্ঞানবাদের অসারতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ

করলেন, কারণ পদাঘাত করে তিনি ভূমি যে জড় বস্তু প্রত্যয় মাত্র নয় তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলেন। কিন্তু উত্তরে বিজ্ঞানবাদী বলবেন জনসন সাহেবের পদাঘাত ক্রিয়াটাও একটা প্রত্যয় বই আর কিছু নয়; তাঁর যে আঘাতের অনুভূতি হলো তা-ও তো একটা প্রত্যয়ই। এইরূপে দেখা গেল জড় ও চেতনের অস্তিত্ব সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে নানা মত।

আমাদের দেশের বৌদ্ধ দার্শনিকগণ আরো অগ্রসর হয়ে বলেন, কেবল বাইরের জড় বস্তুর অস্তিত্বেরই প্রমাণাভাব নয়, আত্মারও কোন অস্তিত্ব নেই—সর্বং শূন্যং, সর্বং ক্ষণিকং। ইংল্যাণ্ডে হিউম নামক দার্শনিকও বলেছেন আমরা যা জানি তা আমাদের প্রত্যয় মাত্র। আত্মার সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তা-ও প্রত্যয় ছাড়া আর কিছু নয়; তাই আত্মার অস্তিত্বেরও কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু আমাদের ষড়দর্শনে—বেদান্তে ও অন্য পাঁচটি দর্শনে বলা হয় আত্মা স্বতঃসিদ্ধ। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হলে কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়—প্রত্যয়গুলি যার উপলব্ধির বিষয় তা-ই হলো আত্মা। আমাদের ষড়দর্শনে, ইউরোপীয় দর্শনের ন্যায়, আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ করার চেষ্টা বাহুল্য বোধে আদৌ করা হয় নি। অবশ্য চার্বাক বা লোকায়ত দর্শনে বলা হয়েছে আত্মা বলে কিছু নেই; অতএব অমরতা ও পুনর্জন্ম মিথ্যা কল্পনা মাত্র; মানুষ দেহ-সর্বস্ব জীব, এবং ভস্মীভূত দেহের পুনর্জন্ম সম্ভব নয়।

শ্রীঅরবিন্দের জড় ও চেতনের ব্যাখ্যা

এইবার শ্রীঅরবিন্দ জড় ও চেতনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে আসা যাক্। শ্রীঅরবিন্দের মতে জড় ও চেতন দুই-ই সত্য; আর জড় ও চেতন মূলত এক; এবং জড় ও চেতন একই সত্তার দুই প্রান্ত। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা দ্বারাই তাঁর এই মতগুলির ব্যাখ্যা করা যাক।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থটি লিখেছেন এ কথাটা প্রমাণ করার জন্য যে একদিন এই পৃথিবীতেই দিব্যমানবের আবির্ভাব হবে। তিনি ঐ পুস্তকের গোড়ায় লিখেছেন: The affirmation of a divine life upon earth……can have no base unless we recognise not only eternal spirit as the inhabitant of this bodily mansion, the wearer of this mutable robe, but accept Matter as a fit and noble material out of which the spirit weaves constantly His garbs, builds recurrently the unending series of His

mansions (p.-8). এখানে অল্প কথায় শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের অনেক কিছু আমরা পাচ্ছি, এবং তা এই :—তাঁর কথা একদিন এই পৃথিবীতে দিব্য জীবন দেখা দেবে, আর দেহ মরণশীল কিন্তু আত্মা অমর। এই বিশ্বাস ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে যদি আমরা এ কথাটা অস্বীকার করি যে এই দেহ-গৃহ অমর আত্মার আবাস, এবং আত্মাই এই বিনাশী-বসন অর্থাৎ দেহ-বসন বারবার পরিধান করে থাকে। শুধু তাই নয়; আমাদের একথাটাও স্বীকার করতে হবে, যে জড় বস্তু থেকে আত্মার এই আবাস ও বাস নির্মিত হয়ে থাকে, সেই জড় বস্তুও একটি উপযুক্ত উপাদান, তুচ্ছ বস্তু নয়। আর এখানে শ্রীঅরবিন্দ একথাটাও বলেছেন যে দেহের বার বার পতন হয়; আত্মাও বার বার নব নব কলেবর ধারণ করে। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ চেতন আত্মা ও জড় দুই-ই সত্য বলেন, এবং পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করেন।

আত্মা আর যা জড় অনাত্মা বলে প্রতীয়মান হয় তা যে বস্তুত একই জিনিসের দুটি দিক এ সত্যটি তিনি তাঁর The Life Divine গ্রন্থে দেখিয়েছেন। তাঁর কথা : "The sharp division which practical experience and long habit of mind have created between Spirit and Matter has no longer any fundamental reality.······ The two are one : Spirit is the soul and reality of that which we sense as Matter ; Matter is a form and body of that which we realise as Spirit (p-221-222)। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে কাজের খাতিরে ও দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে আমরা আত্মা ও জড় পদার্থের মধ্যে যে ভেদ সৃষ্টি করেছি তা বস্তুত সত্য নয়। দুই-ই এক। আমাদের নিকট যা জড় বলে প্রতীয়মান হয় আত্মা হলো তার অন্তরস্থ সত্তা; আর যাকে আমরা আত্মা বলে অনুভব করি জড় হলো তার বহিরাবরণ। এ কথা সত্য যে শ্রীঅরবিন্দের মতে চেতন আত্মা ও জড় দুই-ই সত্য।

জড় ও চেতন আত্মা দুই-ই সত্য; কেবল তা-ই নয়। শ্রীঅরবিন্দের মতে দুয়ের মধ্যে রয়েছে মূলগত ঐক্য; তাঁর নিজের কথায় identity in essence (The Life Divine p.-8)। এই প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য; "The spirit is everywhere, even in matter ;—in fact matter itself is only an obscure form of the spirit." (Synthesis of oYga p.-906).

জড় ও চেতন সম্পর্কে তাঁর আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে 'Spirit and Matter are the two extreme terms of existence'—অর্থাৎ তারা যেন সত্তার দুই চরম প্রান্ত।

তিনি চেতনার বিশ্লেষণ করে এ কথাটার ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে সে কথাটারও একটু উল্লেখ করা যেতে পারে। পরে অতিমানস বিজ্ঞান ও মনের প্রসঙ্গে তার বিস্তৃত আলোচনা করা দরকার হবে। শ্রীঅরবিন্দ চেতনার বিভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সৃষ্টির সর্ব স্তরে চেতনা বিদ্যমান। (মানব চেতনাকে বা মনকে তিনি বলেন এক মধ্যবর্তী স্তর। মানব-চেতনার নিম্নে রয়েছে পশুর সহজ-জ্ঞান বা instinct। ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদের যে চেতনা তাকে বলা যায় অবচেতন। এবং সৃষ্টির সর্ব নিম্ন স্তর জড় জগতেও চেতনা রয়েছে; তবে তা চেতনার আকারে প্রকাশিত না হলেও তাকে সুপ্ত চেতনা বলতে হয়। আবার মানব চেতনার নিম্নে যেমন এইসব সহজজ্ঞান, অবচেতন ও সুপ্ত চেতনের স্তর তেমনি মানব চেতনার উর্ধ্বেও মানব চেতনার অপেক্ষা কতকগুলি শ্রেষ্ঠতর চেতনার স্তর রয়েছে—শ্রীঅরবিন্দ তাদের কতকগুলির নামও দিয়েছেন; যথা Higher Mind, Illumined Mind, Overmind প্রভৃতি। চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে, শ্রীঅরবিন্দের মতে, পরমাত্মা বা সচ্চিদানন্দের অতিমানস জ্ঞান। এই অতিমানস জ্ঞান বা "বিজ্ঞান" বা supermind শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের একটি মূল কথা; তার বিস্তৃততর আলোচনা অন্যত্র করতে হবে। এখানে আমরা দেখলাম বিশ্বসত্তার সর্ব নিম্ন স্তরে রয়েছে জড় এবং জড় চেতনেরই সুপ্তরূপ; আর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে চেতনের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ অতিমানস বিজ্ঞান। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেন জড় আর চেতন are the two extreme terms of existence.)

জড় ও চেতনের মূলগত ঐক্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তৈত্তিরীয় উপনিষদের প্রসিদ্ধ উক্তি "অন্নম্ ব্রহ্মেতি" কথাটির এবং ঋষি ভৃগুর কাহিনীটির উল্লেখ করেছেন। স্মরণ রাখতে হবে দর্শনের ভাষায় "অন্ন" কথাটির অর্থ Matter। শ্রীঅরবিন্দ নানা স্থানে বিভিন্নভাবে তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগু ঋষির কাহিনীটি ব্যবহার করেছেন। কাহিনীটি এই :—

ভৃগু পিতা বরুণের নিকট গিয়ে বললেন, "ভগবান, আমাকে ব্রহ্ম কী বলুন।" বরুণ বললেন, "যা হতে এই অখিল ভূত সমূহ উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হয়ে যাঁতে জীবিত থাকে এবং বিনাশকালে যাঁতে গমন করে ও যাঁতে বিলীন হয় তিনি ব্রহ্ম।

তপস্যা দ্বারা, ধ্যান দ্বারা ব্রহ্মকে জানতে সচেষ্ট হও।" ভৃগু ধ্যান করে শেষে বুঝলেন "অন্নং ব্রহ্ম" অর্থাৎ জড়ই ব্রহ্ম। কিন্তু ভৃগু ইহা জেনে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না; জড়ই সব নয়। জড় থেকে প্রাণ স্বতন্ত্র। তিনি পিতার নির্দেশে আবার ধ্যান করতে লাগলেন। শেষে তাঁর এই বোধ জন্মালো যে প্রাণই ব্রহ্ম। কিন্তু প্রাণও তো শেষ কথা নয়; চেতন মন প্রাণ থেকে ভিন্ন। ভৃগু আবার ধ্যানে বসলেন, এবং এই উন্নততর উপলব্ধি লাভ করলেন যে "মনো ব্রহ্মেতি"—মন বা চেতনই ব্রহ্ম। কিন্তু এখানেও ভৃগুর তপস্যার ও জানার শেষ হলো না। চৈতন্যের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ আছে: পশুর সহজজ্ঞানও (instinct) এক প্রকারের চৈতন্য আবার মানব মনের চৈতন্য এবং মানব-চৈতন্যের উর্ধ্বে যে "বিজ্ঞানের" স্তর আছে, এবং যে স্তরে মানব সাধনার দ্বারা উঠতে পারে তা-ও তো এক প্রকারের, উন্নত ধরনের, চৈতন্য। তা-ই ভৃগুর পরবর্তী উন্নততর উপলব্ধি হলো "বিজ্ঞানম্ ব্রহ্মেতি" অর্থাৎ "বিজ্ঞানই" ব্রহ্ম। এখানে 'বিজ্ঞান' অর্থ science যে নয়, এবং 'বিজ্ঞান' বলতে যে পূর্বোক্ত supermind-কে লক্ষ্য করা হয়েছে তা স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু এই উপলব্ধি লাভ করেও ভৃগু বুঝলেন ইহাও জ্ঞানের শেষ কথা বা সব কথা নয়। শেষে তপস্যা ও ধ্যানের দ্বারা ভৃগু বুঝলেন "আনন্দো ব্রহ্মেতি" আনন্দই ব্রহ্ম; কারণ আনন্দ থেকে এই ভূত সমূহের উৎপত্তি, আনন্দেই জীব সমূহ জীবিত থাকে, এবং অবশেষে আনন্দাভিমুখে গমন করে ও আনন্দে বিলীন হয়। এখানে ভৃগুর ব্রহ্মান্বেষণ শেষ হলো; কারণ আনন্দের স্তরে উঠলে ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দের অপর দুই বিভাব সৎ ও চিতের উপলব্ধিও সহজ হয়। জড়, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের পেছনে যে একই সত্তা বিদ্যমান, এবং সেই সত্তা যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এই উপলব্ধি লাভ হলে ভৃগুর ব্রহ্মোপলব্ধি সম্পূর্ণ হলো। শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভৃগু ঋষির এই কাহিনীর মর্মই এই যে সর্ব নিম্ন স্তর জড় এবং সর্বোচ্চ স্তর সচ্চিদানন্দ, এবং মধ্যবর্তী স্তর প্রাণ, মন প্রভৃতি সর্ব স্তরেই একই চৈতন্য বিরাজমান; অর্থাৎ যা "জড়" রূপে প্রতীয়মান আর পূর্ণ-চৈতন্য তা হলো শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় the two extremes of existence—সত্তার দুই চরম প্রান্ত।

বেদান্ত ও গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব

পূর্বেই বলা হয়েছে বেদান্ত ও গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব আর সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য আছে; এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতার মতের সমর্থক। শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যার পূর্বে এ বিষয়ে গীতা ও বেদান্তের সঙ্গে

সাংখ্যের পার্থক্য কোথায় দেখা দরকার। প্রথমত সাংখ্য মতে প্রকৃতি আপনিই এই বিশ্ব-চরাচর সৃষ্টি করতে সক্ষম—প্রকৃতির এক নাম "প্রসব-ধর্মিনী" অর্থাৎ সৃষ্টি করাই যার ধর্ম বা স্বভাব। তাই সাংখ্য মতে প্রকৃতির (ও পুরুষের) অতিরিক্ত কোন স্বতন্ত্র জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর স্বীকার করা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু বেদান্ত-দর্শনের (ও গীতার) মতে এবং বেদান্তেও বা উপনিষদেও বলা হয়েছে যে, সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রটি এই : "জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ যাঁ হতে এই জগতের জন্মাদি—জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়—সংঘটিত হয় তাঁ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা।

দ্বিতীয় প্রকৃতি বা প্রধান যে জগৎকারণ হতে পারে না বেদান্ত-দর্শনের "ঈক্ষর্তেনাশব্দম্" এই পঞ্চম সূত্রে তা বলা হয়েছে। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলেছেন : "জগৎকারণের শক্তি যে ঈক্ষণ (অর্থাৎ সংকল্প) তা প্রধানের নেই, কেননা তা শ্রুতি-প্রমাণ-সম্মত নয়।" (লক্ষ্যণীয় যে প্রমাণের জন্য শ্রুতির দোহাই-ই বেদান্ত-দর্শনের পক্ষে যথেষ্ট)

উপনিষদ্‌ও এই বিষয়ে সাংখ্য মতের বিরোধী, ছান্দোগ্য-উপনিষদের বিখ্যাত মন্ত্র "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান……" (৩।১৪।১) তার একটি প্রমাণ। মন্ত্রটির অর্থ—"এই সমস্ত জগৎ স্বরূপত ব্রহ্মই, কারণ তাঁ হতেই উহা জাত হয়, তাঁতেই লীন হয় এবং তাঁতেই জীবিত থাকে।" (তজ্জ=তাঁ হতে জাত ; তল্ল= তাঁতেই লীন হয় ; এবং তদনম্=তাঁতেই জীবন ধারণ করে অর্থাৎ স্থিত আছে।)

জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে কী ছিল, সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত আমরা পরে আলোচনা করব। এখানে এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য কী বলে তা দেখা যাক্। সাংখ্য মতে সৃষ্টির পূর্বে অনাদি পুরুষ ও অনাদি প্রকৃতি ছিল, কিন্তু বেদান্ত একথা স্বীকার করে না। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২।১) বলা হয়েছে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্…… ; "কথং অসতঃ সজ্জায়েতেতি" (৬।২।২)। অর্থাৎ আরুণি ঋষি পুত্র শ্বেতকেতুকে বলেন, "হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎ অদ্বিতীয় পরমাত্মাই ছিলেন।…অভাব থেকে ভাবের উৎপত্তি কী ভাবে হবে? অর্থাৎ যা নাই তা থেকে যা আছে তা কী ভাবে উৎপন্ন হবে?" আর একাধিক উপনিষদে বলা হয়েছে "সোৎকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"—অর্থাৎ "সেই পরমাত্মা এই কামনা করলেন যে আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব।" এইরূপে বেদান্ত ও বেদান্ত-দর্শন থেকে নানা দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে যে সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের ইচ্ছা। স্মরণীয় যে সৃষ্টির

আগেকার এই অব্যক্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে শ্রীঅরবিন্দ The One, এবং সৃষ্টির পরবর্তী ব্যক্ত চরাচর জগতকে The Many বলেন।

সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে আর একটি বিরোধ। পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি, সাংখ্যের এই উক্তি বেদান্তের অগ্রাহ্য। যা অনাদি তা অনন্ত; দুই অনন্ত সম্ভব নয়। বেদান্ত মতে পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি নয়। তারা পরমাত্মার দুই বিভূতি—পরমাত্মা তাদের মূল। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা হলো সব কিছুকে একের কোঠায় আনা। বেদান্ত সব কিছুকে একের মধ্যে দেখে; তাই সাংখ্যের দ্বৈতবাদ—পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈত—বেদান্ত স্বীকার করে না। শ্রীঅরবিন্দ সাংখ্য ও গীতার পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব নিয়ে বিরোধ এই ভাবে দেখিয়েছেন: "In the Sankhya analysis Purusha and Prakriti by their dualism are the causes of the cosmos , in the synthetic view of the Gita Purusha by his Prakriti is the cause of the cosmos (Essays on the Gita p.-70). শ্রীঅরবিন্দ গীতার মর্তের সমর্থক এবং সাংখ্যের দ্বৈতের বিরোধী।

বেদান্ত ও গীতা সাংখ্যের বহু পুরুষ স্বীকার করে না। সাংখ্যের পুরুষ হলো জীব; এবং জীব বহু। বেদান্ত ও গীতার মতে পুরুষ এক বহু নয়। আর সাংখ্য মতে প্রকৃতি এক; গীতায় প্রকৃতিকে পরা ও অপরা এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমরা পরা প্রকৃতির এবং জীবের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে এই সব বিষয়ের আলোচনা করবো। এখানে এই কথাটা বলা দরকার যে পরমাত্মা হতে পুরুষ ও প্রকৃতি পরমাত্মার এই দুই বিভূতির উদ্ভবের পর সৃষ্টির যে ক্রম সাংখ্যে বর্ণিত হয়েছে তা গীতারও মান্য, এবং শ্রীঅরবিন্দ তার সমর্থন করেন।

শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যা

সৃষ্টির আগে কী ছিল সে সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদের আপাতবিরোধী মতের উল্লেখ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থে করেছেন এবং দুই মতের সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত"। (২।৭) শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা: In the beginning all this was Non-Being. It was thence that Being was born (The Life Divine p.-28). এখানে Being

বলতে নামরূপাত্মক জগৎ বোঝায়; এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতে এই নামরূপাত্মক বিশ্বের উদ্ভব যা থেকে হয়েছে তা Non-Being। তিনি The Life Divine গ্রন্থে Non-Being বা অসৎ কথাটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন: What was evidently meant by the Asat (অসৎ) or Non-being or non-existent of the Taittiriya Upanishad was a supreme state of Sachchidananda which alone was in the beginning and out of which the existent (নামরূপাত্মক জগৎ) was born and possibly too it may be the inmost sense of the Nirbana of the Buddha (The Life Divine p. 507). তৈত্তিরীয় উপনিষদের এই অসৎ আর ছান্দোগ্যের সৎ বা পরমাত্মা যাঁর ঈক্ষণের বা কামনার ফল জড়, প্রাণ, মনোময় এই বিশ্বচরাচর, একই তত্ত্ব। আর আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের মতে জড়, প্রাণ ও মনের পিছনে একই শক্তি সক্রিয়, এবং এই তিনের মধ্যে in essence অর্থাৎ মূলত কোন বিরোধ নেই। শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেন যে The Energy that creates the world can be nothing else than a will and will is only consciousness applying itself to a work and a result. (The Life Divine p. 15). অর্থাৎ যে শক্তি বিশ্বের স্রষ্টা তা পরমাত্মার ইচ্ছা-শক্তি এবং এই ইচ্ছা-শক্তি সচেতন ভাবে একটি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যেরই অভিমুখী হয়ে থাকে। এই লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন পরমাত্মার আত্ম-সংকোচন বা Self-involution ও আত্ম-উন্মীলন বা Self-evolution। Self-involution ও Self-evolution-কে যথাক্রমে পরমাত্মার Descent বা অবতরণ ও Ascent বা আরোহণ বলা হয়। এই Involution ও Evolution—পরমাত্মার Descent ও Ascent—কথাগুলির দ্বারা শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝেন তা বুঝলে শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও সেই ব্যাখ্যায় নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্য কী তা বোঝা যাবে। জগতে পরমাত্মার এই Descent ও Ascent-এরই লীলা চলছে।

পূর্বে বলা হয়েছে গীতা বেদান্তের দিক থেকে সাংখ্যের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে; এবং শ্রীঅরবিন্দ গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব সমর্থন করেন। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই অনাদি তত্ত্ব; গীতার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ পরমাত্মার দুই বিভূতি; অর্থাৎ পরমাত্মা থেকে দুয়ের উৎপত্তি। তাই তারা অনাদি নয়। সাংখ্য মতে পুরুষের সান্নিধ্যে বুদ্ধি, অহংকার পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতির পর্যায়ের ভিতর দিয়ে

প্রকৃতি বিশ্ব-চরাচর রূপে পরিণত হয়। সাংখ্যের এই সৃষ্টিক্রমকে প্রকৃতির involution বা descent এই নাম দেওয়া যায়। তবে সাংখ্য মতে প্রকৃতি জড়, তাই এই involution হলো জড়েরই involution। শ্রীঅরবিন্দ যে involution-এর কথা বলেন তা হলো পরমাত্মার পূর্ণ-জ্ঞানের (যাকে উপরে Supermind বলা হয়েছে) involution বা ক্রম-সংকোচন। শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিক্রমের ব্যাখ্যা এই :—সৃষ্টির সূচনায় সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞান ক্রমশ নিম্নগামী বা সংকুচিত হতে থাকে অর্থাৎ অপূর্ণতর হতে থাকে। মানব মনের জ্ঞান হলো, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, Ignorance striving after knowledge। সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞান ক্রমশ কয়েকটি স্তরের ভিতর দিয়ে সংকুচিত হতে হতে মানব জ্ঞানের রূপ ধারণ করে; কিন্তু এখানেই সংকোচনক্রিয়ার শেষ নয়। প্রাণের অর্থাৎ ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদের অবচেতন জ্ঞানে এবং শেষে জড়ের সুপ্ত চেতনে নেমে এলে সংকোচনক্রিয়ার শেষ হয় এবং বিশ্ব-চরাচর প্রকট হয়। এর নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন পরমাত্মার পূর্ণজ্ঞানের involution বা Descent of the spirit into the world of Ignorance। তাই অন্যত্র তিনি সৃষ্টির এই সংজ্ঞা দিয়েছেন: creation is a plunge of the Spirit into Ignorance। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে শক্তি বিশ্বে সক্রিয় এই involution হলো তার ক্রিয়ার একটি দিক,—একটি দিক মাত্র। আমরা দেখবো সেই শক্তির ক্রিয়ার অপর দিক হলো self-evolution।

শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টি-তত্ত্বের ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য

কেন সৃষ্টিতে পরমাত্মার পূর্ণজ্ঞানের এই ক্রম-সংকোচন, সেই প্রশ্ন অবান্তর নয়। সৃষ্টি কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য বলে প্রকৃতি পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য জগৎ-পশরা সাজায়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন সৃষ্টি হলো পরমাত্মার The Great Sacrifice, নানা স্থানেই তিনি একথা বলেছেন (Riddles Of This World, p. 97. The Mother p. 46)—অর্থাৎ সৃষ্টিকে বলা যায় 'পুরুষ-যজ্ঞ'। পুরুষ-যজ্ঞ কথাটির অর্থ কী? যজ্ঞের একটি প্রধান অঙ্গ বলি বা ত্যাগস্বীকার। বলি ভিন্ন যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। সৃষ্টি-ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পরমাত্মা পার্থিব জীবনের ও মানব মন, প্রাণ ও দেহের (জড়) অপূর্ণতা যেন বরণ করেছেন। এই অপূর্ণতা-বরণ কেন, তার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলেন এ-ই হলো পরমাত্মার লীলা বা আনন্দের খেলা—স্বেচ্ছায় "আত্মদান"। তাই প্রাচীন ঋষিগণ পরমাত্মাকে বলেছিলেন "আত্মদ"। Poems Past and

Present নামক শ্রীঅরবিন্দের এক কবিতা পুস্তকের A God's Labour শীর্ষক কবিতাটি থেকে নিম্নের উদ্ধৃতি ঋষিদের দেওয়া পরমাত্মার "আত্মদ" নামটির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। উদ্ধৃতিটি এই :—

"He who would bring the heavens here,
Must descend himself into clay
And the burden of earthly nature bear
And tread the dolorous way……"

(Quoted in Sri Aurobindo on Himself
And on The Mother p. 222)

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Synthesis of Yoga গ্রন্থে ১২০ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তা-ও উল্লেখযোগ্য। সেখানে তিনি বলেছেন : This descent, this sacrifice of the Purusha submitting itself to Force and Matter that It may inform and illumine them is the seed of the redemption of this world of Inconscience and Ignorance. সৃষ্টিতে নেমে এসে সচ্চিদানন্দ যে অপূর্ণতা বরণ করেছেন তার মধ্যে নিহিত রয়েছে মুক্তির বীজ। সচ্চিদানন্দের আত্মদানের ফল হবে মুক্তি ; যেমন খ্রীষ্টান মতে খ্রীষ্টের আত্মোৎসর্গ জীবের পরিত্রাণের পথ মুক্ত করেছিল। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে সাংখ্য এবং বেদান্তও জীবের বা পুরুষের মুক্তির কথাই বলে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলেছেন redemption of this world of Inconscience and Ignorance। পূর্বে বলা হয়েছে যে জড়ে চেতনা সুপ্ত ; এবং world of Inconscience হলো জড় জগৎ বা সুপ্ত চেতনার জগৎ, আর world of Ignorance মানব মনের জগৎ। এখানে ইঙ্গিতে শ্রীঅরবিন্দ এই কথাটাই বললেন যে কেবল মানব মনের নয় মানবের জড় দেহেরও দিব্য পরিবর্তন হবে। আমরা দেখবো শ্রীঅরবিন্দের মুক্তির বা দিব্য জীবনের ধারণার এই হলো বৈশিষ্ট্য। দেহের দিব্য পরিবর্তন বলতে কী বোঝায় তা আমাদের পরে আলোচনা করতে হবে।

বিজ্ঞানের Evolution বা ক্রমবিকাশের তত্ত্ব

পরমাত্মার পূর্ণ-জ্ঞানের ক্রম-সংকোচন বা self-involution বলতে শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝেন তা দেখা গেল। এখন, self-evolution কথাটির

তিনি কী ব্যাখ্যা করেন দেখতে হবে। তার আগে বিজ্ঞানে সুপরিচিত Evolution কথাটির আলোচনা দরকার। উনিশ শতকের মধ্যভাগে চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত যুগান্তকারী গ্রন্থ The Origin of Species প্রকাশের পর Evolution বা ক্রমবিকাশ কথাটি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। (বাইবেলের Genesis বা সৃষ্টি-প্রকরণ খণ্ডে বর্ণিত আছে যে ঈশ্বর ছয় দিন মাত্র সময়ের মধ্যে বিবিধ জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণী ও তৎসঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ আর উদ্ভিদাদি সহ সসাগরা পৃথিবী সৃষ্টি করেন; এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য সমাপনান্তে বিশ্রাম করেন।) অর্থাৎ বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে আজকের প্রাণী ও উদ্ভিদাদি চিরদিন একইভাবে একই আকারে রয়েছে। (ডারউইনের আগে এই ছিল খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস। ডারউইন অকাট্য প্রমাণ দ্বারা দেখালেন যে নানা অবস্থা, নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে লক্ষ লক্ষ বছরে আজকের প্রাণী ও উদ্ভিদাদি ধীরে ধীরে তাদের বর্তমান আকার পেয়েছে। ডারউইনের গ্রন্থ বাইবেলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করায় সে যুগের ইউরোপে বিশ্বাসী খ্রীষ্টানগণ যে এক মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন তা সহজেই অনুমেয়। একদিকে তাদের চিরদিনের ধর্মবিশ্বাস অপরদিকে বিজ্ঞানের অকাট্য যুক্তি তাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললো। "ধর্ম গেল, ধর্ম গেল" বলে চারিদিক থেকে সোরগোল উঠলো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ সকলকেই নতশিরে মেনে নিতে হলো।)

বিজ্ঞান আর একটি জিনিস প্রমাণ করলো যে ক্রমবিকাশের ধারা সব সময়েই from simple to complex—সরলতা থেকে জটিলতার অভিমুখী। এই মূল সত্য সকল বিজ্ঞানেই আজকাল স্বীকৃত এবং এই সূত্রের সাহায্যে প্রাণী-বিজ্ঞান দেখালো যে আদিপ্রাণ ছিল এক-কোষ-বিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র এক প্রাণ-খণ্ড। এই ক্ষুদ্র প্রাণখণ্ড চর্মচক্ষুর অগোচর কিন্তু অণুবীক্ষণের গোচর। সেই আদি প্রাণখণ্ডকে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ, খাদ্যগ্রহণ ও খাদ্য-জীর্ণকরণ প্রভৃতি সকল প্রকার জৈবক্রিয়াই করতে হতো, কিন্তু সেজন্য তার মধ্যে ঐ সকল জৈবক্রিয়া সম্পাদনের উপযোগী বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আবির্ভাব তখনও হয় নি। ক্রমে লক্ষ লক্ষ বছরে ঐ আদি এক-কোষ-বিশিষ্ট প্রাণখণ্ড থেকে বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমন্বিত ও লক্ষ লক্ষ কোষের সমবায়ে গঠিত আজকের মানবদেহ ও অপর সকল জটিল উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীদেহসমূহের আবির্ভাব হলো। প্রথম বহু-কোষ-বিশিষ্ট প্রাণীদেহে মেরুদণ্ড ছিল না। প্রথম প্রাণের আবির্ভাবের

লক্ষ লক্ষ বছর পরে প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণী মাছের আবির্ভাব হলো। পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাব তার বহু পরের ঘটনা। মানবদেহের গঠনে তার উৎপত্তির ও ক্রমবিকাশের এই ইতিহাস প্রাণীবিজ্ঞানীর নিকট ধরা পড়েছে। ভাবতে বিস্ময়লাগে যে গান্ধীজী ও শ্রীঅরবিন্দের ন্যায় মহাপুরুষের দেহেরও উদ্ভব এক অতি ক্ষুদ্র অনুবীক্ষণ-গ্রাহ্য আদি প্রাণখণ্ড থেকে।

ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ও উপনিষদের বিভিন্ন মত

কেন জীব ও উদ্ভিদ্ দেহে এই বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে তার কারণ হিসাবে ডারউইন জীবন-সংগ্রামে প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতায় যোগ্যতমের টিকে থাকা, যৌন নির্বাচন প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ জগতের উৎপত্তির এই ব্যাখ্যাই যথার্থ বা পূর্ণ ব্যাখ্যা বলে গ্রহণ করেন না। তাঁর কথা: "জীবিকার্থ সংঘর্ষে জগৎ গঠিত, জগতের ক্রমোন্নতি সাধিত, ইহাই য়ুরোপীয়দের বিজ্ঞানের মুলমন্ত্র।····ভারতীয় আর্যগণের বিশ্বাস এই বিশ্ব আনন্দধাম, প্রেম সত্য ও শক্তি বিকাশের জন্য সর্বব্যাপী নারায়ণ স্থাবর-জঙ্গমে, মনুষ্য পশু ও কীট পতঙ্গে, সাধু-পাপীতে, শত্রু-মিত্রে, দেব-অসুরে প্রকাশ হইয়া জগৎময় ক্রীড়া করিতেছেন। ক্রীড়ার জন্য সুখ, ক্রীড়ার জন্য দুঃখ, ক্রীড়ার জন্য পাপ, ক্রীড়ার জন্য পুণ্য, ক্রীড়ার জন্য বন্ধুত্ব, ক্রীড়ার জন্য শত্রুতা, ক্রীড়ার জন্য দেবত্ব, ক্রীড়ার জন্য অসুরত্ব। মিত্রশত্রু সকলেই ক্রীড়ার সহচর। দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সৃষ্টি করিয়াছে।" (ধর্ম ও জাতীয়তা ৭১ পৃষ্ঠা) শ্রীঅরবিন্দ লীলাবাদী; এবং তাঁর জগৎসৃষ্টির ব্যাখ্যা লীলাবাদের দিক থেকে ব্যাখ্যা। শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিতত্ত্বের এই ব্যাখ্যা উপনিষদের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যারই অনুরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদের "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে······" কথাটিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় শ্রীঅরবিন্দের সৃষ্টিতত্ত্বের উপরোক্ত ব্যাখ্যায়।

Involution ও Evolution মিলে সৃষ্টির পূর্ণচক্র

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ও শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যায় মূল প্রভেদ কোথায় দেখা যাক। শ্রীঅরবিন্দের মতে self-involution ও self-evolution এই দুয়ে মিলে যেন সৃষ্টির একটি পূর্ণচক্র বা বৃত্ত রচনা করে। তাঁর কথা Evolution is an inverse relation of Involution. Spirit is a final evolutionary emergence because it is the original involutionary element and factor (The Life Divine, p. 759)। তিনি অন্যত্র বলেছেন "Only what is involved can

evolve." আবার এই কথাটি অন্য ভাষায় আরো পরিষ্কার করে তিনি বলেছেন: "What has come from God must return to God." তাই সৃষ্টিতত্ত্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা কেবল self-involution তত্ত্বে কিংবা কেবল self-evolution তত্ত্বে মিলবে না। দুয়ের মিলনেই সৃষ্টিতত্ত্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব। তাই সৃষ্টিতত্ত্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে করেছেন: Creation is a plunge (of the spirit) into ignorance (অর্থাৎ Involution) for the purpose of coming back again……to light and knowledge (অর্থাৎ Evolution)। এখানে তিনি সৃষ্টির সূচনা কীভাবে হয় এবং তার পরিণামই বা কী তা একসঙ্গে বলেছেন। সৃষ্টি হলো পরমাত্মার পূর্ণ-জ্ঞানের অজ্ঞানের স্তরে, দেহ, প্রাণমনের স্তরে অবতরণ (Involution বা Descent)। আর সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আবার দেহপ্রাণ মনের অপূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-জ্ঞানরূপে evolved হয়ে, বিকশিত হয়ে ওঠা; (Evolution বা Ascent)। দেখা গেল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তার সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় Involution-এর কোন খোঁজ রাখে না, রাখতে চায়ও না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের মতে সৃষ্টির সুরু হয় জড়ের স্তরে; তার আগে কী ছিল তা বিজ্ঞানের আলোচ্য নয়; আর বিজ্ঞানের মতে মানব মনের স্তরে এসেই ক্রমবিকাশের ধারা সমাপ্ত হয়েছে। মানসজ্ঞানের পরিণতি হবে অতিমানসজ্ঞানে—এ সব কথা বিজ্ঞানের আলোচনার বহির্ভূত। মানুষের মস্তিষ্ক ও মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; এবং মস্তিষ্ক-বিরহিত কোন জ্ঞানের সম্ভাবনা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। বিজ্ঞানের মতে পশুর ও ইতর প্রাণীর স্তর অতিক্রম করে মানুষে এসেই মস্তিষ্কের চরম উন্নতি হয়েছে এবং ঐখানেই মনের উন্নতির ও ক্রমবিকাশের ধারার সীমারেখাও টানা হয়েছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে মনের ঊর্ধ্বে উঠে যেদিন মানব-মন অতিমানস স্তরে আরোহণ করবে সেদিন হবে সৃষ্টির ক্রম-বিকাশের ধারার পরিসমাপ্তি। জড় কোথা থেকে এলো বিজ্ঞান তা জানে না; আর ক্রমবিকাশের ধারায় মানব-মনের পরে কিছু যে সম্ভব বিজ্ঞান তা-ও মানে না। বিজ্ঞান সৃষ্টি-ক্রমের একটি অংশের ব্যাখ্যা করে মাত্র; তাই বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ।

এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। জড় ও চেতনের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি যে শ্রীঅরবিন্দের মতে জড় ও চেতনের মধ্যে মূলত (in essence) ঐক্য, কিন্তু তারা হলো the two extreme terms of

existence। শ্রীঅরবিন্দের involution ও evolution-এর সংজ্ঞায়ও সেকথাটিই তিনি একটু অন্য ভাবে বলেছেন। Involution প্রক্রিয়ার সূচনা সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞান থেকে, এবং তার পরিসমাপ্তি জড়ে; তাই সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞান আর জড় এখানে দুই প্রান্ত, যথাক্রমে আদি আর অন্ত। আবার evolution প্রক্রিয়ার সূচনা জড়ে এবং পরিসমাপ্তি সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞানে। এখানেও জড় ও চেতন দুই প্রান্ত, তবে এখানে জড় আদি আর চেতন অন্ত। তাই শ্রীঅরবিন্দের কথা Matter is the nether-most stage, Spirit is the summit. (The Life Divine, p. 591)। এ কথা স্মরণ রাখলে involution ও evolution সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিম্নোক্ত উক্তিটির অর্থও বোঝা যাবে। উক্তিটি এই: involution is plunge into night; and evolution is emergence into a new unprecedented day. (Riddles Of This World, p. 97) unprecedented কথাটির অর্থ এই যে evolution এখনও সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠে নি, কিন্তু একদিন সত্য হবে। কীভাবে তা হবে তা বোঝা যায় শ্রীঅরবিন্দ evolution-এর ধারাপথের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে। ব্যাখ্যাটি এই:

Evolution-এর তিনটি সোপান

ক্রমবিকাশের ধারা একটি সুদীর্ঘ ধারা; কোন্ সুদূর অতীতে তার সূচনা হয়েছিল। পর পর তিনটি ধাপে ক্রমবিকাশের পরিসমাপ্তি। প্রথম ধাপ হলো যা হয়ে চুকেছে, অর্থাৎ যার পূর্ণ-বিকাশ হয়েছে, যার আর বিশেষ কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে জড় ও প্রাণের আবির্ভাব। শ্রীঅরবিন্দের মতে জড় ও প্রাণ সুব্যবস্থিত ও স্থিতিশীল। ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় ধাপ হলো যার আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু এখনও যার পূর্ণ-পরিণতি লাভ হয় নি। দৃষ্টান্ত মন-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব। মানুষের মন অজ্ঞান ও অর্ধজ্ঞানের স্তর—Ignorance striving after knowledge। মানব-মনের পূর্ণ-পরিণতি এখনও হয় নি। ক্রমবিকাশের তৃতীয় ধাপ হলো যার সূচনা এখনও হয় নি, কিন্তু ভবিষ্যতে হতে বাধ্য। তার দৃষ্টান্ত ভবিষ্যৎ-দেবমানব বা পৃথিবীতে সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞানের অভিব্যক্তি। প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ধারায় এখনও দেবমানবের যে আবির্ভাব হয় নি সেকথা সত্য; কিন্তু মানুষে এসেই ক্রমবিকাশের ধারার অবসান হয় নি। একদিন মানুষকে দেবমানব হয়ে উঠতে হবে। এই হলো শ্রীঅরবিন্দের স্বপ্ন।

মানবদেহে দেবমানবের আবির্ভাব সম্পর্কে উপনিষদ্

মানবদেহেই যে দেবমানবের আবির্ভাব হবে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এই মতের সমর্থন পেয়েছিলেন ঐতরেয় উপনিষদের একটি উপকথায়; এবং The Life Divine গ্রন্থের ৭৪৫ পৃষ্ঠায় তিনি তা উল্লেখ করেছেন। উপকথাটি আছে ঐতরেয় উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে। উপকথাটি এই: পরমাত্মা মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, স্বর্গ প্রভৃতি সপ্তলোক সৃষ্টি করলেন। তারপর অগ্নি, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি দিকপাল দেবতাগণ সৃষ্ট হলেন। দিকপাল দেবতাগণ তখন পরমেশ্বরকে বললেন, "আমাদের বাসোপযোগী ও কর্মোপযোগী দেহ নির্মাণ করুন।" প্রথমে দেবতাদের নিকট গবাকৃতি একটি দেহ উপস্থিত করা হলো। দেবতাগণ ঐ দেহ তাঁদের যোগ্য মনে করলেন না। একটি অশ্বাকৃতি দেহ তাঁদের নিকট উপস্থিত করা হলো। ঐ দেহও দেবগণের মনঃপুত হলো না। শেষে মানুষের দেহ সৃষ্টি করে তাঁদের নিকট আনা হলে, "হাঁ, এদেহ উত্তমরূপে নির্মিত হয়েছে", এই কথা বলে দেবগণ ঐ দেহে প্রবেশ করলেন। এই তুচ্ছ উপকথার দ্বারা ঋষি একথাটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে তাঁর মতে একদিন মানবদেহেই ভবিষ্যৎ দেবমানবের আবির্ভাব হবে।

Evolution ও যোগ

ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি মতের উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বলেন ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষই হলো প্রকৃতির first thinker; অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই প্রথম বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ হয়েছে; এবং মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে লক্ষ্য স্থির করতে পারে এবং লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় নির্ধারণ করতে পারে। ক্রমবিকাশের নিম্নতর স্তরে, অর্থাৎ জড় থেকে প্রাণের স্তরে, এবং প্রাণ থেকে মনের স্তরে ওঠবার বেলায় প্রকৃতির নিয়মেই আপনা থেকেই লক্ষ লক্ষ বছরে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু মানুষের বেলায় এই নিয়মের, ব্যতিক্রম ঘটবে, অন্তত ঘটার সম্ভাবনা। ক্রমবিকাশের পরবর্তী ধাপে দেবমানবের উদ্ভব হবে মানুষের সজ্ঞান সাধনার ফলে। প্রকৃতির নিয়মে আপনা থেকেই তা হবার নয়। তবে একাজে যোগ হবে মানুষের সহায়ক। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Synthesis of Yoga গ্রন্থে (৫ম পৃষ্ঠায়) স্বামী বিবেকানন্দের কথায় পুনরুক্তি করে বলেছেন: Yoga may be regarded as a means of compressing one's evolution into a single life······of bodily existence. (আমাদের দেশের

জীবন্মুক্তি কথাটি স্মরণীয়)। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে মানুষের ক্ষেত্রে ক্রম-বিকাশের পরবর্তী ধাপ বিলম্বিত না-ও হতে পারে। এই জীবনেই কোন কোন মানুষের পক্ষে দেবমানব হওয়া অসম্ভব ও অবাস্তব কল্পনা না-ও হতে পারে।

জীবন ও যোগ

সৃষ্টিতে ক্রমবিকাশের কাজ ও যোগ এ দুয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হলো "All Life is Yoga." তিনি তাঁর Synthesis of Yoga গ্রন্থের মর্মসূচক সূত্র হিসাবে বাক্যটি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটিতে কথাটা আরো একটু স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : In the right view of both life and yoga, all life is either consciously or subconciously a yoga." আমরা দেখেছি ক্রমবিকাশের গতি উর্ধ্বমুখী, উপনিষদের ভাষায় আনন্দের অভিমুখী। জড়ের মধ্যে প্রাণশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল বলেই (শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় involved ছিল বলেই) পৃথিবীতে একদিন উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে জড়বিজ্ঞানের আধুনিক মতও এই যে প্রাণের ধর্ম প্রচ্ছন্ন-ভাবে জড় পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান; অর্থাৎ বস্তুর মধ্যে যে সম্ভাবনা (potentiality) বিদ্যমান সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করা বস্তুর ধর্ম বা স্বভাব বা urge। আবার জড়ের মধ্যে প্রাণের ধর্ম যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল, প্রাণের মধ্যেও তেমনি মনের ধর্ম প্রচ্ছন্ন ছিল; তাই একদিন প্রাণী জগতে মন ও বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাব হয়। জড় জগতে প্রথমে এই উদ্ভিদ্ ও ইতর প্রাণীর আবির্ভাব, পরে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব এই দুটি ব্যাপারকে শ্রীঅরবিন্দ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "The material world has evolved life in obedience to a pressure from the vital plane, mind in obedience to a pressure from the mental plane. It is now trying to evolve supermind in obedience to a pressure from the Supramental plane." (The Riddles Of This World, p. 10)। অর্থাৎ জড়জগতে প্রথমে উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর আবির্ভাব, এবং পরে প্রাণীজগতে মানুষের আবির্ভাব এদুটি ক্রিয়ার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ দুটি শক্তির সংযোগ দেখেছেন। একটি শক্তি উপর থেকে আকর্ষণ করছে; অপরটি নীচে থেকে উপরে উঠতে আগ্রহবান, উন্মুখ হয়ে রয়েছে। উপরের আকর্ষণ আর উপরে ওঠবার জন্য নীচের উন্মুখতা—কথা দুটি রূপকের বা কল্পনার ভাষা মনে

হওয়া বিচিত্র নয় ; কিন্তু আমরা দেখবো শ্রীঅরবিন্দের সাধনার মূল সূত্রই এই —একদিকে সচ্চিদানন্দকে জানবার জন্য নীচ থেকে সাধকের উন্মুখতা, অপর দিকে উপর থেকে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য সচ্চিদানন্দেরও আগ্রহ। এই দুটি ক্রিয়াকে যোগ বলে ব্যাখ্যা করা যায় ; এবং এই দুটি ক্রিয়াই যে এ পর্যন্ত subconsciously অর্থাৎ অজ্ঞানে, প্রকৃতির নিয়মেই হয়েছে, এ কথাও যথার্থ। কিন্তু ক্রমবিকাশের পরবর্তী ধাপ হবে মানবের দেবমানব হয়ে ওঠা। তার জন্য চাই সজ্ঞান সাধনা। এদিক থেকে দেখলে All Life is either consciously or subconsciously a yoga, অর্থাৎ All life is Yoga.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে ব্রহ্ম

ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন কিন্তু জ্ঞেয়

সৃষ্টির কথার পর স্রষ্টার কথা। বেদান্তের প্রধান আলোচ্য ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ। এ-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক্। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে ব্রহ্ম জ্ঞেয় কি অজ্ঞেয়? এই প্রশ্নের আংশিক আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে intuition প্রসঙ্গে হয়েছে : এখানে শ্রীঅরবিন্দের মতের একটু বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন।

শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক মতের উপর উপনিষদ্ ও গীতার প্রভাব যে গভীর তা স্বীকার করতেই হবে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মের জ্ঞেয়তা ও অজ্ঞেয়তা সম্বন্ধে এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি আছে :

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান, ন বিভেতি কদাচন॥ (২।৪)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শান্তিনিকেতন" নামক উপদেশ-সংগ্রহ পুস্তকে শ্লোকটির এই অনুবাদ করেছেন : "বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে, সে ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতে ভয় থাকে না।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Riddles Of This World পুস্তিকার ৩৫শে পৃষ্ঠায় ঋষির এই শ্লোকটিরই যেন প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, "Brahman is unthinkable by the mind and inexpressible in speech, but still attainable by

something deeper or higher than the mental perception." এই প্রসঙ্গে সেখানে তিনি একথাটাও বলেছেন যে উনিশ শতকের ভিক্টোরীয় যুগের পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদীর ন্যায় ভারতীয় বৈদান্তিকও বলেন যে চরমতত্ত্ব বাক্যমনের অগোচর; কিন্তু বৈদান্তিকের এই শেষ কথা নয়। বৈদান্তিক বলেন যে মন-বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠতর শক্তি মানুষের রয়েছে এবং তার সাহায্যে চরমতত্ত্বের নাগাল পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব। পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদী অবশ্য একথা স্বীকার করেন না।

আমাদের কোন কোন ঋষি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতই নিঃসন্দেহ ছিলেন যে হস্তস্থিত আমলকের ন্যায়, ঈশ্বর তাঁদের নিকট সত্য ছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রচলিত গানের কলি উল্লেখ করা যেতে পারে। কলিটি এই:

রয়েছ তুমি একথা কবে
জীবন-মাঝে সহজ হবে?

শ্রীঅরবিন্দের জীবনে, mystic শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধিতে ঈশ্বর যে "সহজ" হয়েছিলেন তার একটি প্রমাণের উল্লেখই এখানে যথেষ্ট হবে। শ্রীদিলীপকুমার রায় তাঁর "শ্রীঅরবিন্দ প্রসঙ্গে" পুস্তকখানায় (৪১ পৃষ্ঠায়) লিখেছেন, "...... চমকে উঠেছিলুম ১৯২৪ সালে যেদিন শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বললেন নিশ্চিতির শান্ত সুরে যে ভগবানকে চাইলে পাওয়া যায়; এ তিনি জেনেছেন প্রত্যক্ষ অপরোক্ষ অনুভবে। বিশ্বাস হলো মুহূর্তে, কেননা তাঁর স্বরে বেজে উঠেছিল সেই সুর যে সুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, অপরোক্ষ অনুভব বিনা বেজে উঠতে পারে না।"

ব্রহ্ম কি জ্ঞেয়, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তাঁর The Life Divine গ্রন্থের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ পৃষ্ঠায়। সেখানে তিনি বলেছেন: "It is possible to exaggerate the unknowableness of the Unkowable." এবং the Unknown is not unknowable." অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় না, একথা সত্য হলেও, ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় একথা বললে বেশী বলা হয়; আর ব্রহ্ম অজ্ঞাত হলেও অজ্ঞেয় নয়। এ বিষয়ে তাঁর স্থির সিদ্ধান্ত অন্যত্র এই ভাষায় তিনি প্রকাশ করেছেন— Brahman is concealed but discoverable অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন কিন্তু জ্ঞেয়।

উপনিষদ্ ও গীতায় ব্রহ্ম

ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের দেশে ব্রহ্ম-বিদ্যার আকর উপনিষদ্ বা বেদান্ত। বেদান্ত বলতে বেদের অন্ত ভাগ বা শ্রেষ্ঠভাগ জ্ঞানকাণ্ড বোঝায়। বেদান্ত-দর্শনে বিভিন্ন উপনিষদের ব্রহ্ম-বিষয়ক উক্তিসমূহের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে, অর্থাৎ দার্শনিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে। গীতাকে উপনিষদ্‌সমূহের সার-সংগ্রহ বলা হয়। গীতা একখানা শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক গ্রন্থ। শ্রীঅরবিন্দের নিকট উপনিষদগুলি ও গীতা মূল্যবান গ্রন্থ; এবং তাঁর ব্রহ্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি ঐ দুই শাস্ত্রের, বিশেষভাবে গীতার অনুসরণ করেছেন।

উপনিষদে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ দুই রূপেরই বর্ণনা করা হয়েছে; উপনিষদে ব্রহ্মকে "নির্গুণো গুণী" বলা হয়েছে। সগুণ ব্রহ্মকে আবার অপর ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্মকে পরব্রহ্ম বলা হয়। পর কথার অর্থ শ্রেষ্ঠ; অপর আর অশ্রেষ্ঠ কথা দুটি একার্থক। ব্রহ্মের নির্গুণ রূপকেই ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ রূপ বলা হয়। ব্রহ্ম সগুণরূপে জগৎ-স্রষ্টা, সকল কল্যাণগুণের আকর প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হন; আর নির্গুণ ব্রহ্মকে সকল বিশেষণের অতীত অনির্দেশ্য বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

গীতায় ব্রহ্মকে ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম এই তিন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দও গীতার মত অনুসরণ করে ব্রহ্মের তিন রূপের—একই ব্রহ্মের তিন রকম প্রকাশের বা তিন রকম বিভাবের কথা বলেছেন। এখানে প্রচলিত মত অপেক্ষা শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যায় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রচলিত মতে ব্রহ্মের দুই রূপের, সগুণ ও নির্গুণ রূপের কথাই বলা হয়ে থাকে, তিন রূপের কথা নয়। শ্রীঅরবিন্দের এই ব্যাখ্যার মূল গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোক দুটি:

> দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
> ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬
> উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
> যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

অর্থাৎ ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ বিদ্যমান; সমুদয় ভূতকে ক্ষর এবং কূটস্থকে অক্ষর বলা হয়ে থাকে। এছাড়া আর একজন উত্তমপুরুষ আছেন, যাঁকে পরমাত্মা বলা হয়ে থাকে; তিনি অব্যয় নির্বিকার ঈশ্বর। লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হয়ে তিনি ত্রিলোক পালন করেন।

ক্ষর বা সগুণ ব্রহ্ম

মনে রাখতে হবে ক্ষর অক্ষর এই দুই পুরুষ এবং দুয়ের অতিরিক্ত পুরুষোত্তম তিন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়; একই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ বা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ বা বিভিন্ন ভাব। ক্ষর ব্রহ্ম বলতে কী বোঝায় তা দেখা যাক। ব্রহ্ম ক্ষর রূপে জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর। জগৎ সৃষ্টি করে ব্রহ্ম জগৎ থেকে আলাদা হয়ে অবস্থিত নন; জগতে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। উপনিষদে বলা হয়েছে, "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব"—অর্থাৎ ব্রহ্মই সব হয়েছেন; "আব্রহ্মস্তম্ব" (প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত) সবই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রসিদ্ধ উক্তি "সর্ব্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম" (৩।১৪।১) বাক্যটির, আর গীতার "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" (৭।১৯) উক্তির অর্থ একই। এই প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নিম্নোক্ত শ্লোক দুটিও উল্লেখযোগ্য ব্রহ্মই যে সব কিছু, একথাটা শ্লোক দুটিতে সুন্দর রূপে দেখানো হয়েছে; এবং শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থে (৬০৯ পৃষ্ঠায়) ও Essays on The Gita গ্রন্থে (৩৯১ পৃষ্ঠায়) শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা করেছেন। শ্লোক দুটি এই:—

> ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
> ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥ ৪।৩
> নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তরিদ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ।
> অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা॥ ৪।৪

অর্থাৎ তুমি নারী তুমি নর; তুমি কুমার তুমি কুমারী; তুমি জরাগ্রস্ত হয়ে স্খলিত পদে দণ্ডসহায়ে চল; এবং তুমিই জাত হয়ে নানা রূপ ধারণ কর।

তুমি নীল পাখী, তুমি হরিদ্বর্ণ রক্তচক্ষু শুকাদিপক্ষী; তুমি বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘ; তুমি ঋতুসমূহ; তুমি সাগর; তুমি আদিবিহীন; তুমি সর্বপালকরূপে বিদ্যমান আছ; তোমা হতেই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হয়েছে।

এই হলো গীতার "বাসুদেবঃ সর্বমিতি"-র বিস্তৃত ব্যাখ্যা। একেই গীতায় ব্রহ্মের ক্ষর রূপ বলা হয়েছে। ক্ষর কথার অর্থ বিনাশশীল, বা বিকারী বা পরিণামী, যা জীব জগৎরূপে অভিব্যক্ত বা manifested হয়। স্মরণ রাখতে হবে হিন্দুদর্শনের মতে "আব্রহ্মস্তম্ব" অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে তৃণ পর্যন্ত সকলই বিনাশশীল। শ্রীঅরবিন্দ ক্ষর পুরুষকে ব্রহ্মের mutable ও personal রূপ বলেছেন। ক্ষর ব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম বা লৌকিক মতের জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর একই বলা চলে।

অক্ষর ব্রহ্ম

ক্ষর রূপে ব্রহ্মের যে পরিচয় তা ব্রহ্মের আংশিক পরিচয় মাত্র। ব্রহ্ম তো কেবল বিশ্বরূপেই অভিব্যক্ত নন ; তিনি বিশ্বের অতীতও, বিশ্ব অপেক্ষা অনেক অধিকও। তাই যাঁরা Pantheist, অর্থাৎ যাঁদের বিশ্বাস ঈশ্বর হলেন এই যা কিছু অভিব্যক্ত হয়ে রয়েছে শুধু তাই, শ্রীঅরবিন্দের মতে তাঁরা ভ্রান্ত ; কারণ তাঁরা ভুলে যান যে ঈশ্বর যেমন জীব জগৎ রূপে প্রকট, তেমনি ঈশ্বরের আবার বিশ্বাতীত রূপও সত্য। গীতা সে ভুল করে না। গীতার দশম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "আমি আমার একাংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করে আছি।" আমাদের শাস্ত্রে বারবার এ কথাটা বলা হয়েছে যে ব্রহ্মের একাংশ মাত্র সর্বভূত, অপর তিন অংশ অমৃত। বেদের পুরুষসূক্তের কথা—"......পাদোহস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" সমুদয় ভূত তাঁর একপাদ। তাঁর ত্রিপাদ দ্যুলোক এবং অমৃত। অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল সগুণ, এবং বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বকর্মা ও সর্বভূত রূপে অভিব্যক্ত নন ; তাঁর আবার নির্গুণ বাক্যমনের অগোচর দেশকালের অতীত অব্যক্ত রূপও আছে। সেই রূপ কী ?

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপরোক্ত শ্লোকে অক্ষর কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে কূটস্থ কথাটির ব্যবহার হয়েছে। কূট কথার অর্থ মূল এবং কূটস্থ হলো যা মূলে স্থিত। কূটস্থ কথার অর্থ শ্রীঅরবিন্দ করেছেন standing above changes, এবং অক্ষর ব্রহ্মকে শ্রীঅরবিন্দ immutable ও impersonal বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তা হলে ক্ষর ব্রহ্ম ও অক্ষর ব্রহ্ম কথা দুটির অর্থ শ্রীঅরবিন্দের মতে দাঁড়ালো এই :—ক্ষর রূপে ব্রহ্ম সর্বভূত রূপে—আব্রহ্মস্তম্ব রূপে—অর্থাৎ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম রূপে অভিব্যক্ত ; আর অক্ষর রূপে ব্রহ্ম সর্ব পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে স্থিত অব্যয় নিষ্ক্রিয় ও কূটস্থ ; নিশ্চল নিষ্ক্রিয় অক্ষর ব্রহ্ম কূটস্থ অর্থাৎ ক্ষর ব্রহ্মের মূলে স্থিত। 'An absolute calm and passivity, purity and equality within, a sovereign and inexhaustible activity without, is the nature of Brahman as we see it manifested in the universe.' (শ্রীঅরবিন্দের ঈশ-উপনিষদের ব্যাখ্যা, ৬১ পৃষ্ঠা)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্রীঅরবিন্দের সাধনমার্গের একটি মূল সূত্র এই যে বাইরের বিপুল কর্মচেষ্টার মূলে থাকবে অন্তরের শান্ত সমাহিত ভাব। 'Tranquility, for the soul, activity for the energy, is the balance of the divine rythm in man,(ঈশ-উপনিষদের ব্যাখ্যা, ৬২ পৃষ্ঠা)।

অক্ষর ব্রহ্ম নির্বিশেষ তাই অনির্দেশ্য

অক্ষর ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত অনির্দেশ্য ও নির্বিশেষ বলে কোন লক্ষণ দ্বারা তাঁর বর্ণনা করা যায় না। "যাহাতে কোন বিশেষ—অর্থাৎ নাম, রূপ, কর্ম, গুণ বা জাতি প্রভৃতি আছে তাহাকে সেই বিশেষ দ্বারা নির্দেশ করা চলে। ব্রহ্মে এইসব বিশেষ নাই ; সুতরাং তিনি বাক্যের অতীত।" (বৃহদারণ্যক ২।৩।৬ সূত্রের উপর টিপ্পনী—স্বামী গম্ভীরানন্দ)। তাই অক্ষর বা পরব্রহ্মের বর্ণনায় কেবল নেতি নেতি অর্থাৎ পরব্রহ্ম এরূপ নন, এরূপ নন বলা হয়ে থাকে, যথা ব্রহ্ম স্থূল নন, ব্রহ্ম অস্থূল নন, ব্রহ্ম হ্রস্ব নন, দীর্ঘ নন ইত্যাদি। অর্থাৎ অক্ষর বা পরব্রহ্মকে কোন বিশেষণ দ্বারাই বিশেষিত, চিহ্নিত, নির্দিষ্ট করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ "সর্বাবয়ব বেদান্ত" শীর্ষক এক বক্তৃতায় কলকাতায় যা বলেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে অদ্বৈতবাদীরা ব্রহ্মের প্রতি সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্যতীত আর কোন বিশেষণ দিতে প্রস্তুত নন। শঙ্করাচার্য বলেন ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ। কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণ এ বিষয়ে আরো অগ্রসর হয়ে বলেছিলেন 'নেতি, নেতি', এ নয়, এ নয়। অর্থাৎ তাঁদের মতে ব্রহ্ম অনির্দেশ্য।

অক্ষর ব্রহ্ম যে বাক্যের অতীত, মুখে বলে বুঝানো যায় না সে সম্বন্ধে একটি গল্প পাওয়া যায় ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যে। গল্পটি রয়েছে ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৭শ সূত্রের ব্যাখ্যায়। সেখানে বাহ্ব ও বাস্কলি নামক গুরু-শিষ্যের কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্কলি বাহ্বকে বললেন, "ভগবান, আমাকে ব্রহ্মের উপদেশ দিন"। বাহ্ব চুপ করে রইলেন। বারবার বাস্কলি বাহ্বকে অনুরোধ করলেন ; কিন্তু বাহ্ব নিরুত্তরই রইলেন। কেন তিনি উত্তর দিচ্ছেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে শেষে বাহ্ব বললেন, "আমি তো উত্তর দিচ্ছি ; তুমি তা বুঝছ না।" নিরুত্তর থেকে বাহ্ব বাস্কলিকে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ব্রহ্মের অক্ষর রূপ বাক্যের অতীত।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধদেবকে কোন প্রশ্ন করা হলে তিনি চুপ করে থাকতেন। ঐ সব কথা নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন না ; কারণ তিনি মনে করতেন যতদিন চিত্ত শুদ্ধ না হবে ততদিন ঐ সব তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ বা সম্ভব নয়। শ্রীঅরবিন্দও ঐ সব তত্ত্ব জানবার প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে তাঁর মত স্পষ্ট ভাষায় নানা স্থানে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন ঐ সব তত্ত্ব বুঝতে হলে 'a radical change of

the ways of life'—জীবনধারার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। 'one must get inside oneself' (The Riddles of This World, p. 37)

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ নির্বাণের বা বৌদ্ধ মুক্তির আদর্শের এবং বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদের যে অর্থ শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন তারও উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে গণিতের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় বৌদ্ধ নির্বাণ বা বৌদ্ধ শূন্য • (zero) নয়, কিন্তু x (Unknown Quantity)। অর্থাৎ তাঁর মতে বৌদ্ধ নির্বাণ এমন একটা কিছু যা হলো some highest state beyond all notion or experience (The Life Divine, p. 507—অর্থাৎ এমন কিছু যার সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা, উপলব্ধি হয় না। বস্তুত শ্রীঅরবিন্দ The Life Divine গ্রন্থের ২৯শ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এই মতই ব্যক্ত করেছেন যে অদ্বৈতবাদীর অক্ষর ব্রহ্ম আর বৌদ্ধ শূন্য অভিন্ন। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর "জ্ঞানযোগে" (৩২৩ পৃষ্ঠা) বলেছেন: "অদ্বৈত-বৈদান্তিকেরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেন (বৌদ্ধ) নির্বাণ অবস্থাও ঠিক তাহাই।" মোট কথা অক্ষর ব্রহ্ম যে অনির্দেশ্য এ সম্বন্ধে কারো মতভেদ নাই।

পুরুষোত্তম-তত্ত্বে ক্ষর অক্ষরের সমন্বয়

আপাতদৃষ্টিতে এবং বিচার-বুদ্ধিতে মনে হইতে পারে যে ব্রহ্মের ক্ষর ও অক্ষর রূপ দুটি পরস্পর-বিরোধী। শ্রীঅরবিন্দ নিজেও বলেছেন: 'The two seem to be irreconcilable opposites. (Essays On The Gita, p. 390)। তবে দুয়ের সমন্বয় কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ পুরুষোত্তম-তত্ত্বে ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয় দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর কথা ক্ষর ও অক্ষর হলো 'two aspects of Purushottama'—অর্থাৎ দুই বিভিন্ন দিক থেকে পুরুষোত্তম-তত্ত্বকে দেখা। তিনি বিভিন্ন স্থানে এই ধরনের কথা বলেছেন: 'The Purushottama is not one of these two things (Kshara and Akshara) to the exclusion of the other. Purushottama is neither wholly Kshara nor wholly Akshara. He is greater than the immutable (Akshara) and much greater than the Mutable (Kshara)'—অর্থাৎ পুরুষোত্তম যদি কেবল ক্ষর হতেন তবে তাঁকে অক্ষর অনির্দেশ্য বলা যেতো না; কিংবা পুরুষোত্তম যদি কেবল অক্ষর হতেন তবে তাঁর ক্ষর-রূপ—সর্বম্ খল্বিদম্ ব্রহ্ম-রূপ মিথ্যা হতো। তাই মায়া-বাদী অদ্বৈতবাদীর ন্যায় যাঁরা পরমাত্মাকে কেবল অক্ষর অনির্দেশ্য বলে বিশ্বাস

করেন তাঁদের মতে জগৎ মিথ্যা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের কথা: The Purushottama is not imprisoned in His immutability—অর্থাৎ পুরুষোত্তম অক্ষর বলে যে আর কিছু হতে পারেন না, ক্ষর সর্বভূত হতে পারেন না, একথা ঠিক নয়। তাই গীতার উপরোক্ত পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৭শ শ্লোকের শেষাংশে বলা হয়েছে "যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বর:" অর্থাৎ যিনি (পুরুষোত্তম) অক্ষর অব্যয় হয়েও লোকত্রয়ে প্রবেশ করে সকলকে পালন করেন। মোট কথা ক্ষর-রূপ পরমাত্মার আংশিক পরিচয় মাত্র; অক্ষর-রূপও পরমাত্মার শেষ কথা নয়; পরমাত্মা ক্ষর অক্ষর দুই হয়েও দুয়ের অতীত—তিনি আবার সর্বলোকপালক পুরুষোত্তম। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের নিজের একথাটিও উল্লেখযোগ্য: If it be true that the self alone exists, it must also be true that all is the self. (The Life Divine, p. 31)

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আর একটি কথাও স্মরণীয়। তিনি বলেন এই পুরুষোত্তম তত্ত্ব ভারতের পরবর্তী পুরাণসমূহের ও ভক্তিশাস্ত্রের মূল। পরমাত্মার অক্ষর অব্যয় রূপ অপেক্ষা পুরুষোত্তম রূপ বৈষ্ণবদের চক্ষে শ্রেষ্ঠতর। শ্রীঅরবিন্দের সাধন-মার্গেও পুরুষোত্তম-তত্ত্বের গুরুত্ব সামান্য নয়। বস্তুত তাঁর সাধনপথে যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় হয়েছে তার মূলে রয়েছে এই পুরুষোত্তম-তত্ত্ব।

গীতায় সুস্পষ্ট ভাবে, উপনিষদে অস্পষ্ট ভাবে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব উক্ত

গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের উপরোক্ত শ্লোকে পুরুষোত্তম-তত্ত্ব সুস্পষ্ট উল্লিখিত দেখা গেল। শ্রীঅরবিন্দ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা-ও আমরা দেখলাম। কিন্তু শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে; এবং আমাদের দেশে পুরুষোত্তম কথাটির প্রচলন থাকলেও ব্রহ্মের ক্ষর ও অক্ষর, সগুণ ও নিগু´ণ এই দুই ভাবের কথাই প্রচলিত। সন্দেহ হতে পারে শ্রীঅরবিন্দের পুরুষোত্তম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা কি তাঁর মন-গড়া জিনিস? উপনিষদেও কি পুরুষোত্তম-তত্ত্বের সন্ধান মেলে? এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের সুস্পষ্ট মত এই: 'in reality the idea of the Purushottama is already announced in the Upanishads, though in a more scattered form than in the Gita' (Essays on The Gita, p. 33)। তাঁর এই মতের সমর্থনে শ্রীঅরবিন্দ ঐ গ্রন্থের ৭২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় মণ্ডুক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় শ্লোকের এই অংশটি উদ্ধৃত করেছেন: "পুরুষ:......অক্ষরাৎ পরত: পর"—

এই পুরুষ অক্ষর থেকেও শ্রেষ্ঠ ; শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা : 'although the Akshara is supreme there is a supreme Purusha higher than it'. মণ্ডুকোপনিষদের অন্যত্রও (৩।২।৮ম শ্লোকে) "পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম" কথাটির ব্যবহার হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও "পরমং পরস্তাদ্" কথাটি পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দ মনে করেন উপনিষদে "পুরুষোত্তম-তত্ত্ব" সুস্পষ্ট ভাবে উক্ত না হলেও পরব্রহ্ম বা অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্রহ্মের অপর এক রূপের কথা বলা হয়েছে ; এবং তা পুরুষোত্তম-তত্ত্ব বই আর কিছু নয়। গীতা উপনিষদের সার সংগ্রহ, এবং উপনিষদে যা অস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে গীতাতে তা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে।

এখানে একথাটা স্মরণ রাখা দরকার যে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের ভিত্তি প্রধানত তাঁর জীবনের কয়েকটি প্রধান উপলব্ধি। বরোদায় লেলে মহারাজের সঙ্গে ধ্যানকালে তাঁর যে উপলব্ধি হয়েছিল তা অক্ষর ব্রহ্মের উপলব্ধি। আলিপুর জেলে "বাসুদেবঃ সর্বমিতি" এই উপলব্ধি তিনি লাভ করেন ; এবং জেল থেকে নতুন মানুষ হয়ে তিনি বের হয়ে আসেন। পরে তিনি পুরুষোত্তমের উপলব্ধি লাভ করেন ; এবং ক্ষর ও অক্ষর ব্রহ্মের সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হন। তাই 'তাঁর ক্ষর ও অক্ষর ও পুরুষোত্তমের ব্যাখ্যা তিনি দ্বিধাহীন ভাবে সত্য বলে জেনেছিলেন। আমরা দেখেছি তাঁর নিকট উপলব্ধিই ছিল "অন্তিম প্রমাণ" যার উপর আর কোন কথা চলে না। উপনিষদেও বলা হয়েছে : "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ······তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" (মণ্ডুক ২।২।৮) অর্থাৎ "সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হলে সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়।"

পুরুষোত্তম ও পরাপ্রকৃতি

গীতায় প্রকৃতিকে পরা ও অপরা এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে— সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ পরাপ্রকৃতি বলতে কী বোঝেন, এবং তাঁর মতে পুরুষোত্তম ও পরাপ্রকৃতির সম্পর্ক কী তা প্রথমে দেখা যাক্।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন পুরুষোত্তমের পরাপ্রকৃতি হলো পুরুষোত্তমের চিৎশক্তি। তিনি চিৎশক্তি কথাটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসাবে 'Consciousness-Force' এই যুক্ত কথাটি ব্যবহার করেছেন। পুরুষোত্তম সত্যসংকল্প তাঁর সংকল্প উদয় হওয়ার অর্থ অমোঘভাবে তা কাজে পরিণত হওয়া। তাই পুরুষোত্তমের চিৎশক্তি আর তাঁর সৃজনীশক্তি আর পরাপ্রকৃতি তিনই একার্থক। শ্রীঅরবিন্দ

আবার বিভিন্ন স্থানে পরাপ্রকৃতিকে The Divine Mother (সংক্ষেপে The Mother) ও World-Mother বলেছেন (Lights on Yoga, p. 6 ; The Synthesis of Zoga, p. 141)।

অপরা প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতির যে ভেদ গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে দেখানো হয়েছে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ গীতার সঙ্গে একমত। সাংখ্যের সৃষ্টিক্রম গীতার ও শ্রীঅরবিন্দের মতে অপরা প্রকৃতির ক্রিয়া। শ্রীঅরবিন্দ অপরা প্রকৃতিকে 'Lower Prakriti of mind, life and matter' বলেছেন। গীতায় আবার বলা হয়েছে পরাপ্রকৃতি "জীবভূত" হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ "জীবভূত" কথাটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়; এবং তা থেকে শ্রীঅরবিন্দের মতে পুরুষোত্তমের পরাপ্রকৃতি ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক কী তা বোঝা যায়। তিনি বলেন: 'We must be careful not to make the mistake of Thinking that the Supreme Prakriti (পরাপ্রকৃতি) is identical with the Jiva (জীবাত্মা) manifested in time. The Gita does not say that the Supreme Prakriti is in its essence the Jiva i.e., Jivat-makam but that it has become the Jiva, Jivabhutam.' (Essays on the Gita, p. 239)। অর্থাৎ জীবভূত আর জীবাত্মক কথা দুটি একাত্মক নয়; কেননা শ্রীঅরবিন্দের কথা: 'The Supreme Prakriti is something higher than the Jiva; the Supreme Prakriti is the Supreme Nature of Purushottama।' অর্থাৎ পরাপ্রকৃতি জীবরূপে অভিব্যক্ত হয় সত্য কিন্তু একথাও সত্য যে পরাপ্রকৃতি জীবের অপেক্ষা অনেক অধিক।

পরাপ্রকৃতিই জীব হয়, তবু জীব পরাপ্রকৃতির সবটা নয়—উপরে শ্রীঅরবিন্দ এই মত প্রকাশ করেছেন দেখা গেল। পুরুষোত্তম আর পরাপ্রকৃতি এই দুয়ের সম্পর্ক কী—পুরুষোত্তম আর পরাপ্রকৃতি বা Mother কী দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব? আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। গীতার ৭ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে পুরুষোত্তমের পরাপ্রকৃতি জীবরূপে অভিব্যক্ত হয়। আবার গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে জীব পুরুষোত্তমের সনাতন অংশ। কথা দুটি কী পরস্পর-বিরোধী? না, কথা দুটি পরস্পর-বিরোধী নয় এজন্য যে গীতার পুরুষোত্তম আর পরাপ্রকৃতিকে দুই স্বতন্ত্র তত্ত্ব রূপে নয় একই তত্ত্ব রূপে বর্ণনা

করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের কথা "Purushottama and Supreme Prakriti are identified. They are put as two ways of looking at one and the same reality (Essays on the Gita, p. 238)। তাই শ্রীঅরবিন্দ পুরুষোত্তম ও তাঁর শক্তি বোঝাতে ঈশ্বর-শক্তি এই যুক্ত শব্দ স্থানে স্থানে ব্যবহার করেছেন, এবং তা দ্বারা এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে পুরুষোত্তম ও তাঁর পরাপ্রকৃতি বা Mother বস্তুত এক। একস্থানে তিনি বলেছেন 'Prakriti is Pushottama as Power'। তাঁর The Ideal of The Karmayogin পুস্তকের ৭০ পৃষ্ঠায় পুরুষোত্তমকে (নিশ্চল) মহাকাল এবং পরাপ্রকৃতিকে (নৃত্যপরায়ণা) কালীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন "Mahakala is the Spirit within, whose energy goes abroad in Her and moulds the progress of the world and the destiny of the nations" এবং ঐ পুস্তকের ৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন : "She (অর্থাৎ পরাপ্রকৃতি) carries out the purpose with which she is commissioned." শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Mother নামক প্রসিদ্ধ পুস্তিকার ৪৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "Nothing can be here or elsewhere but what the Mother decides and the Supreme sanctions." পুরুষোত্তম অনুমন্তা পরাপ্রকৃতি কর্ত্রী। তা বলে তারা দুই স্বতন্ত্র সত্তা নয়। পরাপ্রকৃতি পুরুষোত্তমেরই শক্তি; আবার Purushottam as Power হলেন পরাপ্রকৃতি।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় পরাপ্রকৃতির গুরুত্ব

এখানে শ্রীঅরবিন্দের সাধন-পথে পরাপ্রকৃতির গুরুত্বপূর্ণ স্থান সম্বন্ধে একটু উল্লেখ প্রয়োজন। অপরা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অপর নাম মায়া। গীতার ৭ম অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোকে এই মায়াকে বলা হয়েছে "দুরত্যয়া", অর্থাৎ যাকে উত্তীর্ণ হওয়া শক্ত। গুণ কথার একটি অর্থ রজ্জু। জীব এই অপরা প্রকৃতির মায়ায় রজ্জুবদ্ধ হয়ে নিজেকে দেহ প্রাণ মন থেকে অভিন্ন বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়। ফলে মুক্ত হতে হলে জীবকে সাধনার দ্বারা ত্রিগুণাতীত হতে হবে, অর্থাৎ সাংখ্যের ভাষায় নিজেকে "কেবল" বা দেহ, প্রাণ, মন থেকে স্বতন্ত্র বলে জানতে হবে। এই ভাবে মুক্তির সাধনা হলো জ্ঞানমার্গের সাধনা। জ্ঞানমার্গ অধিকতর ক্লেশকর পথ; তবে গীতায় দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে স্বীকার করা হয়েছে যে জ্ঞানের

পথেও মুক্তিলাভ হয় কিন্তু দেহধারী জীবের পক্ষে তা দুরূহ। শ্রীঅরবিন্দের মতও তা-ই। তাঁর মতে পরাপ্রকৃতি বা Divine Mother-এর নিকট আত্মসমর্পণ মুক্তিলাভের অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়। তার কারণ Divine Mother পুরুষোত্তম ও জীবের মধ্যে Mediatrix বা মধ্যস্থের কাজ করেন (The Synthesis of Yoga—১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরাপ্রকৃতির নিকট আত্মসমর্পণ বলতে কী বোঝায় তা শ্রীঅরবিন্দ The Mother নামক চটি পুস্তকে সুন্দরভাবে বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ম প্রসঙ্গে আমরা যথাস্থানে তার আলোচনা করবো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে জীব

পরাপ্রকৃতি জীবভূত হয়েছে, একথাটির শ্রীঅরবিন্দ কী ব্যাখ্যা করেছেন তা আমরা দেখলাম। জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক কী, জীব স্বরূপত কী, জীবের পরিমাণই বা কী, জীবের বন্ধন কেন, এবং বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়ই বা কী—এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বেদান্তের মুখ্য কাজ। শ্রীঅরবিন্দ এসব প্রশ্নের কী উত্তর দেন তা আমাদের দেখতে হবে।

জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক

জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক নিয়ে বৈদান্তিক দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। ফলে এদেশে নানা বৈদান্তিক সম্প্রদায় ও মতবাদের উদ্ভব হয়েছে; এবং সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেকের সাধন-প্রণালীও বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। এই মতবাদগুলির মধ্যে তিনটি প্রধান—শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ। প্রশ্ন উঠবে শ্রীঅরবিন্দ এই তিন মতবাদের কোন্‌টির পক্ষপাতী? কোন বিশেষ একটি মতবাদকে আঁকড়ে থাকা শ্রীঅরবিন্দের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; তাঁর দৃষ্টি সমন্বয়ের দৃষ্টি। তবে একথা বলা চলে যে তিনি দ্বৈতবাদী নন; রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে তাঁর মিল দেখা যায়। আর শঙ্করের অদ্বৈতবাদ তিনি পুরাপুরি গ্রহণ না করলেও তিনি তাঁর নিজস্ব মতটিকে Real Adwaita বলে দাবী করেন। তাঁর মত বোঝবার জন্য প্রথমে শঙ্কর ও রামানুজের মতের একটু আলোচনা প্রয়োজন।

শঙ্কর ও রামানুজের মতবাদ

শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সারকথা এক কবি নিম্নের শ্লোকটিতে বলেছেন :

"শ্লোকার্দ্ধেণ প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ-কোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥

অর্থাৎ কোটি কোটি গ্রন্থে যা বলা হয় তার সার কথা অর্ধশ্লোকে বল্‌ছি—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; জীব ও পরমাত্মা একই, দুই নয়। অর্থাৎ শঙ্করের মতে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ ; জগৎ মিথ্যা ; জীব ব্রহ্মই, তাই ব্রহ্ম ও জীবের ভেদজ্ঞান মিথ্যা। অপরদিকে রামানুজের মতে সত্য পদার্থ তিনটি : ঈশ্বর, জীব (বা চিৎ) ও জগৎ (বা অচিৎ)। চিৎ কথার অর্থ that which perceives অর্থাৎ বিষয়ী বা আত্মা ; আর অচিৎ যা is perceived, অর্থাৎ বিষয় বা জড়। এই ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে ভেদ থাকলেও বস্তুত তারা এক। যেমন একটি দাড়িম্বের মধ্যে অনেক দানা থাকলেও দাড়িম্বকে একটি ফলই বলতে হয়—বহু দানা থাকার জন্য ফলের একত্বের হানি হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক বোঝাতে বেল ফলের উপমা দিতেন এবং বলতেন বেলের আসল জিনিস তার শাঁস ; কিন্তু শাঁস, বীচি ও খোলা তিন নিয়েই বেল। মোট কথা রামানুজের মতে জীব ও ব্রহ্ম মূলত এক হলেও মধ্যে ভেদও সত্য।

ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ

জীব ও পরমাত্মার সম্পর্ক প্রসঙ্গে আমাদের দেশে ভেদ ও অভেদ এবং ভেদাভেদ কথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। দর্শন-শাস্ত্রে তিন প্রকারের ভেদ স্বীকার করা হয়ে থাকে—বিজাতীয় ভেদ, স্বজাতীয় ভেদ আর স্বগত ভেদ। দুই বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের মধ্যে যে ভেদ তা বিজাতীয় ভেদ ; যথা অচেতন প্রস্তরাদি আর চেতন জীবের মধ্যে ভেদ তা বিজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত। এক জাতীয় দুই বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে যে ভেদ তা স্বজাতীয় ভেদ। যেমন দ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলেন পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েই চেতন-স্বরূপ, তবে পরমাত্মা বিভু সর্বশক্তিমান, জীবাত্মা অণু, ক্ষুদ্র। তাই স্বজাতীয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান ; এবং এই ভেদ স্বজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সত্য ও চিরস্থায়ী—ব্রহ্ম স্বাধীন, জীব পরাধীন। আর এক প্রকারের ভেদ দুই ঘনিষ্ঠ জিনিসের মধ্যে ভেদের দৃষ্টান্ত—যেমন গাছ ও তার ডালের মধ্যে যে ভেদ ; কিংবা অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের মধ্যে যে ভেদ, এবং সমুদ্র ও

তার তরঙ্গের মধ্যে যে ভেদ তা হলো স্বগত ভেদের দৃষ্টান্ত। রামানুজ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভেদ স্বীকার করেও দুয়ের মধ্যে স্বগত ভেদ স্বীকার করেন এবং এই অভেদ ভেদের বিরোধী নয়। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একটু ভেদ স্বীকার না করলে দুয়ের সম্পর্কের মধ্যে ভক্তি ও উপাসনার স্থান থাকবে না। রামানুজ ভক্তিপন্থী। একে স্বগত ভেদের দৃষ্টান্ত বলা যায়।

অচিন্ত্য ভেদাভেদ কথাটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কথা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী মধ্বাচর্যের অনুবর্তী ও ভক্তিবাদী; কিন্তু দার্শনিক মতে তাঁরা পুরাপুরি দ্বৈতবাদী যে নন তার প্রমাণ ভেদাভেদ কথাটি। ভেদ স্বীকার করেও তাঁরা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভেদ বিশ্বাসী; এবং কথাটা বোঝা শক্ত, তাই "অচিন্ত্য" বিশেষণের প্রয়োগ। ভক্তিপথেও যে জীব-ব্রহ্মে ঐক্য বা অভেদ সম্ভব তার প্রমাণ চৈতন্যচরিতামৃতের রায় রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের মধ্যে সাধ্যবস্তু-নির্ণয় প্রসঙ্গে বিখ্যাত কথোপকথন। পর পর ক্রমোচ্চ সাধন পথের কথা বলার পর রায় রামানন্দ মধুর ভাবে অর্থাৎ কান্ত ভাবে উপাসনাকে শ্রেষ্ঠতম উপাসনা বলেন। চৈতন্যদেব তা স্বীকার করেন এবং রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন তার পরেও অর্থাৎ তার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে নাকি। রায় রামানন্দ বলেন, মধুর ভাবের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু আছে কিনা এ প্রশ্ন করে এমন মানুষ দুর্লভ। এই কথা বলে চৈতন্য-দেবকে রায় রামানন্দ স্বরচিত একটি গান গেয়ে শোনান। সে গানে এবাক্যটি আছে: "না সো রমন, না হাম রমণী"। অর্থাৎ ভক্তি পরিপক্ক হলে এমন এক অবস্থা হয় যে তাতে উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না।

শঙ্কর ও রামানুজের সাধন-প্রণালী

অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি দ্বৈতবাদীদের সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার। অদ্বৈতবাদীর কামনা ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যানুভূতি লাভ। এই অনুভূতি লাভের উপায় হলো শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যান। অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্ম নির্গুণ; জীবে ও ব্রহ্মে ভেদজ্ঞান অদ্বৈতবাদীর মতে অজ্ঞান। তাই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-সূচক 'তত্ত্বমসি' 'সোঽহং' প্রভৃতি মন্ত্র শোনা, তাদের অর্থ চিন্তা করা এবং মন্ত্রগুলির সাহায্যে ধ্যান করা—এই হলো অদ্বৈতবাদীর সাধনা। রামানুজের মতে ব্রহ্ম সগুণ, সকল কল্যাণ-গুণের আকর, বিশেষ ভাবে দয়া ও প্রেমের আধার। জীব ও ঈশ্বরে ঐক্য থাকলেও দুয়ের মধ্যে ভেদেরও স্থান আছে। তাই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্পর্ক উপাসক ও উপাস্যের।

কিন্তু অদ্বৈতবাদের মতে জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই, তাই অদ্বৈতবাদে উপাসনার স্থান নেই। অদ্বৈতবাদী ভক্তি করবে কাকে? কথিত আছে নিশ্চলদাস নামক এক অদ্বৈতবাদীর জীবনে এই সমস্যাই একদিন দেখা দিয়েছিল। নিশ্চলদাস "বিচার সাগর" নামে একখানা অদ্বৈতবাদ-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। রচনাশেষে মঙ্গলাচরণে ইষ্ট প্রণামস্মরণের সময় নিশ্চলদাস পড়লেন মহা সমস্যায়। তিনি ভেবে দেখলেন: সোঽহং অর্থাৎ আমিই তিনি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, সূর্য, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতা যে সমুদ্রের লহরী মাত্র, আমি যখন স্বয়ং সেই সমুদ্র তখন "কা কুরু প্রণাম?" এই সব কথা ভেবে নিশ্চলদাসের নাকি আর ইষ্টপ্রণাম করা হলো না। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ আর দ্বৈতবাদীদের সাধনায় ভক্তির স্থানই মুখ্য; আর অদ্বৈতবাদীর সাধনা জ্ঞানের সাধনা।

শ্রীঅরবিন্দের মতে জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক

জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত কী দেখা যাক্। তিনি বলেন 'Brahman is One that is Many'—অর্থাৎ তিনি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করেন এবং বলেন ব্রহ্মই বিভিন্ন জীব রূপে ও সর্বভূত রূপে অভিব্যক্ত হন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম "রূপং রূপং প্রতিরূপে বভূব"। শ্রীঅরবিন্দও তা-ই বলেন। তবে শ্রীঅরবিন্দ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এক জায়গায় ভেদ অস্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে তাঁর কথা: "Jiva is one (with Brahman) in essential being and therefore in essential nature, but is different in soul-forms and therefore in activity" (The Life Divine, p. 506). শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত কথাটির মর্ম একটু তলিয়ে দেখা দরকার। তিনি বলেন সত্তার দিক থেকে জীব ও ব্রহ্ম এক; অর্থাৎ স্বরূপত দুয়ের মধ্যে অভেদ; কিন্তু কর্মের দিক থেকে দুয়ের মধ্যে ভেদ। প্রত্যেক জীব পরমাত্মার এক-একটি স্বতন্ত্র কর্মকেন্দ্র। স্বতন্ত্র এজন্য যে প্রত্যেক জীবেরই স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও অহংবুদ্ধি রয়েছে; এবং শ্রীঅরবিন্দ বলেন এই স্বাতন্ত্র্য-বোধের ও অহংবুদ্ধির একটা pragmatic necessity অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে; শ্রীঅরবিন্দের কথা: "A man without ego or desire would be a tamasik (তামসিক) automaton". (Lights on Yoga, p. 7)—অহংবুদ্ধি না থাকলে মানুষ প্রকৃতির হাতে তামসিক ক্রীড়া-পুতুল হতো।

অর্থাৎ এই স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও অংহবুদ্ধি আছে বলেই জগৎ-লীলা সম্ভব হয়। স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ লীলাবাদী ; এবং তাঁর মতে জগৎ আনন্দময়ের লীলা। এজন্যই 'The One' হয়েছেন 'The Many.' শ্রীঅরবিন্দের কথা : "এই বিচিত্র লীলাময় জগৎ জীবের আনন্দ উৎপাদনের জন্য সৃষ্ট। ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে যে এই আনন্দময় ক্রীড়া সাঙ্গ হউক।" (ধর্ম ও জাতীয়তা, ১৯ পৃষ্ঠা)

(স্বরূপত এক হলেও জীব ও ব্রহ্মের কর্ম যে বিভিন্ন শ্রীঅরবিন্দ এ কথার সমর্থন পেয়েছেন মণ্ডুক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দুটি শ্লোকে। উভয় উপনিষদেই শ্লোক দুটি অভিন্ন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Essays on The Gita গ্রন্থে (৭১ পৃষ্ঠায়) শ্লোক দুটির ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপত ঐক্য যেমন সত্য তেমনি তাঁদের কর্মও স্বতন্ত্র। উপনিষদ-দ্বয়ের শ্লোক দুটি এই :—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্য
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশম্
অস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

শ্রীঅরবিন্দ শ্লোক দুটির এই ব্যাখ্যা করেছেন : 'There are two birds on one tree (দেহ-বৃক্ষ), eternally yoked companions ; one of them eats the fruits of the tree—the Purusha in nature (অর্থাৎ জীব) enjoying the cosmos ; the other eats not but watches his fellow.' (এখানে জীব ও ব্রহ্মের কাজ যে ভিন্ন তা দেখানো হলো।)

'When the first (জীব) sees the second and knows that all is His greatness, then he is delivered from sorrow.' দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ চরণটির ব্যাখ্যা এইভাবেও করা হয় :—"জীব যখন ঈশ্বরকে এবং তাঁহার এই রূপ-মহিমাকে আপনা হইতে অভিন্নরূপে দর্শন করে তখন জীব বীতশোক হয়।" (উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, গম্ভীরানন্দ)। অর্থাৎ উপরোক্ত

শ্লোক দুটিতে কর্মের দিক থেকে জীব-ব্রহ্মের ভেদ যেমন দেখা গেল তেমনি আবার দুয়ের মধ্যে স্বরূপগত অভেদও দেখা গেল।

উপরের শ্লোক দুটির উপর স্বামী বিবেকানন্দ যে মন্তব্য করেছেন তার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেন শ্লোক দুটির আরম্ভ হয়েছে দ্বৈতবাদে, কিন্তু পরিসমাপ্তি অদ্বৈতবাদে। প্রথমে জীব ও ব্রহ্মকে দুই চিরসহচর সখা বলা হয়েছে, কিন্তু শেষে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য দেখানো হয়েছে। অদ্বৈতবাদী জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ স্বীকার করেন না। কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও শ্রীঅরবিন্দ লীলাবাদী; তাঁরা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে উপাস্য সম্পর্ক রাখার পক্ষপাতী। তাঁরা দুয়ের মধ্যে একদিকে ভেদের অবিরোধী অভেদ, অপরদিকে অভেদের অবিরোধী ভেদ দুইই স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি থেকে উদ্ধৃত নিম্নের একটি গানের চরণেও আমরা এ মতেরই সমর্থন পাই। গানের চরণটি এই :

"তোমায় আমার প্রভু করে রাখি,
আমার আমি সেইটুকু থাক্ বাকি।

বস্তুত অনেক ভারতীয় মনীষীর মতে উপাসনার আরম্ভ দ্বৈতবাদে কিন্তু সাধনার শেষ প্রান্তে দ্বৈত-অদ্বৈতের চির মিলন। ভক্ত কবিরের একটি দোঁহা :

কবির তু তু করতে তু ভুয়া, তুঝমে রহে সমায়।
তোম্‌হিমাহি মিল রহা, আর মন অনৎ ন যায়॥

অর্থাৎ কবির তুমি তুমি করতে তুমি হয়ে গেল, তোমাতেই মগ্ন হয়ে রইলো : তোমাতে আমাতে মিলিয়ে গেল ; এখন মন আর অন্যদিকে যায় না। প্রকৃত কথা এই যে উপনিষদে একদিকে যেমন "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" প্রভৃতি অদ্বৈতবাদসূচক বাক্য আছে, তেমনি অপরদিকে আবার দ্বৈতবাদের, সমর্থক বাক্যের অভাব নাই। শ্রীঅরবিন্দের সমন্বয়-দৃষ্টিতে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের মূলত কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটিই সত্য ; কিন্তু কোনটিতেই এককভাবে সত্য সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়নি। আমরা তাঁর The Ideal of the Karmayogin পুস্তিকার ৬৮ পৃষ্ঠায় পাই :

"Adwaita, Visistadwaita, Dwaita are merely various ways of looking at the relations of the One to the Many, and none of them has the right to monopolise the name Vedanta. Adwaita is true, because the Many are only

manifestations of the One ; Visistadwaita is true because the Many are eternal to One, only they are sometimes manifest (সৃষ্টিতে) and sometimes non-manifest (প্রলয়ে). Dwaita is true, because although from one point of view the One and the Many are eternally and essentially the same, yet from another the manifestation is different from the Intelligence in which it manifests. (অনাবশ্যক বোধে এই উদ্ধৃতিটিতে মূলের কয়েকটি কথা বাদ দেওয়া হয়েছে।)

জীব স্বরূপত কী

জীবের পরিচয় সংক্ষেপে এই : Jiva is a spirit embodied in body, life and mind. দেহ, প্রাণ, মন জীবের উপাধি। উপাধি বলতে কী বোঝায় ? উপাধি কথাটির ধাতুগত অর্থ এই : উপ = সমীপবর্তিনি, আদধাতি স্বীয় ধর্মং। The red flower which makes the crystal placed over it look a ruby by imparting to it its own redness is an upadhi. দেহ, প্রাণ, মন, আত্মার এই উপাধিগুলি আত্মাকে তাদের রঙে রাঙিয়ে দেয়, তাদের ধর্ম সুখ দুঃখাদি আত্মায় সঞ্চারিত করে ; তাই জীব নিজেকে ভুলক্রমে দেহ, প্রাণ, মন থেকে অভিন্ন মনে করে, গীতার মতে জীব পুরুষোত্তমের সনাতন অংশ। শ্রীঅরবিন্দও তা-ই বলেন। জীবাত্মা পুরুষোত্তমের অংশ বলতে কী বোঝায় ? এবং সনাতন এই বিশেষণটিরই বা অর্থ কী ? জড় জগতে একটি ভৌতিক পদার্থকে খণ্ড খণ্ড করা যায় এবং ঐ খণ্ডগুলিকে যুক্ত করে অখণ্ড পদার্থটিকে পাওয়া যেতে পারে ; কিন্তু প্রত্যেকটি খণ্ডে পূর্ণ পদার্থ টিকে পাওয়া যায় না। ভৌতিক পূর্ণ পদার্থ ও তার অংশগুলির মধ্যে যে সম্পর্ক পুরুষোত্তম ও তাঁর অংশ জীবের মধ্যে সে সম্পর্ক নয়। কোন একটি জীবের মধ্যে পুরুষোত্তম আংশিকভাবে আছেন, পূর্ণভাবে নয়, একথা ঠিক নয়। প্রত্যেক জীবে, সৃষ্টির সর্বভূতে, পুরুষোত্তম পূর্ণভাবে বিরাজমান। শ্রীঅরবিন্দের কথা 'in the ant-hill and in the solar system' পুরুষোত্তমের প্রকাশ একই রকমের—ক্ষুদ্র উইটিপিতে আর অতি বৃহৎ সৌর-জগতে পুরুষোত্তমের প্রকাশের পার্থক্য নেই। তাই সত্যদৃষ্টিতে পরিচয় পাওয়া সম্ভব। একগাছি তৃণে একটি বালুকাময় অনন্ত পূর্ণ-মাত্রায় বিদ্যমান। তাই কবি টেনিসন Flower in the crannied wall-কে সম্বোধন করে

বলেছিলেন, "তোমাকে বুঝলে বিশ্বরহস্য বোঝা যেতো।" জীব পুরুষোত্তমের অংশ কথাটির অর্থ এই যে সর্বভূতে পুরুষোত্তম পুর্ণভাবে বিদ্যমান।

জীবের পরিণাম কী

জীব পুরুষোত্তমের অংশ একথাটির দ্বারা কী বুঝতে হবে দেখা গেল। জীব পুরুষোত্তমের সনাতন অংশ—এখানে সনাতন কথাটির অর্থ কী? অর্থাৎ জীবের পরিণাম কী? গীতায় জীবকে অজ, নিত্য, শাশ্বত বলা হয়েছে। অর্থাৎ জীবের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই। প্রশ্ন হলো পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায় জীবের পরিণাম কী হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে এক দল বলেন পুর্ণজ্ঞান লাভ হলে জীব ব্রহ্মে লীন হয়। দৃষ্টান্ত যেমন নদী। যাত্রা-শেষে নদী যখন সমুদ্রে পৌছায় তখন নদী সমুদ্রে মিশে যায়; তার স্বতন্ত্র নাম আর রূপ থাকে না; সমুদ্রে নদীর লয় হয়। জীবের পরিণাম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কী বলেন? তিনি বলেন গীতাতে কোথায়ও জীবের লয় হয়, একথা বলা হয়নি। তাঁর মতে পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায়ও জীবতত্ত্বের অবসান হয় না। অবসান হয় জীবের অহংবুদ্ধির, যার জন্যে জীব নিজেকে পুরুষোত্তম থেকে এবং অপর সব জীব থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। জীব তখনও পুরুষোত্তমের সংগে নিজের ঐক্য অনুভব করে; এই অবস্থায় পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তিও সম্ভব হয়। এই অবস্থাকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Essays on The Gita গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪০০) Real Adwaita বলেন। তাঁর মতে অদ্বৈতবাদের এই ব্যাখ্যা শঙ্করের ব্যাখ্যার সংগে না মিললেও অধিকাংশ উপনিষদের অনুযায়ী। শঙ্করের ব্যাখ্যাই অদ্বৈতবাদের একমাত্র ব্যাখ্যা মনে করা শ্রীঅরবিন্দের মতে ভুল। এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: "There is possible a realistic as well as an illutionist Adwaita. The philosophy of The Life Divine is such a realistic Adwaita. The world is a manifestation of the Real and therefore itself is real" (Sri Aurobindo On Himself and On the Mother, p. 159) অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে জগৎ মিথ্যা নয়, এবং জীব পরিণামে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সমুদ্রে নদীর ন্যায় ব্রহ্মে মিশে যায় না।

তবে একথাও ঠিক যে শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন পুর্ণজ্ঞানের অবস্থায় জীব পরমাত্মায় লীন হউক অনেক সাধকের তা-ই কাম্য—অদ্বৈতবাদের এই ব্যাখ্যাও গ্রাহ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আর একটি কথাও স্মরণীয়: "লয়রূপ মুক্তি দেহপাতে লাভ করা যায়। (এ হলো বিদেহ মুক্তি) জীবন্মুক্ত অবস্থা দেহেই

অনুভূত হয়।…সেই অবস্থায় (পূর্ণজ্ঞানী) আপনাকে প্রকৃতিবিশিষ্ট (অর্থাৎ দেহ-প্রাণ-মন-বিশিষ্ট) ভগবদংশ বুঝিয়া লীলার কার্য (গীতায় যাকে বলা হয়েছে লোক-সংগ্রহ) সম্পন্ন করেন।" (ধর্ম ও জাতীয়তা, ৩১ পৃষ্ঠা)।

জীবের বন্ধন কেন

অদ্বৈতবাদের মতে জীব তো "ব্রহ্মৈব নাপরঃ"; গীতায়ও বলা হয়েছে জীব পুরুষোত্তমের সনাতন অংশ। শ্রীঅরবিন্দের কথা Jiva is a partial manifestation of Purushottama (Essays on The Gita, p. 71)। বেদান্ত স্বীকার করে জীব স্বরূপত ব্রহ্মেরই মতন "নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত"। তবে জীব কেন নিজেকে মুক্ত বলে না জেনে বদ্ধ মনে করে দুঃখ পায়? এ প্রশ্নের উত্তর কী? আমরা প্রথমে অদ্বৈতবাদী এ প্রশ্নের কী উত্তর দেন দেখবো; পরে শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তার আলোচনা করবো।

অদ্বৈতবাদী বলেন জীব বস্তুত বদ্ধ নয়। অদ্বৈতবাদের মতে মুক্তি জীবের "সাধ্য" বস্তু নয়; অর্থাৎ মুক্তি এমন কোন জিনিস নয় যা জীবের থাকে না কিন্তু জীবকে অর্জন করতে হয়। মুক্তি জীবের "সিদ্ধ" বস্তু, অর্থাৎ জীব নিত্য মুক্ত। তবে যে জীব নিজেকে বদ্ধ মনে করে দুঃখ পায় তার কারণ অজ্ঞান। এই অজ্ঞান দূর হলেই জীবের আর কোন বন্ধন থাকে না। অদ্বৈতবাদ উপমার দ্বারা একথাটা বোঝাতে চেষ্টা করে। এক ব্যক্তির কণ্ঠের হার তার কণ্ঠেই রয়েছে কিন্তু তার এ ভ্রম জন্মেছে যে তার হার হারিয়ে গেছে। তখন তার দুঃখের অন্ত থাকে না, এবং সে চারিদিকে হারের খোঁজে ছুটাছুটি করতে থাকে। তখন যদি কেহ দেখিয়ে দেয় তার হার তার কণ্ঠেই রয়েছে তবে তার ভ্রম দূর হয় এবং তার দুঃখের অবসান হয়। জীব যে আত্মবিস্মৃত, সে যে নিজের পরিচয় জানে না, একথাটা বোঝবার জন্যে অদ্বৈতবাদী আর একটি উপমা দিয়ে থাকেন। এক সিংহশিশু দৈবক্রমে এক হরিণের দলভুক্ত হয়ে পড়েছিল, এবং হরিণের ন্যায় আচরণে অভ্যস্ত হয়েছিল। বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে অন্যান্য হরিণের ন্যায় সেও প্রাণভয়ে পালাতো। একদিন জলাশয়ে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সে বুঝলো সে দুর্বল হরিণ নয়, সে সিংহ; এবং নিজের পরিচয় পেয়ে সে সিংহের স্বভাবও লাভ করলো। মোটকথা অদ্বৈতবাদীর মতে অজ্ঞানের অবসান হলে বন্ধনেরও অবসান হয়; অজ্ঞানই বন্ধনের মূল।

শ্রীঅরবিন্দের মতে জীবের বন্ধনের কারণ

জীবের বন্ধনের কারণ বর্ণনায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Essays on The

Gita গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭৩) যা বলেছেন তা এই : The Jiva descends into the lower prakriti and thinks itself bound by action. এখানে জীবের বন্ধনের কারণ দুটি বলা হলো—প্রথমত জীব অপরা প্রকৃতিতে নেমে আসে। নেমে আসার অর্থ প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও জীব নিজেকে অপরা প্রকৃতির সংগে—দেহ, প্রাণ, মনের সংগে অভিন্ন মনে করে। অপরা প্রকৃতি শ্রীঅরবিন্দের মতে হলো prakriti of body, life and mind। অহংবুদ্ধির বশে জীব নিজেকে দেহ প্রাণ মন বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়। এই হলো বন্ধনের প্রথম কারণ। দ্বিতীয়ত জীব অকর্তা ; প্রকৃতিই কর্ম করে ; তাই কর্মের দায় জীবের নয়। কিন্তু জীব, গীতার ভাষায়, "অহংকার-বিমূঢ়াত্মা" হয়ে নিজেকে কর্মের জন্য দায়ী মনে করে ; ফলে সে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সাংখ্যদর্শনে বলা হয় "জীব অকর্তা কিন্তু ভোক্তা"। গীতার ব্যাখ্যা ও শ্রীঅরবিন্দের এই ব্যাখ্যা সাংখ্যদর্শনের অনুযায়ী। তাহলে দেখা গেল জীবের বন্ধন কেন, এ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলেন জীব নিজেকে জানে না ; আর শ্রীঅরবিন্দ বলেন জীব নিজেকে ভুলক্রমে অপরা প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন মনে করে বদ্ধ হয়। এ-ও অবশ্য অজ্ঞান।

জীবের পাশ

আমাদের দেশে দুটি কথা সুপ্রচলিত—"যত্র জীব তত্র শিব" আর "পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব।" প্রথম কথাটির অর্থ শ্রীঅরবিন্দের জীব আর ব্রহ্ম one in essential being অর্থাৎ স্বরূপত অভিন্ন। দ্বিতীয় কথাটির অর্থ জীব কতকগুলি 'পাশ' দ্বারা বদ্ধ হয়ে রয়েছে, এবং এই পাশ থেকে মুক্ত হলেই জীব শিব হয় ; অর্থাৎ ব্রহ্মের সংগে নিজের ঐক্য অনুভব করে। এই পাশগুলি কী ?

বেদান্তে ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে জীবের এই পাশগুলির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ; শ্রীঅরবিন্দও তাঁর Synthesis of Yoga গ্রন্থে, The Life Divine পুস্তকে এবং চিঠিপত্রে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র অনুসরণ করে পাশগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। বেদান্তের পরিভাষায় এই পাশগুলির এক নাম কোশ। শ্রীঅরবিন্দ কোশ কথার প্রতিশব্দ হিসাবে sheath কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর Synthesis of Yoga পুস্তকে (৫১৮ পৃষ্ঠায়) বলেছেন উপনিষদে যাকে কোশ বলা হয়েছে তাকেই আবার তন্ত্র ও যোগ শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের দেহ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কোশগুলির সংখ্যা পাঁচ। এই পঞ্চ কোশ এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহের কথা শ্রীঅরবিন্দের Synthesis of Yoga ও The

Life Divine গ্রন্থ এবং তাঁর পত্র থেকে বোঝবার চেষ্টা করা যাক্। প্রথম কোশ কথাটির প্রচলিত অর্থ কী দেখা দরকার।

কোশ কথাটির একটি অর্থ তলোয়ারের খাপ; অপর অর্থ প্রজাপতির গুটি। আত্মার প্রসঙ্গে কোশ কথাটির ব্যবহার তাহলে কী অর্থে? তলোয়ারের খাপ যেমন তলোয়ারকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখে, প্রজাপতি যেমন নিজের চারিদিকে গুটি রচনা করে তার মধ্যে নিজেকে আড়াল করে রাখে, তেমনি দেহপ্রাণ মনের সংগে নিজেকে অভিন্ন মনে করে জীব যেন নিজের জন্যে আবরণ রচনা করে; ফলে জীব নিজের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় ভুলে যায়। সে যে দেহ প্রাণ মন থেকে স্বতন্ত্র এ সত্য তাকে সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়। অর্থাৎ কোশগুলির দ্বারা জীব পাশবদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং সাধনা আর 'কোশ-ভেদ' একার্থক।

কোশগুলি কী তা বুঝতে হলে আমাদের আবার তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুর কাহিনী স্মরণ করতে হবে। ভৃগু প্রথমে উপলব্ধি করেছিলেন "অন্নম্ ব্রহ্মেতি" কিন্তু এই উপলব্ধি তাঁকে শান্তি দিতে পারল না; এবং পরপর "প্রাণো ব্রহ্মেতি", "মনো ব্রহ্মেতি", "বিজ্ঞানম্ ব্রহ্মেতি" এই সব স্তর অতিক্রম করে শেষে ভৃগুর এ উপলব্ধি হলো যে "আনন্দম্ ব্রহ্মেতি" তখন তাঁর ব্রহ্মান্বেষণ শেষ হলো। শ্রীঅরবিন্দের কথা: The oldest Vedantic knowledge tells us of fine degrees of our being, the material, the vital, the mental, the ideal, the spiritual or beatific (The Life Divine, p. 238). এই অন্নময় শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় (gross material body), প্রাণময় বা (nervous body), মনোময় (mental body), বিজ্ঞানময় (ideal) ও আনন্দময় (spiritual or beatific) এই পাঁচটি হলো আত্মার পঞ্চকোশ। Spirit বা আত্মা থাকেন এই পাঁচটির ভিতরে অর্থাৎ আড়ালে। Spirit-কে জানতে হলে, শ্রীঅরবিন্দ বলেন, "it is positive that we have to get inside, behind the veil. (The Riddles of This World, p. 38)

স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ

পঞ্চ কোশ ও স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ ভিন্ন জিনিস নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন কোশগুলি দেহগুলির উপাদান। যথা, অন্নময় ও প্রাণময় কোশ নিয়ে আমাদের স্থুল দেহ বা gross material body গঠিত; সূক্ষ্মদেহ বা subtle body

হলো মনোময় কোশ। (See Synthesis of Yoga, p. 796) আর বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশের সমবায়ে কারণ দেহ বা ideal and spiritual body রচিত। শ্রীঅরবিন্দ বলেন 'in all of these bodies the Spirit actually and simultaneously dwells.' (The Life Divine, p. 238).

আমাদের শাস্ত্রে আবার অন্নময় পুরুষ, প্রাণময় পুরুষ, মনোময় পুরুষ, বিজ্ঞানময় পুরুষ ও আনন্দময় পুরুষের কথাও বলা হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন: We use normally our corporal senses and live almost wholly in the body and the physical vitality and the physical mind (Synthesis of Yoga, p. 517). অর্থাৎ প্রাকৃত মানুষ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাষায়, যে মানুষের 'হুশ' হয়নি, অর্থাৎ যার অধ্যাত্মিক চৈতন্য এখনও উদ্বুদ্ধ হয়নি, সে নিজের দেহের ও প্রাণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও প্রবৃত্তিগুলিকে আর মনের নিম্নস্তরের বৃত্তিগুলিকেই (physical mind) নিজের আত্মা বলে জানে। মনের ঊর্দ্ধে বিজ্ঞানের স্তর হলো সত্য ও অধ্যাত্ম জীবনের স্তর। বিজ্ঞানময় পুরুষ ও তার পূর্ণতর রূপ আনন্দময় পুরুষ ও সচ্চিদানন্দ হলেন অধ্যাত্মজীবনের উচ্চতর ও উচ্চতম স্তর।

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে আমরা তো স্থূল দেহের জগতেই বাস করি; সূক্ষ্ম দেহের ও কারণ দেহের অস্তিত্বের প্রমাণ কোথায়; আর ঐ দুই জগতের অস্তিত্ব থাকলেও তাদের সংগে মানুষের কারবার কি সম্ভব? এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কথা The Supra-physical is a truth. তিনি তাঁর The Life Divine গ্রন্থে (২৩৮ পৃষ্ঠায়) যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করা গেল: "The old Hathayogins and Tantriks of India had long ago reduced the matter of the higher human life and body (সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ) to a science.……It is possible to become conscious in our other bodies as well; and it is in fact the opening up of the veil between them and consquently between our physical, psychical and ideal personalities which is the cause of the 'psychic' and 'occult' phenomena that are now beginning to be increasingly though yet too little and too clumsily examined. অর্থাৎ আজকাল যে হিপনটিজ্‌ম, clairvoyance (চক্ষুর দৃষ্টির বাইরের জিনিস প্রত্যক্ষ করা) প্রভৃতি "occult" (গুপ্ত বা

"অলৌকিক") ব্যাপারের প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি একটু আধটু আকৃষ্ট হচ্ছে তা দ্বারা প্রমাণিত হয় সূক্ষ্ম জগতের সংগে ক্ষেত্রবিশেষে স্থুল জগতের মানুষের কারবার করা সম্ভব। আমাদের দেশের প্রাচীনকালের হঠযোগীগণ ও তান্ত্রিক সাধকগণ সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত ছিলেন।

এখানে লেখকের তরফে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শনের কথা বলতে গেলে তাঁর "শ্রদ্ধার" কথা, অর্থাৎ তিনি কী বিশ্বাস করতেন তার কথা, উল্লেখ না করলে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকবে। রুচিভেদে পাঠক শ্রীঅরবিন্দের কথার মধ্যে কোন্‌টির উপর গুরুত্ব আরোপ করবেন, কোন্‌টির উপর করবেন না, তা পাঠকই স্থির করবেন। লেখকের কাজ শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথার সংগে যথাসম্ভব পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া; এবং শ্রীঅরবিন্দ নিজে কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতেন তা দেখিয়ে দেওয়া।

শ্রীঅরবিন্দের মতে পাশ-মুক্তির উপায়

পাশবদ্ধ জীব কী ভাবে পাশমুক্ত হতে পারে সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন: The Jiva (That descends into the Lower Prakriti and finds itself bound by action) can draw back and know itself as the Passive Purusha who eats not and is free from all action. It can rise above the gunas and be liberated from the bondage of action. এখানে শ্রীঅরবিন্দ যে মাণ্ডুক্য ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দুই পক্ষীরূপে বর্ণিত জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলেছেন তা বলাই বাহুল্য। শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য জীব যখন নিজেকে নিষ্ক্রিয় পরমাত্মার সংগে অভিন্ন অর্থাৎ অকর্তা বলে উপলব্ধি করে তখন তার সকল বন্ধন মোচন হয়। উপরের উদ্ধৃতিতে একথাটাই তিনি অন্য ভাষায় এভাবে প্রকাশ করেছেন—জীব যখন ত্রিগুণাতীত হয়, তখন সে পাশমুক্ত হয়। ত্রিগুণাতীত বলতে কী বোঝায়? তা পূর্বেই বলা হয়েছে। (যখন জীবের এই উপলব্ধি হয় যে কর্ম করে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, আর "নাহং কর্তা বন্ধ-মোক্ষৌ কুত মে"—অর্থাৎ আমি কর্তা নই, আমার বন্ধ-মোক্ষ কোথায়? যখন এই উপলব্ধি লাভ হয় তখন জীব পাশমুক্ত হয়।)

আত্মার ভূমিসমূহ

জীবের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ কোশ, অন্নময় মনোময় পুরুষ প্রভৃতি কথার ন্যায় ভারতীয় সাধনার অপর একটি পরিভাষিক শব্দ "ভূমি"

কথাটিও ব্যবহার করেছেন। "ভূমি" কথাটির অর্থ আত্মা বা মনের অবস্থিতি স্থান। "ভূমি" কথাটির ইংরেজী শ্রীঅরবিন্দ করেছেন Plane of existence; এবং তাঁর Synthesis of Yoga গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের উনিশ অধ্যায়ে আমাদের Planes of existence-এর বিবরণ দিয়েছেন। ভূমিগুলির সংখ্যা সাত। "শ্রীঅরবিন্দের যোগ" প্রসঙ্গে আমাদের আবার একথার আলোচনা করতে হবে। এখানে পণ্ডিচেরী থেকে ১৯২০ সনে বারীন্দ্রকুমারের নিকট শ্রীঅরবিন্দ যে পত্র লিখেছিলেন তা-তে (২৭ পৃষ্ঠায়) তিনি "ভূমি" সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তা নিম্নে দেওয়া গেল : "অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন-বুদ্ধি, বিজ্ঞান, আনন্দ এই হলো আত্মার পাঁচটি ভূমি। (ভূমির সংখ্যা আবার সাতও বলা হয়।) যতই উঁচুতে উঠি ; মানুষের Spiritual evolution এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠলে আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয় ; শুধু ত্রিকালাতীত পরব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হ'য়ে জীবনে মূর্ত্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগ-পন্থার central clue (মূল কথা)।"

আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যে সাধককে পরপর দেহ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দের "ভূমি" অতিক্রম করতে হবে ; এবং সেই চেষ্টাই তাঁর সাধনার 'central clue', একথা বলে শ্রীঅরবিন্দ বিষয়গুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট অভিমত জানিয়েছেন। কাজেই এই বিষয়গুলির আলোচনা মোটেই বাহুল্য নয়।

আর একটা কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। পূর্বে বলা হয়েছে আত্মার ভূমি (বা plane of existence)-গুলির সংখ্যা পাঁচ (আবার সাতও বলা হয়ে থাকে)। দেহ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই হলো পাঁচ ভূমির বা কোশের প্রচলিত হিসাব। আনন্দে উঠলে সচ্চিদানন্দের অপর দুই অংশ সৎ ও চিৎ-এ ওঠা সহজ হয়, সচ্চিদানন্দের অনুভূতি লাভ হয়। পূর্বোক্ত দেহ, প্রাণাদি পাঁচ ভূমির সঙ্গে সৎ ও চিৎ যোগ করলে ভূমির সংখ্যা সাত হয়। পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ সত্তা ও পূর্ণ চৈতন্য একই কথা।

জীব স্বরূপত কী এ প্রশ্নের উত্তর এখানেই শেষ করা গেল। তার বন্ধন কেন এবং বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় কী তা-ও বলা হলো। জীবের পরিণাম কী সে-প্রসঙ্গে দেখানো হয়েছে যে শ্রীঅরবিন্দের মতে লয় বা ব্যক্তিত্বের বিনাশ জীবের পরিণাম নয় ; এবং জীব-ব্রহ্মে উপাসক ও উপাস্য এই সম্পর্ক চিরদিন বিদ্যমান থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক মত

জগৎ

জগৎ সত্য, না মিথ্যা—সত্যের অর্থ

জগৎ সত্য না মিথ্যা, এ প্রশ্ন ভারতীয় দর্শনের একটা বড় প্রশ্ন। অদ্বৈতবাদের মতে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ। তবে শঙ্করের ন্যায় অদ্বৈতবাদীও একথা বলবেন না যে জগৎ আকাশকুসুম বা শশকের শৃঙ্গের ন্যায় একটা সম্পূর্ণ অবাস্তব পদার্থ। তবে জগৎ মিথ্যা একথার প্রকৃত অর্থ কী? এবং সত্য বলতে অদ্বৈতবাদী কী বোঝেন?

অদ্বৈতবাদীর মতে সত্য তিন প্রকার—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রতিভাসিক। এই তিন প্রকার সত্যের প্রভেদ বুঝলে জগৎ মিথ্যা একথাটির অর্থ বোঝা যাবে।

আমরা উপরে সত্যের একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছি—"সত্যং নামঽব্যয়ং নিত্যমবিকারী তথৈব চ"। সত্য অব্যয় অবিকারী অর্থাৎ কোনদিনই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় না; সত্য ত্রিকাল-অবাধ, অর্থাৎ ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্বকালেই একরূপ। অদ্বৈতবাদী সত্য বলতে এরূপ সত্যকেই বোঝেন; এবং এরই নাম দেন পারমার্থিক সত্য। এই সংজ্ঞানুসারে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, কারণ ব্রহ্মই কেবল অব্যয়, অবিকারী।

আবার এমন সত্যও আছে যাকে অস্বীকার করলে কোন ব্যক্তি বা জাতি বাঁচতে পারে না, মানুষের জীবন অচল হয়। তা ত্রিকালে অবাধ না হতে পারে; কিন্তু তাকে মেনে চলতে হয়। এরূপ সত্য পারমার্থিক সত্য না হলেও ব্যবহারিক সত্য। জগতের এরূপ ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করতে হয়। পূর্ণজ্ঞানের অবস্থায় জগতের বর্তমান সত্তা থাকে না। জগতের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করলেও অদ্বৈতবাদী জগতের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না। এ অর্থে জগৎ মিথ্যা।

প্রতিভাসিক সত্যের দৃষ্টান্ত অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম। যতক্ষণ অন্ধকার ততক্ষণ এই ভ্রম, আলো আনার সংগে সংগেই এই ভ্রমের অবসান হয়। তাই এর কোন পারমার্থিক বা ব্যবহারিক সত্তা নাই। দেখা গেল অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে জগতের ব্যবহারিক সত্তা থাকলেও পারমার্থিক সত্তা নাই; তাই জগৎ মিথ্যা। কারণ পূর্ণজ্ঞানের অবস্থায় একমাত্র একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মই থাকেন।

রামানুজের মতে যে জগৎ সত্য তা পূর্বেই বলা হয়েছে। জগৎ সত্য না মিথ্যা সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কী বলেন তা আমাদের জানতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ শঙ্করের ন্যায় জগৎকে মিথ্যা বলেন না। তাঁর মতে পূর্ণজ্ঞানের অবস্থায়ও জগৎ থাকে। তবে একথা ঠিক এখন আমাদের নিকট জগৎ যেরূপ প্রতীয়মান হয় পূর্ণজ্ঞান লাভ হলে জগৎ সেরূপ প্রতীত হবে না। তখন জগতের সব কিছুই ঈশ্বরের রূপ বলে মনে হবে—উপনিষদের "সবং খল্বিদং ব্রহ্ম", "বাসুদেবঃ সর্বমিতি" পূর্ণজ্ঞানীর নিকট প্রত্যক্ষ হবে। পূর্ণজ্ঞানের অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ বলেন পুণ্যবানে ও পাপীতে, সুখীতে ও দুঃখীতে, সুন্দরে ও কুৎসিতে, মানুষে ও পশুতে সর্বত্র পূর্ণব্রহ্ম প্রত্যক্ষ হবেন। 'The yogins will see the Divine not only in themselves but in all the cosmos.' অর্থাৎ কেবল One নয় Many'ও তখন সত্য মনে হবে।

জগৎ-সৃষ্টির কারণ

ইতিপূর্বে জগৎ-সৃষ্টি কেন এ প্রসঙ্গের একবার আলোচনা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সৃষ্টি পুরুষ-যজ্ঞ, এবং তা হলো পরমাত্মার আনন্দের খেলা। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় জগৎ যে পরমাত্মার আনন্দেরই খেলা সে কথাটাই আরো পরিষ্কার করে বলেছেন। তাঁর কথা: "World-existence is the ecstatic dance of Shiva; its sole absolute object is the joy of dancing." অর্থাৎ পরমাত্মা যিনি পূর্ণ তিনি কোন অভাব পূরণের জন্য বা প্রয়োজনের তাগিদে নয়, নিজের আনন্দেই সৃষ্টি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন। এ প্রসঙ্গে স্বভাবতই আরও একটি প্রশ্ন মনে পড়ে।

সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়াতে পূর্ণ ব্রহ্মের কি পূর্ণতার হানি হয় না? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বৃহদারণ্যকের পঞ্চম অধ্যায়ের নিম্নোক্ত বিখ্যাত শ্লোকটিতে:

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

"পূর্ণ তিনি, পূর্ণ তাঁর জগৎ; সেই পূর্ণ-অনন্ত-স্বরূপ হতেই এই অসীম জগৎ প্রসূত, কিন্তু তাতে তাঁর হানি বা হ্রাস হয়নি। কারণ অনন্ত-পদার্থ হতে অনন্ত পদার্থ নির্গত হোক না কেন—যে অনন্ত সেই অনন্তই থাকে।" (স্বামী সারদানন্দের অনুবাদ—গীতাতত্ত্ব, ১৪৬ পৃষ্ঠা) শ্রীঅরবিন্দও ঠিক এই কথাই বলেছেন। তাঁর The Life Divine গ্রন্থের উপরোক্ত উদ্ধৃতির পরবর্তী অংশ

এই : It (world existence) leaves Shiva precisely where and what He was, ever is and ever will be."

জগৎ মিথ্যা এ মতবাদের কুফল

জগৎ সত্য না মিথ্যা, কেবল একটা মতবাদ নয়, দর্শন শাস্ত্রের তর্কের বিষয়-বস্তু মাত্র নয় ; এ মতবাদের ফল সমাজ-জীবনের পক্ষেও অতি গুরুতর। ভারতের পক্ষে এ মতবাদের ফল যে এক দিক থেকে খুবই অনিষ্টকর হয়েছে তা শ্রীঅরবিন্দ নানাস্থানে বলেছেন। অবশ্য এ মতবাদের ফল যে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে ভাল হয়নি একথা তিনি বলেন না। কিন্তু জনসাধারণের পক্ষে এ মতবাদ অনিষ্টকর, একথা তিনি খুব জোর দিয়েই বলেছেন। তাঁর কথা : "যে জাতির চিন্তা-প্রণালীর মূলমন্ত্র হয় জগৎ মিথ্যা সেই জাতির (অধ্যাত্ম) জ্ঞান-পিপাসা, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-প্রবণতা বর্ধিত হয় ; রাজোশক্তি তিরোহিত হইয়া সত্ত্ব ও তমঃ প্রবল হয় ; এবং একদিকে জ্ঞানী, সন্ন্যাসী সংসারে জাত-বিতৃষ্ণ প্রেমিক ভক্ত ও শান্তিপ্রার্থী বৈরাগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, অপরদিকে তামসিক, অজ্ঞ ও অকর্মণ্য সাধারণ প্রজার দুর্দশাই সংঘটিত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘটিয়াছে।" (ধর্ম ও জাতীয়তা ২৬শ পৃষ্ঠা)

বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা উপরোক্ত প্রসিদ্ধ পত্রখানাতে একথাটা তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন। "পুরাতন যোগপ্রণালী অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা ঐক্য করতে পারেনি ; জগৎকে মায়া বা অনিত্য লীলা বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফল হয়েছে জীবনীশক্তির হ্রাস, ভারতের অবনতি। গীতায় যা বলা হয়েছে, "উৎসীদেযুরিমে লোকাঃ ন কুর্যাং কর্মচেদহম্।" ভারতের 'ইমে লোকাঃ' সত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। কয়েকজন সন্ন্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েকজন ভক্ত প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন বুদ্ধিহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্ম সিদ্ধি ?" (শ্রীঅরবিন্দের পত্র ২৫শ পৃষ্ঠা)

এই মতবাদ আমাদের প্রাচীন আদর্শের বিরোধী

বস্তুত "জগৎ মিথ্যা" এই মতবাদের ফল সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস-গ্রহণ ; কিংবা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ। কিন্তু এই আনন্দ শ্রীঅরবিন্দের মতে পূর্ণ মানবতার—অধ্যাত্ম ও জীবনের সমন্বয়ের আদর্শের বিরোধী, এবং আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ আদর্শও এ নয়। শ্রীঅরবিন্দ বলেন কেবল মুক্তি নয়,

ভুক্তিও জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে শিক্ষা দিয়ে তন্ত্রশাস্ত্র "জগৎ মিথ্যা" এ মতবাদের কুফল থেকে দেশকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। আর শ্রীঅরবিন্দের মতে "জগৎ মিথ্যা" এই মতবাদ আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষি ও রাজর্ষিদের আদর্শেরও বিরোধী। আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শ কী ছিল, এবং কীভাবে সেই আদর্শের স্থলে "জগৎ মিথ্যা" এই মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল তার ইতিহাসও তিনি বর্ণনা করেছেন। সেকালের চতুরাশ্রম ধর্মের বিধান ও পরে বৌদ্ধ ধর্মের ও শঙ্করাচার্যের অভ্যুত্থানের ইতিহাসের সাহায্যে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর এমতের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন।

প্রাচীন কালে ভারতের আর্যসন্তানদের অধিকাংশের জীবন চার আশ্রমে ভাগ করা হতো। বাল্যে ও প্রথম যৌবনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের লক্ষ্য ছিল বিদ্যা-অর্জন ও চরিত্র-গঠন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম যথাবিধি পালনের পরবর্তী আদর্শ ছিল যৌবনে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী হয়ে সংসার-ধর্ম পালন ধর্মসংগত উপায়ে অর্থ-উপার্জন; এবং ন্যায়-সংগত কামনা পূরণ। ফলে সেকালে ভারতবাসী ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ সাধন করতেন এবং সংসারে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করতেন। প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁরা উপযুক্ত পুত্রের হস্তে সংসার-ভার অর্পণ করে বাণপ্রস্থীর নির্লিপ্ত জীবন যাপন করতেন। শ্রীঅরবিন্দের কথা: "যখন কুলরক্ষা ও ভাবী আর্যজাতি গঠন দ্বারা পূর্বপুরুষদের ঋণ-শোধ" হতো "তখন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আচরণ করা দোষাবহ" হতো না। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ঋষিদের জীবনের আদর্শ ছিল এই; এবং "ইক্ষাকুবংশের রাজাদের এই ছিল কুলব্রত।" যাজ্ঞবল্ক্য পরিণত বয়স পর্যন্ত সংসারধর্ম পালন ও ব্রহ্মবিদ্যা-অনুশীলন করে পরে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন; ইক্ষাকুবংশের রাজগণ, কালিদাসের ভাষায়, "গলিত বয়সে" অর্থাৎ যথাবিধি রাজধর্ম পালনের পর পরিণত বয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করতেন। কিন্তু পরে ভারতের এই প্রাচীন আশ্রম-ধর্মের স্থলে সন্ন্যাসমার্গ শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে গৃহীত হয়, এবং সংসার-ধর্ম পালন করা নিম্নতর আদর্শ বলে গণ্য হয়। ভারতবাসী ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের অর্থ ও কাম বাদ দিয়ে কেবল ধর্ম ও চতুর্থ বর্গ মোক্ষ বা মুক্তিলাভের আশায় সংসারকে উপেক্ষা করতে থাকে। ফলে জগৎ-সভায় তারা তাদের উন্নত স্থান হারিয়ে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়। এই অবনতির পথ রোধ করার জন্যেই তন্ত্র মুক্তির সংগে ভুক্তিকেও, সংসারে ন্যায়-সংগত ভোগ-সুখকেও, আদর্শ বলে প্রচার করে।

সন্ন্যাস সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত

শ্রীঅরবিন্দ সন্ন্যাস গ্রহণের বিরোধী। তিনি পূর্ণ জীবনের পক্ষপাতী— রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য কোন কিছুকেই তিনি জীবন থেকে বাদ দিতে চাননি। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ যে সংগত হতে পারে, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি তাঁর Essays On The Gita গ্রন্থের ত্রিশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ যদি সন্ন্যাসী না হয়ে একজন নামজাদা এটর্নি বা সাংবাদিক হয়ে পরিবার প্রতিপালন করতেন, কিংবা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যদি একজন গৃহী ও গ্রাম্য পাঠশালার গুরুমশায়ের জীবন যাপন করতেন, তবে তাঁরা দুজনের কেউ-ই জগতেরও কোন কল্যাণ করতেন না, ব্যক্তিগত জীবনেও শ্রেয়লাভ করতেন না। খ্রীষ্ট ও বুদ্ধের পক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণই নিঃসন্দেহে পরম শ্রেয় হয়েছিল। কিন্তু তা বলে অনধিকারীদের, অর্থাৎ যাদের মোক্ষলাভের জন্যে কোন মাথা-ব্যথা নেই, যারা চায় সংসারে খেয়ে-পরে থাকতে এবং গৃহস্থ জীবনে উন্নতি করতে, তাদের সন্ন্যাসমার্গে প্রবৃত্ত করা ভুল, মহাভুল। দেশের সকল লোকের সম্মুখে সে আদর্শ তুলে ধরে বুদ্ধদেব ভুল করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "মহান ও উদার বৌদ্ধধর্ম দেশের অনেক হিত সম্পাদন করিয়াও মহা অনিষ্ট করিয়াছে, এবং শেষে ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।" (ধর্ম ও জাতীয়তা ১৯ পৃষ্ঠা) গীতায় শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনকে প্রকৃত শ্রেয়-পথের সন্ধান দিয়েছিলেন—সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রকৃত মর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন। গীতায় যে-পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার আলোচনা শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আদর্শ প্রসঙ্গে আমাদের পরে করতে হবে। এখানে শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বলেন শঙ্করাচার্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন; জগতের ব্যবহারিক সত্তাও স্বীকার করেন; আর যারা জ্ঞানমার্গের অনধিকারী তাদের জন্য শঙ্কর কর্মের বিধানও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কর্মকাণ্ডের, যাগযজ্ঞাদির ব্যর্থতার উপর যে ঝোঁক দিয়েছিলেন তা-ই তাঁর দেশবাসীর মনে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে থাকে। ফলে বিগত দু'হাজার বছর যাবৎ ভারতে সন্ন্যাসের আদর্শই বলবৎ ছিল, এবং ভারত অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। শ্রীঅরবিন্দের কথা এই হলো 'জগৎ মিথ্যা' মতবাদের কুফল। তবে শ্রীঅরবিন্দ একথাও বলেন যে বর্তমান যুগে পূর্ব ও পশ্চিমের মেলামেশার ফলে ভারতবাসীর সন্ন্যাসের মোহ কাটছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন

অতিমানস-বিজ্ঞান ও মানস জ্ঞান

অতিমানস-বিজ্ঞান ও মানস জ্ঞান—**Supermind ও Mind**

পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য হবে শ্রীঅরবিন্দের যোগ। সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের অপর একটি কথা—অতিমানস তত্ত্ব বা Supermind—সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। অতিমানস তত্ত্বকে তাঁর যোগের ভিত্তি বলা যায়। ইতিপূর্বে কয়েকবার কথাটি ব্যবহার করতে হয়েছে। এখানে অতিমানস-বিজ্ঞানের স্বরূপ ও মানস জ্ঞানের সংগে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে আরো কিছু বলা দরকার।

'Supermind' কথাটি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন নামে উল্লেখ করেছেন। যথা Supermind শব্দটির একটি প্রতিশব্দ হলো 'Divine Gnosis' বা সচ্চিদানন্দের অভ্রান্ত জ্ঞান। এ ছাড়া Divine Truth, Truth-consciousness, Divine Light, Divine Force প্রভৃতি শব্দগুলিও Supermind কথাটির প্রতিশব্দ।

Supermind বলতে শ্রীঅরবিন্দ সংক্ষেপে কী বুঝতেন তা জানা যায় তাঁর The Life Divine গ্রন্থের ২৪২ পৃষ্ঠায়। সেখানে তিনি বলেছেন: The Supermind is the Divine Gnosis which creates, governs and upholds the worlds. আরো সংক্ষেপে তিনি Synthesis of Yoga গ্রন্থের ৯০৪ পৃষ্ঠায় Supermind-কে Divine Wisdom and Power বলেছেন। ইতিপূর্বে এই পুস্তকে বলা হয়েছে সচ্চিদানন্দের চিৎ কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ শুধু consciousness নয় কিন্তু Consciousness-Force এই যুক্ত কথাটি ব্যবহার করে থাকেন। মোটকথা Supermind-এর স্বরূপ কী এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় Supermind একদিকে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ বা অভ্রান্ত জ্ঞান অপরদিকে আবার Supermind হলো সচ্চিদানন্দের পূর্ণশক্তিও—যে শক্তি দ্বারা জগৎ সৃষ্ট ও বিধৃত হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে পরাপ্রকৃতিকেই তো জগতের স্রষ্টা শক্তি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে Supermind আর পরাপ্রকৃতির সম্পর্ক কী? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Light on Yoga পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় Supermind-কে 'the manifesting power of Para-Prakriti' (পরাপ্রকৃতি) বলেছেন। সচ্চিদানন্দ আর তাঁর পরাপ্রকৃতি অভিন্ন; দুই

স্বতন্ত্র তত্ত্ব নয়। তাই Supermind-কে সচ্চিদানন্দ চিৎশক্তি কিংবা পরাপ্রকৃতির manifesting power দুই-ই বলা যায়—দুই-ই এক কথা। Supermind-এর স্বরূপ বলতে সংক্ষেপে এই বোঝায়। Supermind সচ্চিদানন্দের অভ্রান্ত জ্ঞান ও পূর্ণশক্তি, শ্রীঅরবিন্দের যোগ আলোচনা কালে একথাটা স্মরণ রাখতে হবে। আমরা দেখবো শ্রীঅরবিন্দের সাধনার লক্ষ্য সচ্চিদানন্দের অভ্রান্ত জ্ঞান ও পূর্ণশক্তির উপলব্ধি লাভ এবং এই উপলব্ধি লাভ দ্বারা জীবনের ও জগতের দিব্য পরিবর্তন-সাধন। দিব্য-পরিবর্তন ব্যাপারটি চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

মানস জ্ঞানের স্বরূপ ও তার অসম্পুর্ণতা

এতো হলো অতিমানস-বিজ্ঞানের স্বরূপ। মানস জ্ঞানের অর্থাৎ মানুষের মন-বুদ্ধির স্বরূপ কী? সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথা: "In us consciousness is Mind; and our mind is ignorant and imperfect, an intermediate power that has grown, and is still growing, towards something beyond itself. There were lower levels of consciousness that came before it and out of which it arose; there must evidently be higher levels to which it is itself arising. Before our thinking, reasoning and reflecting mind there was a consciousness unthinking but living and sentient; and before that there was the subconscious and the unconscious." (The Life Divine, p. 901) ইতিপূর্বে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরমাত্মার পূর্ণজ্ঞানের ক্রম-সংকোচন বা Involution-এর কথা এবং চেতনার ক্রম-বিকাশ বা Evolution-এর কথা বলা হয়েছে। উপরের উদ্ধৃতিতে বলা হলো মানুষের মন একদিকে সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞানের অপর দিকে জড়ের সুপ্ত জ্ঞানের এক মধ্যবর্তী স্তর। মানুষের মন এসেছে অর্থাৎ evolved হয়ে উঠেছে মানব মনের স্তরের নিম্নবর্তী কয়েকটি স্তর থেকে; এবং মনের গতি উর্ধ্বে সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞানের অভিমুখে। বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন মানব মন যে সব নিম্নস্তর থেকে এসেছে তা হলো পশুর বিচারহীন সহজজ্ঞান, তার নীচে উদ্ভিদাদির অবচেতন; এবং সর্বনিম্নে জড়ের সুপ্ত চেতন। একদিন মানব মন আবার সচ্চিদানন্দের অতিমানস জ্ঞানের স্তরে উঠবে, শ্রীঅরবিন্দের এই ধ্রুব বিশ্বাস।

মানব মনের 'ঊর্ধ্বস্থিত স্তর'সমূহ

মানব মনের স্তরের নিম্নে যেমন উপরোক্ত কয়েকটি স্তর, তেমনি মানব মনের ঊর্ধ্বেও আবার কয়েকটি স্তরের কথা শ্রীঅরবিন্দ বলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন Supermind ও মানব মনের মধ্যবর্তী এই স্তরগুলিও তাঁর উপলব্ধির বিষয় হয়েছিল। নিজের উপলব্ধি থেকে তিনি জেনেছিলেন Supermind বা অতিমানস-বিজ্ঞানের নিম্নে কিন্তু মানব মনের উর্ধ্বে পর পর কয়েকটি জ্ঞানের স্তর রয়েছে, যথা, Overmind (অধিমানস), Intuition (প্রজ্ঞান), Illumined mind (প্রবুদ্ধমন); Higher mind (উচ্চতর মন) ইত্যাদি। জ্ঞানের এই স্তরগুলি প্রত্যেকেই মানস জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; তবে তারা কেউ-ই সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞান Spermind-এর ন্যায় অভ্রান্ত নয়; এবং অধিমানস থেকে উচ্চতর মন (Higher mind) পর্যন্ত প্রত্যেকে ক্রমে ক্রমে Involution বা ক্রম-সংকোচনের ফলে ক্রমশ অধিক পরিমাণে ভ্রমপূর্ণ ও অপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মনের উপরকার কিন্তু অতিমানসের নিম্নবর্তী এই বিভিন্ন স্তরসমূহের স্বরূপ এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক বোঝাবার চেষ্টা এই ক্ষুদ্র পুস্তকের লক্ষ্যের বহির্ভূত। বিশেষত উপলব্ধির বিষয় বলে সেগুলিকে বুঝানোও সহজ নয়। তাই এই স্তরগুলির নাম করেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবে শ্রীঅরবিন্দের যোগে এ স্তরগুলির কথা বহুবারই উল্লিখিত হয়েছে; বিশেষত অধিমানস তত্ত্বটির উপর খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। অধিমানস সম্বন্ধে বলা হয় "Overmind is the passage through which one passes from Mind to Supermind." (Lights on Yoga, p. 34)

Supermind তত্ত্ব শ্রীঅরবিন্দের আগেও অজ্ঞাত ছিল না

'Supermind' সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি কথাও উল্লেখ করা দরকার। তিনি বলেন যে 'Supermind' তত্ত্বটি প্রাচীন কাল থেকেই এদেশে এবং অন্যত্রও বিদিত ছিল; তিনিই যে প্রথম 'Supermind'-এর কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। তাঁর কথা: The idea of the Supermind was already in existence from ancient times. There was in India and elsewhere the attempt to reach it by rising to it; but what was missed was the way to make it integral for the life and to bring it down for transforming of the whole nature, even to the physical nature. অর্থাৎ ভারতে আর অন্যত্রও আগেকার যোগীরা সচ্চিদানন্দের পূর্ণজ্ঞানে পৌছুতে চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দই যে প্রথমে

Supermind-এর সন্ধান পেয়েছেন, এ কথা ঠিক নয়। কিন্তু আগেকার যোগীরা একটি কাজ করতে পারেন নি। সচ্চিদানন্দের অতিমানস-বিজ্ঞানকে পার্থিব জীবনে নামিয়ে এনে জীবনের পূর্ণতা-সাধন এবং মানব-প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন-সাধন এমন কি দেহ-প্রাণেরও পরিবর্তন-সাধন করবার উপায় তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। শ্রীঅরবিন্দ সে চেষ্টাই করেছেন, এবং এখানেই তাঁর যোগের বৈশিষ্ট্য। এখানে শ্রীঅরবিন্দের একটা কথা লক্ষ্য করবার মতন। তিনি যোগের দ্বারা বা যোগের ফলে জড় দেহেরও পরিবর্তনের কথা বলেছেন। তার অর্থ কী? ইতিপূর্বে কথাটা একটু ইঙ্গিতে বলা হয়েছে; চতুর্থ অধ্যায়ে কথাটার আবার আলোচনা হবে।

মানস ও অতিমানসের সম্পর্ক ও দুয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য

ইংরেজী শব্দ দুটি Mind ও Supermind, আর বাংলা মানস ও অতিমানস কথা দুটি থেকে সহজেই মনে হবে কথা দুটির মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ক কী? আমরা দেখেছি পূর্ণজ্ঞান অতিমানসই ক্রমে অধিকতর মাত্রায় সংকুচিত (involved) হতে হতে অপূর্ণ জ্ঞান মানব মনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে ভেদ কেবল পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগতও। কারণ, তিনি বলেন, অতিমানসই ক্রমশ নিম্নাভিমুখী হয়ে স্বপ্রকৃতি হারিয়েছে; তার দৃষ্টিভঙ্গীই পরিবর্তিত হয়ে পড়েছে। অতি-মানস ও মানসের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য শ্রীঅরবিন্দ এভাবে দেখিয়েছেন: Mind is a subordinate power of the Supermind which takes its stand, in the stand-point of division, actually forgetful here of the oneness behind, though able to return to it by illumination from the Supramental." অর্থাৎ মানসজ্ঞান অতিমানস-বিজ্ঞানের এক নিম্নতর রূপ। তবে দুয়ের মধ্যে বিপুল ভেদ বিদ্যমান। অতিমানস জ্ঞান ও মানস জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীও স্বতন্ত্র। মানস-জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মন একথাটা ভুলে গিয়েছে, এবং একথাটা উপলব্ধি করতে পারে না যে জগতের পেছনে যে চরম সত্য তা এক। তবে অতিমানসের প্রজ্ঞার আলোকে মনের পক্ষে তার হারানো ঐক্যজ্ঞান বা অভেদজ্ঞান ফিরে পাওয়া সম্ভব। মনের দৃষ্টিভঙ্গী ভেদাত্মক—কথাটির অর্থ মন ভেদ-বুদ্ধির, আমি-তুমি, বিষয় ও বিষয়ী এই ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। কথাটা বুঝিয়ে বলা দরকার।

শ্রীঅরবিন্দ বলেন "The spirit is one that is many. The spirit knows all things as itself. When the Spirit sees anything as an object of knowledge, it yet sees it as itself and in itself and not as a thing other than or divided from it. (Synthesis of Yoga, p 898). অর্থাৎ অতিমানসের পূর্ণ-দৃষ্টিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ী ও বিষয় এক ; দুয়ের মধ্যে ভেদ থাকে না ; তাই বলা হয় 'Supramental knowledge is knowledge by identity' বা অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞান। এই অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানই চরম সত্যকে জানবার একমাত্র উপায়। অপর পক্ষে যা মানুষের জ্ঞানের বিষয় তাকে মানুষ নিজের থেকে পৃথক বলেই জানে ; অর্থাৎ মানুষের মন-বুদ্ধির ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ বিদ্যমান। কিন্তু চরম সত্য এক ও অদ্বিতীয় ; তাই তা মানস জ্ঞানের অগম্য। তবে যোগ-লব্ধ অনুভূতির সাহায্যে মানব-মন চরম সত্যের উপলব্ধি ; লাভ করতে পারে, এবং সে উপলব্ধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ দূর হয়।

অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানে জানা ও হওয়া একই কথা

কেবল অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞান বা 'knowledge by identity' দ্বারাই চরম সত্যকে জানা যায়—এই হলো অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানের একটি বৈশিষ্ট্য। এই অধ্যাত্ম অভেদজ্ঞানের অপর একটি বৈশিষ্ট্যের'ও উল্লেখ প্রয়োজন। সেই বৈশিষ্ট্যটি এই—ব্রহ্মকে জানা আর ব্রহ্ম হওয়া একই কথা। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" বলেছে মুণ্ডক উপনিষৎ (৩।২।৯) যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হন। তখন জীব পরমাত্মার সংগে নিজের ঐক্য অনুভব করে। অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মে আর তখন কোন ভেদ থাকে না। তখন এক ব্যতীত দুই থাকে না। এই হলো জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, এবং মানুষের পাওয়া ও হওয়ার শেষ কথা, কারণ "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" (ঈশোপনিষদ্—৭ম শ্লোক)। কথাটির অনুবাদে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন "Whence shall he have grief who sees everywere oneness." তবে শ্রীঅরবিন্দ এ কথাও বলেন যে ব্রহ্মের সঙ্গে এক হওয়ার অর্থ এই নয় যে ব্রহ্মবিদের ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয়, কিংবা জগৎ মিথ্যা মায়া বলে মনে হয়। 'The spirit is one that is many'—এখানে একমেবাদ্বিতীয়ং যেমন সত্য, তেমনি সর্বও সত্য এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' একথাও সত্য। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যায় এ কথাটা নানাভাবে দেখিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও প্রচলিত যোগমার্গ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত

যোগ—হঠযোগ

যোগ বলতে কী বোঝায়

পূর্বেই বলা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের প্রধান পরিচয় তিনি যোগী। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য শ্রীঅরবিন্দের যোগ। তার ভূমিকা হিসাবে প্রথমে যোগ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলা দরকার। যোগ কথাটির সহজ অর্থ হলো জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সংযোগ। শ্রীঅরবিন্দ যোগ কথাটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন: "Yoga is the discipline through which man enters, through an awakening, into an inner consciousness of union with the Divine." এ কথাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগ হলো এক প্রকারের সাধনা; সে সাধনার সাহায্যে মানুষ নিজের অন্তরে পরমাত্মার সংগে ঐক্য অনুভব করে; এবং এ ঐক্য লাভ করতে হলে মানব-প্রকৃতির জাগরণ প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রাকৃত মানব-প্রকৃতির পরিবর্তন প্রয়োজন। অন্যত্র (Synthesis of Yoga গ্রন্থের ৩৫ পৃষ্ঠায়) শ্রীঅরবিন্দ যোগ কথাটির যে ব্যাখ্যা করেছেন তা-ও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেখানে তিনি লিখেছেন: "Yoga is the union of that which has become separated in the play of the universe with its own self, origin and universality." উপরোক্ত ব্যাখ্যায় শ্রীঅরবিন্দ যা বলেন তার মর্ম এই যে পরমাত্মাই জীবাত্মার প্রকৃত 'আপন' (self) ও উদ্ভবস্থল (origin); আর পরমাত্মার সংগে যোগেই জীবাত্মা সর্বভূতের সংগে এক; কিন্তু পরমাত্মার লীলা বিশ্ব-সৃষ্টির ফলে জীবাত্মা তার 'আপন' (self) পরমাত্মা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে—জীবাত্মা

পরমাত্মার সংগে ঐক্য হারিয়েছে; যোগ হলো এই জীবাত্মার ও পরমাত্মার সংগে মিলন বা পুনর্মিলন।

যোগের বিভিন্ন পন্থা

পরমাত্মার সংগে জীবাত্মার সংযোগ তো নানাভাবেই সম্ভব। মানুষের বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম প্রত্যেকেই তার যোগের সহায় হতে পারে। আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই বিবিধ যোগ-পন্থা প্রচলিত; যথা, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ প্রভৃতি। জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য পরমাত্মা ও জীবাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি ক'রে পরমাত্মার সাযুজ্য লাভ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুয়ের মধ্যে যে অভেদ এই উপলব্ধিলাভ জ্ঞানযোগীর কাম্য। ভক্ত প্রীতি ও প্রেমের দ্বারা ভগবানের সংগে যুক্ত হতে চান—ভক্তের মতে ভগবানের সালোক্য ও সামীপ্য লাভ জীবের পরম পুরুষার্থ। আর তাঁর সকল কর্ম ভগবানে অর্পণ করে কর্মযোগী ভগবানের সংগে নিজের সাদৃশ্য অনুভব করতে চান, ভগবানের লীলা-সহচর হতে চান। আমরা দেখবো শ্রীঅরবিন্দের যোগে এই ত্রিবিধ যোগমার্গেরই সমন্বয় হয়েছে; কিন্তু সাধারণতঃ জ্ঞানী ও ভক্ত কর্মীর মধ্যে বিরোধই দেখা যায়। জ্ঞানী শঙ্কর আর ভক্ত শ্রীচৈতন্যের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ।

জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মীর মধ্যে বিরোধ

জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মীর মধ্যে কী বিরোধ সংক্ষেপে তার একটু উল্লেখ করা যাক্। জ্ঞানী ভক্তিমার্গকে উন্মাদের উচ্ছ্বাস বলে নিন্দা করেন। কর্মকেও জ্ঞানযোগী বিশেষ আমল দেন না। জ্ঞানযোগীর মতে যোগমার্গে যারা প্রবর্তক মাত্র, অর্থাৎ যোগপথে যারা চলতে সুরু করেছেন কেবল তাদের পক্ষেই চিত্তশুদ্ধির উপায় হিসাবে কর্মের প্রয়োজন। জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভ হয় না; এবং জ্ঞানলাভের পর কর্ম অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। ভক্তও আবার জ্ঞানীর তত্ত্ব-জ্ঞান-স্পৃহাকে শুষ্ক তর্কের প্রতি মোহ বলে অবজ্ঞা করেন। আর জ্ঞানীর জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-তত্ত্বের নামে ভক্ত শিউরে উঠেন। ভক্ত জ্ঞানীকে কী চোখে দেখেন তা জানা যায় চৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজের সুবিদিত উক্তি থেকে। উক্তিটি এই:

> অরসিক কাক চুষে জ্ঞান নিম্বফলে
> রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে।

ভক্তও "কর্মকাণ্ড বিষের ভাণ্ড" বলে কর্মের অনাদর করেন। ভক্ত চান

অন্তরের ভগবানের সান্নিধ্য লাভের আনন্দ উপভোগ করতে ; কর্ম করতে গিয়ে ভক্ত এই রসাস্বাদন থেকে বিচ্যুত হতে চান না। আমাদের দেখতে হবে শ্রীঅরবিন্দ কীভাবে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় করেছেন।

জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগ এ তিনটিই আমাদের দেশের সব যোগমার্গ নয় ; এ তিনের অতিরিক্ত হঠযোগ ও রাজযোগ আমাদের দেশের দুটি বিশেষ প্রচলিত যোগমার্গ। আর তন্ত্রের সাধনাও বিশেষ একপ্রকারের যোগ। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine, Lights on Yoga ও Synthesis of Yoga গ্রন্থে এই হঠযোগ, রাজযোগ ও তন্ত্র-সাধনা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন—জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা কালে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার কিছু এ পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ঐসব যোগমার্গ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য সংক্ষেপে আমাদের আলোচনা করতে হবে। প্রথমে হঠযোগের কথাই নেওয়া যাক।

হঠযোগ

মানুষের বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্মশক্তির ন্যায় মানুষের দেহ ও মন তার যোগের অবলম্বন হতে পারে। হঠযোগে দেহ আর রাজযোগে মন সাধনার প্রধান অবলম্বন। বরোদাতে শ্রীঅরবিন্দ যখন যোগ-সাধনা সুরু করেন তখন তিনি স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন : "ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার কোন-না-কোন পথ থাকিবে। হিন্দুধর্মে বলে, নিজের শরীরে নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে, ইত্যাদি" (শ্রীঅরবিন্দের পত্র, পৃষ্ঠা ৭)। হঠযোগের সাধনা বিশেষভাবে দেহ ও প্রাণ নিয়ে ; এবং হঠযোগে আসন ও প্রাণায়াম সাধনার দুই প্রধান অঙ্গ। হঠযোগীর লক্ষ্য দেহকে স্থির করা। দেহ স্থির করার উপায় আসন ও প্রাণায়াম। হঠযোগী তাই প্রথমে নানা কৃচ্ছ্রসাধ্য আসন অভ্যাস করেন। হঠযোগের হঠ কথাটির অর্থই হলো কৃচ্ছ্রসাধ্য। প্রাণের প্রধান প্রকাশ বায়ুতে—শ্বাস-প্রশ্বাসাদিতে। কারো মৃত্যু হলে আমরা বলি তার প্রাণবায়ু বহির্গত হলো, কিংবা সে ব্যক্তি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করলো। অবশ্য শ্বাস-গ্রহণ ও শ্বাস-ত্যাগ দেহমধ্যে বায়ুর একমাত্র কাজ নয় ; বায়ুর বিভিন্ন কাজ অনুসারে যোগশাস্ত্রে বায়ুকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে—সে-সব কথা এখানে অবান্তর। প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণবায়ুর সংযম—নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ—রেচক বা বায়ুত্যাগ, পুরক বা

বায়ু ফুসফুসে আকর্ষণ এবং কুম্ভক বা বায়ু-ধারণ। হঠযোগী প্রাণায়ামের সাহায্যে মনকে স্থির করতে সচেষ্ট হন। দেহ ও মনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ; এবং দেহ ও মন স্থির হলে যোগীর শক্তির অসাধারণ বিকাশ হয়। হঠযোগীর লক্ষ্য দেহ ও মন সাধনার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এজন্যে হঠযোগী আবার নেতি-ধৌতি প্রভৃতি আরো কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার সাহায্যে দেহকে শুদ্ধ ও নীরোগ করে থাকেন। ফলে হঠযোগী জরা ও রোগের আক্রমণ রোধ করে দীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করেন; তাঁর দেহ কষ্ট-সহিষ্ণু ও কঠোর সাধনার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠে। এ পরীক্ষিত সত্য। তাই আজকাল এদেশে বহু শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ লোক নাকি যৌগিক আসনাদি অভ্যাস করার জন্য আগ্রহশীল হয়েছেন।

কুণ্ডলিনী-শক্তি ও ষটচক্র

যে দুটি তত্ত্বের উপর হঠযোগের প্রতিষ্ঠা তা হলো কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব আর ষট্চক্র-তত্ত্ব; তাই হঠযোগে ঐ দুটি তত্ত্ব প্রধান আলোচ্য বিষয়। এখানে হঠযোগের সাধনা ও তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে ঐক্য। রাজযোগে ঐ দুটি তত্ত্বের স্থান আছে, তবে তত প্রাধান্য নেই। "কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করা", "ষট্চক্র-ভেদ করা" প্রভৃতি কথা হঠযোগ ও তান্ত্রিক সাধনার দুটি প্রধান কথা। শ্রীঅরবিন্দ সে-সব কথার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন—তা আমাদের দেখতে হবে। তাঁর Synthesis of Yoga ও The Life Divine গ্রন্থদ্বয়ে এবং Lights on Yoga পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে। যোগ শাস্ত্রে ঐ দুটি তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যার সংগে তা আমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে। শ্রীঅরবিন্দের যোগপন্থায় হঠযোগ, রাজযোগ ও তান্ত্রিক সাধনার স্থান কোথায় সে প্রসঙ্গও আমাদের আলোচনা করতে হবে।

আমাদের দেশে হঠযোগ বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থের অভাব নেই। আমরা এ পুস্তকে স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা-প্রসঙ্গ নামক সুপরিচিত পুস্তকখানা থেকে কুণ্ডলিনী, ষট্চক্র প্রভৃতি যৌগিক বিষয়গুলির বর্ণনা উদ্ধৃত করে শ্রীঅরবিন্দের বর্ণনার সংগে মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করবো। যোগশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীর যে সব নাম দেওয়া হয় তার একটি হলো নাগিনী; এবং যোগশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীকে রূপকের ভাষায় একটি নিদ্রিতা কুণ্ডলী-বদ্ধা নাগিনীরূপে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দও কুণ্ডলিনীকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:
Kundalini Sakti is the power that lies coiled or involved

in the lowest centre at the bottom of the spine ; it is awakened by Yoga and rises to join the Divine Power or Presence in the Sahasradal." (Lights on Yoga, p. 86)। এটি যে একটি রূপক বর্ণনা তা বলাই বাহুল্য—সত্যি সত্যি তো মেরুদণ্ডের তলদেশে একটি কুণ্ডলীবদ্ধ নাগিনীর অস্তিত্ব নেই। তাই কথাটা ব্যাখ্যা করে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Synthesis of Yoga গ্রন্থের ৬১২ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "Put less, symbolically, in more philosophical language this means that the real energy of our being is lying asleep and inconscient in the depths of our vital system, and is awakened by the practice of Pranayam. " তাই সংক্ষেপে কুণ্ডলিনী শক্তির ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ 'Pranic dynamism' কথাটি ব্যবহার করেছেন। যোগশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীর কী ব্যাখ্যা দেওয়া হয় দেখা যাক্।

কুণ্ডলিনী-তত্ত্ব বুঝতে হলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের এ সিদ্ধান্তটি মনে রাখতে হবে যে 'Every Psychosis has its neurosis'—অর্থাৎ আমাদের মনে কোন ভাবের উদয়ের সংগে সংগে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলিতে একটা পরিবর্তন ঘটে থাকে। আমাদের মস্তিষ্ক ও মনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ অথচ দুর্বোধ্য ও রহস্যপূর্ণ। একথা স্মরণ রেখে যোগশাস্ত্রে কুণ্ডলিনী শক্তি সম্বন্ধে কী বলা হয়ে থাকে তা দেখা যাক্। উপরোক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় স্বামিজী লিখেছেন : "যে প্রকার ভাবই তোমার মনে উঠুক না কেন, উহা তোমার মস্তিষ্কে চিরকালের নিমিত্ত একটি দাগ অঙ্কিত করিয়া যাইবে। এইরূপে ভাল মন্দ দুই প্রকার ভাবের দুই প্রকার দাগের স্বল্পাধিক্য লইয়াই তোমার চরিত্র গঠিত ও তুমি ভাল বা মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত। প্রাচ্যের বিশেষত ভারতের যোগীঋষিরা বলেন, ঐ দুই প্রকার ভাব মস্তিষ্কে দুই প্রকার দাগ অঙ্কিত করিয়াই শেষ হইল না।—ভবিষ্যতে আবার তোমাকে ভালমন্দ কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে এরূপ সূক্ষ্ম প্রেরণা-শক্তিতে পরিণত হইয়া মেরুদণ্ডের শেষভাগে অবস্থিত মূলাধার নামক মেরুচক্রে নিত্যকাল অবস্থান করিতে থাকে। জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ঐরূপ প্রেরণাশক্তি-সমূহের উহাই বাসভূমি। ঐ সকলের নামই সংস্কার বা পূর্বসংস্কার। ঐ সকল পূর্ব-সংস্কারের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি অবলম্বনে অবস্থিতা মহা ওজস্বিনী প্রেরণা-শক্তিকেই পতঞ্জলি প্রমুখ ঋষিগণ কুণ্ডলিনী আখ্যা দিয়াছেন।" শ্রীঅরবিন্দও

কুণ্ডলিনীকে "Pranic dynamism," "Sleeping serpent of Energy" প্রভৃতির নাম দিয়েছেন; আর শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন কুণ্ডলিনীর অবস্থান 'in the lowest centre of the spine' বা মূলাধারে। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা যোগশাস্ত্রেরই অনুগামী।

কুণ্ডলিনী বলতে শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝেন এবং যোগশাস্ত্রে কুণ্ডলিনীর কী ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তা দেখা গেল। ষট্চক্র বলতে কী বোঝায়? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Lights on Yoga পুস্তিকায় চক্র কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেন 'the psychological centres in the subtle body'। এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ যা বলেন তা এই: "যোগশাস্ত্র বলে আমাদের মস্তিষ্ক থেকে আরম্ভ করে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে একটি পথ মেরুদণ্ডের মূলে অর্থাৎ সর্বনিম্নে মূলাধার পর্যন্ত আসিয়াছে। ঐ পথই যোগশাস্ত্রে কথিত সুষুম্না-বর্ত্ম। মূলাধারের উর্ধ্বে পরপর স্বাধিষ্ঠান (তলপেটের মধ্যভাগে), মণিপুর (নাভিমূলে), অনাহত (হৃদয়ে), বিশুদ্ধ (গলমধ্যে) ও আজ্ঞাচক্র (ভ্রূদ্বয় মধ্যে) নামক ছয়টি চক্র অবস্থিত। সর্বোপরি মস্তিষ্কে সহস্রদল নামক চক্র অবস্থিত। চক্রগুলিকে যোগশাস্ত্রে বিভিন্ন দলবিশিষ্ট পদ্মরূপে কল্পনা করা হয়। সহস্রদল একটি সহস্র দলবিশিষ্ট পদ্মরূপে কল্পিত। এই চক্রগুলির প্রত্যেকের সংগে আমাদের কী কী মনোভাবের সম্পর্ক তা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Life on Yoga পুস্তিকার ১৮শ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই চক্রগুলি বস্তুত কী? শরীর-বিজ্ঞানের মতে মেরুদণ্ডের ভিতর স্নায়ুময় spinal chord বা সুষুম্না-রজ্জু অবস্থিত। চক্রগুলি সেই স্নায়ুময় সুষুম্না-রজ্জুর বিশেষ কয়েকটি স্নায়ু-কেন্দ্র। কথিত আছে আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ-সরস্বতী একটি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মেরুদণ্ডের ভিতরে চক্রগুলি না দেখতে পেয়ে যোগশাস্ত্রের উপর আস্থা হারান। শ্রীঅরবিন্দের কথা চক্রগুলি স্থূল দেহের নয়, সূক্ষ্ম দেহের; তাই তারা চর্মচক্ষুর অগোচর। স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধে এবং ঐ দুয়ের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে যোগাযোগের কথা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের আলোচনা প্রসঙ্গে উপরে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের নিকট কথাগুলি দুর্বোধ্য সন্দেহ কি?

ষট্চক্রভেদ কথাটা যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রে খুবই শোনা যায়। ষট্চক্রভেদের এই ব্যাখ্যা যোগশাস্ত্রে দেওয়া হয়ে থাকে: কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে সুষুম্না-বর্ত্ম দিয়ে উর্ধ্বগামী হয় এবং পর পর বিভিন্ন চক্রগুলি অতিক্রম করে যখন সহস্রদল পদ্মে পৌছায় তখন সাধক সমাধি অবস্থায় পরমাত্মার সংগে ঐক্যানুভব করেন,

এরূপ বলা হয়। সমাধির কথা আমরা রাজযোগ প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। কুণ্ডলিনী সহস্রদলে পৌছিলে তন্ত্রের ভাষায় বলা হয় শিব-শক্তির মিলন হয়; শ্রীঅরবিন্দের কথা হলো 'awakening of the Kundalini to join the Divine Power or Presence'. যোগের ভাষায় সহস্রদল চক্র হলো পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনভূমি।

কুণ্ডলিনী কীভাবে জাগ্রত হয় সে প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন : Pranayam awakens the coiled-up serpent of Pranic Dynamism, when by Pranayam the division between the upper and lower Prana currents in the body is dissolved. This Kundalini is struck and awakened ; it uncoils itself and begins to rise upward like a fiery serpent breaking open each lotus (পদ্ম বা চক্র). As it ascends, the Sakti meets the Purusha……in deep Samadhi of union. এসব যোগীই বুঝতে পারেন ; সাধারণ লোকের নিকট এগুলি দুর্বোধ্য। তবে শ্রীঅরবিন্দ এসব তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ছিলেন ; তাই এখানে তাদের উল্লেখ করতে হলো।

হঠযোগের মূল্য

কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে সাধকের মধ্যে কী পরিবর্তন হয় সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন : (it) opens to the yogin fields of consciousness, ranges of experience, abnormal faculties denied to ordinary human life. অর্থাৎ তখন হঠযোগীর চেতনার অদ্ভুত প্রসার হয় ; তাঁর বহুবিধ বিচিত্র উপলব্ধি হয়, আর তাঁর যে সব শক্তি লাভ হয় তা সাধারণ লোকের জীবনে সম্ভব নয়। তাই কারো মধ্যে বিশেষ শক্তির বিকাশ দেখা গেলে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন ; "ওর কুণ্ডলিনী জেগেছে।" কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, এ সবের আধ্যাত্মিক মূল্য কী? শ্রীঅরবিন্দ বলেন হঠযোগীকে তাঁর সাধনার জন্যে যে আয়াস স্বীকার করতে হয়, যে সময় ব্যয় করতে হয়, তা তাঁকে মানুষের প্রাত্যহিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, প্রতিদিনের কাজের অযোগ্য করে তোলে। হঠযোগী যে ফললাভ করেন তা শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় কৃপণের ধনের সামিল, সর্বসাধারণের কাজে লাগে না।

এই প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর এক শিষ্যকে হঠযোগের মূল্য সম্বন্ধে সাবধান করে যা বলেছিলেন তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এক

সময় এক হঠযোগী দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে কিছু কাল বাস করেন; এবং আসনাদির ও নেতি ধৌতির কসরৎ দেখিয়ে তিনি অনেককে মুগ্ধ করেন। পরমহংসদেব তাঁর এক অল্পবয়স্ক শিষ্যকে মুগ্ধ বিস্ময়ে হঠযোগীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করতে দেখে তার হাত ধরে নিয়ে আসেন এবং তাকে বলেন, "তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাস্‌নে। ওসব হঠযোগের ক্রিয়াকলাপ শিখলে ও করলে শরীরের উপরই মন পড়ে থাকবে, ভগবানের দিকে যাবে না।" লীলাপ্রসঙ্গ, ৩য় খণ্ড, ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) শ্রীঅরবিন্দের মতও তাই। তিনি তাঁর Synthesis of Yoga গ্রন্থের ৭ম পৃষ্ঠায় বলেছেন: If the Yogin turns his efforts of life, he is in danger of losing God. তাই হঠযোগের আধ্যাত্মিক মূল্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের সুস্পষ্ট অভিমত এই: The Hathayogic methods can be dispensed with, though there is no objection to their partial use. হঠযোগীর কাছে ঐ সব প্রক্রিয়াই মুখ্য; শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় তারা অবান্তর। তাঁর মতে হঠযোগের দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হবারই সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গযোগ

রাজযোগের অষ্ট অঙ্গ

হঠযোগে দেহ আর প্রাণ, আর রাজযোগে মন হলো সাধনার প্রধান অবলম্বন। রাজযোগের অপর নাম অষ্টাঙ্গযোগ। এই যোগের আটটি অঙ্গ যথাক্রমে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই আটটি অঙ্গের মধ্যে যম থেকে প্রত্যাহার পর্যন্ত প্রথম পাঁচটি হলো রাজযোগের বহিরঙ্গ বিভাগ; শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় তারা হলো 'preliminary self-discipline', আর শেষের তিনটি—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, হলো রাজযোগের অন্তরঙ্গ বিভাগ বা আসল জিনিস। এই দুই বিভাগের মধ্যে প্রথমটি হলো দ্বিতীয় বা অন্তরঙ্গ বিভাগের প্রস্তুতি মাত্র।

যম ও নিয়ম

যম ও নিয়মে রাজযোগের আরম্ভ; আর সমাধিতে রাজযোগের পরিসমাপ্তি; শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় এখানে পরিসমাপ্তির অর্থ হলো 'the supreme step of

the ladder of yogic practice in Rajyoga'। যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। অস্তেয় কথার মূলগত অর্থ চৌর্যের অভাব; বা চুরি না করা। শ্রীঅরবিন্দ অস্তেয় কথাটিকে কি অর্থে গ্রহণ করতেন তা জানা যায় তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা পত্রের নিম্নের উদ্ধৃতিটি থেকে: "হিন্দুশাস্ত্র বলে, যে ভগবানের নিকট ধন লইয়া ভগবানকে দেয় না সে চোর। এ পর্যন্ত ভগবানকে দুই আনা, চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া······আমি এতদিন পশুবৃত্তি ও চৌর্যবৃত্তি করিয়া আসিতেছি ইহা বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে। আর নয়, সে পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম।" (শ্রীঅরবিন্দের পত্র ৫ম পৃষ্ঠা)। সোজা কথায় অস্তেয় কথার অর্থ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন রাখা চৌর্য। অপরিগ্রহ কথার অর্থ কোন কিছু গ্রহণ না করা।

নিয়ম পাঁচটি। এই পাঁচটি পালনীয় নিয়ম হলো শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান। শৌচ হলো বাইরের ও অন্তরের শুদ্ধতা। স্বাধ্যায় কথার অর্থ মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা প্রণব (ওঁকার) জপ। ঈশ্বর-প্রণিধান কথার দুটি অর্থ করা হয়—এক অর্থ সর্ব কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ; অপর অর্থ ভক্তিসহকারে ঈশ্বর-চিন্তন।

রাজযোগে প্রথম ধাপ হিসাবে যম ও নিয়ম অত্যাবশ্যক। যম ও নিয়মের উদ্দেশ্য শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, 'moral purification of the mentality'. তিনি বলেন: This preliminary is of supreme importance; without it the course of the rest of the Rajyoga is likely to be troubled, marred and full of unexpected mental, moral and physical perils.

রাজযোগে আসন

রাজযোগে আসনের সংজ্ঞা "স্থিরসুখং আসনম্"—অর্থাৎ যথা সুখ উপবেশনই আসন। হঠযোগীর ন্যায় রাজযোগী নানা কৃচ্ছ্রসাধ্য আসন অভ্যাস করেন না; গুটিকয়েক সহজ আসনই রাজযোগে প্রচলিত। শ্রীঅরবিন্দ বলেন: "Asana is used by Rajyoga only in its easiest and most natural position, that naturally taken by the body when seated and gathered together, but with the back and head strictly erect and in a straight line, so that there may be no deflection of

the spinal chord." (Synthesis of Yoga, p. 614)। সকল প্রকার আসনেই মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হয় ; গীতার ভাষায়, "সমং কমে শির গ্রীবং" হওয়া দরকার, অর্থাৎ বক্ষ, গ্রীবা ও শির সোজা রাখতে হয়, নইলে প্রাণায়াম বা নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অবাধ হয় না। এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য "আসন স্থির ও সুখাবহ হওয়া চাই।" যাহাতে কোন প্রকার পীড়া বোধ হইতে থাকে বা শরীরে অস্থৈর্যের সম্ভাবনা থাকে তাহা যোগাঙ্গ আসন নহে। (পাতঞ্জল দর্শন, হরিহরানন্দ আরণ্যক, ১৭৯ পৃষ্ঠা)।

প্রাণায়াম

চিত্ত স্থির করবার সহায়ক হিসাবে রাজযোগে প্রাণায়ামের ব্যবহার হয়ে থাকে। আমরা জানি বরোদায় যখন শ্রীঅরবিন্দ যোগাভ্যাস আরম্ভ করেন তখন তিনি প্রাণায়াম দিয়েই আরম্ভ করেন। এক বন্ধুর নিকট প্রাণায়ামের রীতি জেনে নিয়ে প্রাণায়াম অভ্যাস সুরু করেন ; এবং প্রথম প্রথম তিনি দিনে কয়েক ঘণ্টা ধরে প্রাণায়াম করতেন। প্রাণায়াম অভ্যাসের ফলে তাঁর কবিত্ব-শক্তির বৃদ্ধি ব্যতীত আর বিশেষ কোন ফল লাভ হলো না। প্রাণায়াম তাঁর যোগে যে গৌণ, 'of secondary importance' তার প্রমাণ এই যে তিনি নিজেও শেষে প্রাণায়াম অভ্যাস পরিত্যাগ করেন, মতিলাল রায় মশাইকেও প্রাণায়াম অভ্যাস ত্যাগ করতে বলেছিলেন। প্রাণায়াম সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অপর একটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : "In modern India people attracted to Yoga, but picking up its process from books or from persons only slightly acquainted with the matter, often plunge straight into pranayam of Rajyoga frequently with disastrous results. Only the very strong in spirit can afford to make mistakes in this Path. শ্রীঅরবিন্দের মতন শক্তিমান পুরুষের পক্ষে যা কোন বিপদের কারণ হয়নি, দুর্বল লোকের পক্ষে যে তা বিপজ্জনক হতে পারে তা অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়। উপযুক্ত গুরুর সাহায্য ব্যতীত প্রাণায়াম অভ্যাস করতে গেলে অনেক সময় মস্তিষ্কের বিকৃতি ও অন্তর্বিধ ব্যাধি যে ঘ'টে থাকে তা অনেকেই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন।

এখানে প্রাণায়ামের মূল্য ও প্রাণায়ামের অনিষ্টকারিতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে গান্ধিজী যা বলেন তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গান্ধিজী তাঁর গীতার ব্যাখ্যা 'অনাসক্তি যোগ' নামক পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাণায়ামের উপর টিপ্পনী

করতে গিয়ে লিখেছেন : "প্রাণায়ামাদি তো বাহ্য ক্রিয়া ; আর তাহার প্রভাব শরীরের স্বাস্থ্য-রাখার ও পরমাত্মার বাস করিবার যোগ্য মন্দির-গঠন করিবার প্রয়োজনের দ্বারা পরিমিত। (ভোগী যে প্রয়োজন ব্যায়ামাদির দ্বারা মিটায়, সেই প্রয়োজন যোগী প্রাণায়ামাদির দ্বারা মিটায়।......আজকাল প্রাণায়ামাদি বিধি খুব কম লোকেই জানে। যাহার ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির উপর অন্ততঃ প্রাথমিক বিজয়লাভ হইয়াছে, যাহার মোক্ষের উৎকট ইচ্ছা হইয়াছে, আর যে রাগ-দ্বেষ জয় করিয়া ভয় ত্যাগ করিয়াছে তাহার পক্ষে প্রাণায়ামাদি উপযোগী ও সাহায্যকারী) অন্তঃ শৌচ বিনা প্রাণায়ামাদি বন্ধনের এক সাধন হইয়া মানুষকে মোহকূপের খুব নীচে লইয়া যাইতে পারে, লইয়া যায়, এমন অনেকে অনুভব করিয়াছেন। সেইজন্য যোগীন্দ্র পতঞ্জলি যম-নিয়মকে প্রথম স্থান দিয়া উহার সাধকের জন্যই মোক্ষমার্গে প্রাণায়ামাদি সহায়ক গণ্য করিয়াছেন।" (৮৪ পৃষ্ঠা)।

প্রত্যাহার

প্রত্যাহার কথাটির অর্থ ইন্দ্রিয় ও মনকে তাদের বিষয় থেকে নিবৃত্ত করা। মানুষের মনকে সতত চঞ্চল সমুদ্রের সংগে তুলনা করা যায়। চঞ্চল মনকে স্থির করে একাভিমুখী করা, অর্থাৎ একাগ্রতা-সাধন সকল যোগে এবং শ্রীঅরবিন্দের যোগেও অত্যাবশ্যক। শ্রীঅরবিন্দের কথা : 'Concentration is indeed the first condition of my yoga' (Synthesis of Yoga, p. 89) তাই যোগের সংজ্ঞা—"যোগঃ চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। শ্রীঅরবিন্দ চিত্তবৃত্তি নিরোধ কথাটির ইংরেজী করেছেন 'stilling of the waves of consciousness, its manifold activities'. শ্রীঅরবিন্দের মতে একাগ্রতা সাধনের সূচনা হয় প্রত্যাহার সাধনা থেকে। ধারণা ধ্যান ও সমাধি একাগ্রতার ক্রমোচ্চ রূপ।

ধারণা ও ধ্যান

ধারণা কথার অর্থ কোন এক স্থানে অর্থাৎ বিষয়ে মনকে স্থির করার চেষ্টা ; শ্রীঅরবিন্দ বলেন ধারণা হলো 'holding of the one object of concentration to the exclusion of all other ideas and activities'. যোগশাস্ত্রে ধ্যানের সংজ্ঞা "চিত্তবৃত্তির একতান প্রবাহ" বা, শ্রীঅরবিন্দের কথায়, 'prolonged absorption of the mind in the one object of concentration' অর্থাৎ ধ্যান হলো মনের সেই একাগ্র অবস্থা যখন মন

দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন বিষয়ে আর ধাবিত হয় না; অর্থাৎ ধ্যান বলতে বোঝায় এই যে মনকে একটি মাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ করতে সাধক অভ্যস্ত হয়েছেন। ধ্যান পরিপক্ব হলে চিত্তধ্যেয়াকারে পরিণত হয়।

সমাধি

সমাধির অবস্থা একটি উপমা দ্বারা বোঝানো হয়—শরবৎ তন্ময়। শর যেমন লক্ষ্যের সঙ্গে এক হয়ে যায়, তেমনি সমাধির অবস্থায় আত্মা ব্রহ্মের মধ্যে তন্ময় হয়ে পড়ে। রাজযোগে সমাধি বলতে কী বোঝায় তা নিম্নের উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: "সাদা কথায় ধ্যান করিতে করিতে যখন আত্মহারা হইয়া যাওয়া যায়, যখন কেবল ধ্যায় বিষয়ের সত্তারই উপলব্ধি হইতে থাকে এবং আত্মসত্তাকে ভুলিয়া যাওয়া যায়; যখন ধ্যায় বিষয় হইতে নিজের পার্থক্য জ্ঞানগোচর হয় না ধ্যায় বিষয়ে তাদৃশ চিত্তস্থৈর্যকেই সমাধি বলা যায়।" (পাতঞ্জল দর্শন, হরিহরানন্দ আরণ্যক)

সমাধির অবস্থায় যে চিত্তধ্যায়াকারে পরিণত হয়, অর্থাৎ ধাতা ও ধ্যায়ের মধ্যে ভেদ থাকে না সেই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। চিত্ত স্থির করার অন্যতম উপায় হিসাবে পতঞ্জলি বলেছেন, "যথাভিমত ধ্যানাৎ বা" অর্থাৎ সাধকের প্রিয় কোন একটি বিষয়ের ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হয়। এখন গল্পটি বলা যাক:—

"একটি ছাত্র গুরুর নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে গিয়াছিল। গুরু দেখিলেন বেদপাঠের সময় ছাত্রটির মন স্থির থাকে না, বারবার এদিক ওদিক যায়। গুরু ছাত্রটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন?' ছাত্রটি বলিল, 'আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় মহিষ আছে; তাহারই কথা মনে পড়ে, সুতরাং চিত্ত স্থির করিতে পারি না।' গুরু বলিলেন, 'তবে তুমি বেদপাঠ ক্ষান্ত রাখিয়া কিছুকাল তোমার প্রিয় মহিষটির বিষয় চিন্তা কর।' ছাত্রটি একান্তে বসিয়া প্রিয় মহিষটিরই চিন্তা আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে গুরু এক দিবস একটি ক্ষুদ্র দ্বারের অপর পার্শ্বে বসিয়া ছাত্রটিকে ডাকিলেন, 'তুমি এদিকে এস, পুনরায় তোমার বেদাধ্যয়ন আরম্ভ হইবে।' ছাত্রটি আসিল। গুরু দেখিলেন ছাত্রের চিত্ত তখনও স্থির হয় নাই। আবার ছাত্রটিকে মহিষের ধ্যান করিতে আদেশ করিলেন। ছাত্র পুনরায় তাহার প্রিয় মহিষের ধ্যানে বসিল। কিছুকাল পরে আবার গুরু সেই দ্বারের অপর পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে ডাকিলেন। এবার ছাত্র উত্তর করিল, 'আমি কিরূপে আপনার নিকট

উপস্থিত হইব? আমার শৃঙ্গ দ্বারে বাধিবে।' গুরু বুঝিলেন মহিষে ইহার সমাধি হইয়াছে, চিত্ত স্থির (অর্থাৎ ধ্যেয়াকারে পরিণত হইয়াছে)। ছাত্রকে বলিলেন, 'এস, এস তোমার শৃঙ্গ বাধিবে না; আমি তাহার প্রতিবিধান করিব।' ছাত্র গুরুর নিকট আসিল; বেদপাঠ আরম্ভ হইল। মহিষের ধ্যানে শিষ্যের এমন একাগ্রতা সাধন হইয়াছে যে অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি বেদে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া পড়িলেন।" (ভক্তিযোগ, অশ্বিনীকুমার দত্ত)। সমাধি বলতে কী বোঝায় তা এ গল্পে বলা হয়েছে।

সমাধি Trance নয়

সমাধির ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসাবে 'trance' কথাটির ব্যবহার কেউ কেউ করে থাকেন। Trance তো এক বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থা। কিন্তু সমাধিতে বাহ্যজ্ঞান না থাকলেও সমাধি অজ্ঞান অবস্থা নয়, বরং জ্ঞানের এক পূর্ণতর ও উচ্চতর অবস্থা। শ্রীঅরবিন্দ বলেন পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান কিছুদিন যাবৎ মনের অবচেতন স্তরের সন্ধান পেয়েছে, এবং স্বপ্ন, অবচেতন মন প্রভৃতির ব্যাখ্যা খুঁজছে; কিন্তু মনের স্তরের ঊর্দ্ধেকার স্তরের কথা, সমাধি প্রভৃতির কথা পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের অজ্ঞাত। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ঋষিদের নিকট মনের ঊর্দ্ধতন ঐ সব স্তর যে অজ্ঞাতে ছিল না, তার প্রমাণ আমাদের উপনিষৎ, বিশেষভাবে মাণ্ডুক্য উপনিষৎ। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাণ্ডুক্য উপনিষদখানা আকারে অতি ক্ষুদ্র, মাত্র ১২টি সূত্রের সমষ্টি; কিন্তু তার মূল্য এতই অধিক যে তার সম্বন্ধে বলা হয় "মাণ্ডুক্যম্ একমেবালম্ মুমুক্ষণাম্ বিমুক্তয়ে", অর্থাৎ মাণ্ডুক্য উপনিষৎ এককই মুমুক্ষুদিগের মুক্তির পক্ষে পর্যাপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থে নানা স্থানে মাণ্ডুক্যের শ্লোকগুলি উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করেছেন; এবং The Synthesis of Yoga গ্রন্থে তিনি মাণ্ডুক্যের সাহায্যে আত্মার স্বরূপ ও সমাধি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। কী ভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন দেখা যাক (৫৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে: এই সমস্তই ব্রহ্ম। জীবাত্মা ব্রহ্ম। এই আত্মার চার অংশ। চেতনার চার অবস্থা—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়। শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা: The old Indian Psychology divided consciousness into three provinces—waking state (জাগ্রত), dream state (স্বপ্ন) and sleep state (সুষুপ্ত); and it supposed in the human being a waking self, a dream self, a sleep self,

with the supreme or absolute self of being or Turiya (তুরীয়) beyond. বলা বাহুল্য যে চেতনার স্তরগুলিকে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্ত বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সেই স্তরগুলি লৌকিক জীবনের জাগ্রত, স্বপ্ন ও নিদ্রা নয়। লৌকিক নিদ্রায় (সুষুপ্তিতে) জ্ঞান থাকে আচ্ছন্ন; কিন্তু আত্মার চেতনার সুষুপ্তির স্তরের নাম মাণ্ডুক্যে দেওয়া হয়েছে প্রজ্ঞান বা প্রকৃষ্ট জ্ঞানের অবস্থা ; এবং এ অবস্থাকে বলা হয়েছে আত্মার আনন্দের অবস্থা। আর চেতনার তিন অবস্থা বা স্তর বলা হয়েছে এজন্যে যে তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থাকে চেতনার স্তরের মধ্যে ধরা হয়নি কারণ সে অবস্থা চেতনার অবস্থা নয়, চেতনার উর্ধ্বতন এক Superconscious state। সেই অবস্থাকে মাণ্ডুক্য অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করেছে। শ্রীঅরবিন্দ ঐ বিশেষণগুলির অনুবাদ করেছেন এই বলে যে সে অবস্থা unthinkable, beyond relation, featureless in which all is stilled. অর্থাৎ সে অবস্থা চেতনার অতীত সমাধি-লভ্য এক অবস্থা।

সমাধিতে লভ্য এ অবস্থা অনির্দেশ্য, কারণ সে অবস্থায় মানুষের যে কী উপলব্ধি হয় তা বর্ণনা করা যায় না। স্বামী সারদানন্দ পরমহংসদেবের প্রসঙ্গে লিখেছেন যে পরমহংসদেব সমাধির অবস্থায় তিনি কী উপলব্ধি করেন তা তাঁর শিষ্যদের বলবার জন্যে বারবার চেষ্টা করেও বলতে পারেন নি। তিনি এ প্রসঙ্গে একটি উপমা দিতেন। নুনের পুতুল গেল সমুদ্রের গভীরতা মাপ করতে; কিন্তু সমুদ্রের জলে নুন গেল গ'লে। তখন কে আর সংবাদ দেবে? সমাধির অবস্থায় কী উপলব্ধি হয় তা মুখে বলা যায় না। রাজযোগে সমাধির অবস্থা সম্বন্ধে বলা হয় "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্"; অর্থাৎ সমাধির অবস্থায় সাধক আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। জীব স্বরূপত ব্রহ্ম ; তাই স্বরূপে অবস্থান কথার অর্থ ব্রহ্মের সংগে জীবের ঐক্যানুভূতি লাভ। এই ঐক্যানুভূতিই সাধনার শেষ লক্ষ্য ; তাই সমাধির এত মূল্য।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় রাজযোগের স্থান

শ্রীঅরবিন্দের যোগে রাজযোগের স্থান কোথায়? আমরা দেখেছি যম ও নিয়মকে শ্রীঅরবিন্দ সাধনার প্রথম সোপান হিসাবে একান্ত আবশ্যক মনে করেন। একাগ্রতা-সাধনও তাঁর যোগের ও সকল যোগেই অত্যাবশ্যক। তবে রাজযোগে একাগ্রতা-সাধনের সহায়ক হিসাবে প্রাণায়ামের ব্যবহার হয়। শ্রীঅরবিন্দ প্রাণায়ামকে অত্যাবশ্যক মনে করতেন না। সমাধি হলো সাধনার

লক্ষ্য ; কিন্তু রাজযোগে যে সমাধি লভ্য শ্রীঅরবিন্দের নিকট তা কাম্য নয়। রাজযোগে সমাধি হয় ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থায় ; সমাধি-ভঙ্গে প্রতিদিনের জীবনে ফিরে এলে সমাধিতে যে উপলব্ধি লাভ হয়েছিল তা অন্তর্হিত হয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য প্রতিদিনের জাগ্রত অবস্থায়ও ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের ঐক্যানুভূতিতে স্থির থাকতে হবে। আর তাঁর কথা পতঞ্জলি একাগ্রতা-সাধনের জন্যে ও সমাধিলাভের জন্যে যে সকল পথ নির্দেশ করেছেন সে পথ ব্যতীত অন্য পথেও ঐ ফল লাভ করা যেতে পারে। তাই তাঁর কথা তাঁর যোগে রাজযোগ হলো 'of secondary importance' অর্থাৎ অত্যাবশ্যক নয়। তবে কোন সাধক যদি প্রাণায়ামাদির ব্যবহারে উপকার পান তাহলে তাঁর ব্যবহারে কোন দোষ নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তান্ত্রিক সাধনা

তন্ত্রসম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত

তন্ত্রের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের ধারণা অতি উচ্চ ছিল। তিনি বলেন তন্ত্রের বামাচারমার্গের অনেক কিছু আমাদের নীতি-বিরোধী ; তাই অনেকে তন্ত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ। কিন্তু তন্ত্রের বামাচারই তো সব নয় ; তন্ত্রে দক্ষিণাচারও আছে। আমাদের দেশের সাধনার দুই ধারা—বৈদিক ও তান্ত্রিক। ব্রহ্ম ও শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি এই দুই তত্ত্ব বেদান্তে ও তন্ত্রে উভয়েই স্বীকৃত, এবং বেদান্ত ও তন্ত্র উভয়ের মতে ব্রহ্ম ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি মূলত অভিন্ন। বস্তুত তান্ত্রিক সাধনার তাত্ত্বিক ভিত্তিও অদ্বৈতবাদ—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। তবে বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য ও গন্তব্যস্থল এক হলেও যাত্রাপথ ভিন্ন। বৈদান্তিক সাধনায় ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম নিয়ে সাধনার আরম্ভ ; অর্থাৎ উপাস্য পুরুষোত্তম ; আর তান্ত্রিক সাধনায় শক্তিই উপাস্য এবং প্রধান। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ আর শক্তিকে The Mother বলে জানা দুয়েরই ফল এক।

শ্রীঅরবিন্দের মতে তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে তন্ত্র সকল সাধন মার্গের এক বিরাট সমন্বয়। তন্ত্র হঠযোগের ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করেছে ; রাজযোগের যম নিয়মাদির ও সমাধির স্থান তন্ত্রে রয়েছে। অদ্বৈত জ্ঞান তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। তন্ত্রে ভক্তিরও স্থান আছে, তান্ত্রিক সাধক মহামায়াকে মা বলে

ভক্তিভরে পূজা করেন। তন্ত্র কর্মকে অবহেলা করে না; তান্ত্রিক সাধনা কর্মবহুল। এমন কি বামাচারমার্গে মানুষের নিম্ন প্রবৃত্তিগুলিকেও সাধনার সহায়রূপে গ্রহণ ক'রে তন্ত্র মানুষকে ব্রহ্মজ্ঞানে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিল, আর তন্ত্রের সমন্বয়—সৃষ্টির ও শ্রেষ্ঠতার পরিচয় এখানে যে তন্ত্র অন্যান্য সাধনমার্গের ন্যায় মুক্তিকেই একমাত্র লক্ষ্য বলে গ্রহণ না করে মুক্তির সংগে ভক্তিকেও, সংসারে আনন্দকেও, জীবনে প্রতিষ্ঠাকেও সাধনার লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছে। অন্যান্য মার্গ বৈরাগ্যপন্থী, আনন্দের বিরোধী; সংসার অনিত্য, অতএব ত্যাজ্য —এই মতের সমর্থক; ফল-জাতীয় অবনতি। কিন্তু তন্ত্র মুক্তির সংগে ভুক্তির আদর্শ স্থাপন করে জাতীয় অবনতি রোধের চেষ্টা করেছিল। শ্রীঅরবিন্দ বলেন "দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছিলেন সেই শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি তান্ত্রিক বা তান্ত্রিকগুরুর শিষ্য ছিলেন।" (ধর্ম ও জাতীয়তা, ২৭শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

তান্ত্রিক সাধনার ফল সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার। ইতিপুর্বে এই পুস্তকে The Life Divine থেকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তাতে আমরা দেখেছি এদেশের তান্ত্রিক ও হঠযোগীগণ মানুষের সূক্ষ্মদেহ প্রভৃতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক রীতিতে আলোচনা করে অনেক তত্ত্বই আবিষ্কার করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন 'They (the Hathayogins and Tantriks) found out subtle physical exercises by which these centres (of the subtle body) now closed could be opened up, the higher psychical life proper to our subtle existence entered into by man' (The Life Divine, p. 239)। প্রাকৃত মানুষ তার স্থূল শরীরকেই জানে এবং স্থূল জগতেই বাস করে। সূক্ষ্ম শরীর স্থূল দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর; এবং মানুষ যদি তার সূক্ষ্ম দেহের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পারে তবে তার মনের শক্তির বিশেষ বৃদ্ধি হয়, মানুষকে আর দুর্বল প্রাকৃত মানুষের সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে থাকতে হয় না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন হঠযোগী ও তান্ত্রিকগণ এমন সব সাধনার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন যার ফলে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা সম্ভব হতো; ফলে মানুষের শক্তিও বহুগুণ বৃদ্ধি হতো। তাই শ্রীঅরবিন্দ এক স্থানে বলেছিলেন আমাদের বেদান্ত আর তন্ত্র তুচ্ছ জিনিষ নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ

শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও এদেশের প্রচলিত যোগসমূহ

শ্রীঅরবিন্দের যোগের আলোচনা করতে গেলে প্রথমে প্রশ্ন উঠবে যে শ্রীঅরবিন্দের যোগ কি একটি নূতন জিনিস? আর এদেশের প্রচলিত যোগসমূহের সঙ্গে তার মিলই বা কোথায় অমিলই বা কোথায়? শ্রীঅরবিন্দ নিজে এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা থেকেই এ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায়। Sri Aurobindo on Himself and on the Mother পুস্তকের ১৬৪ পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দের একখানা পত্র উদ্ধৃত হয়েছে। ঐ পত্রে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন: "I have never said that my yoga was something brand-new in all its elements. I have called it the Integral yoga; and that means that it takes up the essenee and many proecsses of the yogas. Its newness is in its aim, stand-point and the totality of its method." অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের যোগ নতুন হলেও একটি সর্বতোভাবে নতুন জিনিস নয়। তাঁর যোগের নাম তিনি দিয়েছেন Integral বা পূর্ণযোগ। এ নামটি থেকেই বোঝা যায় যে তাঁর যোগে প্রাচীন যোগসমূহের সারাংশ ও বহু পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। তবে তাঁর যোগের নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য এখানে যে তাঁর যোগের ও প্রাচীন যোগসমূহের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। আর একটি কারণেও শ্রীঅরবিন্দের যোগ নতুন—প্রাচীন যোগসমূহে ঝোঁক দেওয়া হতো জীবনের একটি বিশেষ দিকের উপর, যথা জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের উপর; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের যোগে জীবনের সকল দিকের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। তার প্রমাণ আমরা পাবো।

প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রীঅরবিন্দের মনোভাব

এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রীঅরবিন্দের মনোভাব কী ছিল তার উল্লেখ করলে শ্রীঅরবিন্দের যোগে যে নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় করা হয়েছে তা বোঝা যাবে। তিনি বলতেন কেবল প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরা ঠিক নয়। তিনি তাঁর Essays on the Gita পুস্তকের ৯ম পৃষ্ঠায় বলেছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত করেছে; আর আজিকার অবাধ যোগাযোগের সুযোগে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি ধর্মমত প্রভৃতি মানুষের

নিকট আর অজ্ঞাত নয়। আর ভারতের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রকৃত মর্ম আজ নতুন করে বোঝা গিয়েছে (তাঁর কথা 'a recovered sense of Buddhism')। তাই তাঁর মতে ভারতের প্রাচীন ঋষি মনীষীদের আবিষ্কৃত সত্যসমূহের সঙ্গে এইসব নব নব সত্যের সমন্বয় আজ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়েছে। তার ফল কী হবে তা তাঁর নিজের ভাষায়ই বলা যাক্ : We of the coming days stand at the head of a new age of development, which must lead to a new and larger synthesis·········we do not belong to the past dawns but to the noons of the future. অর্থাৎ আমাদের সম্মুখে এসেছে এক নতুন ও বৃহত্তর সমন্বয়ের যুগ। অতীত যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যদি উষার আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে আসন্ন যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বলতে হবে মধ্যাহ্নের দীপ্ত আলো। বস্তুত ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতিকে তিনি বলেছেন ভাবী কালের ভারতের উন্নততর সংস্কৃতির জন্যে প্রস্তুতি বা preparation বা অপরিহার্য গোড়া-পত্তন। স্মরণ রাখতে হবে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির মূল্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল অতি উচ্চ। স্বদেশী-যুগের তাঁর বক্তৃতাসমূহে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ সব বক্তৃতায় তিনি বার'বার একথা বলেছেন যে জগতের কল্যাণের জন্যে ভারতের ঋষিদের উপলব্ধ সত্যসমূহ অপরিহার্য; তাই সে সত্যসমূহ এত দীর্ঘকালেও লুপ্ত হয়নি; ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুসারেই তারা অব্যাহত রয়েছে—ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও মিষ্টিক শ্রীঅরবিন্দের এই ছিল অভিমত। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগে প্রাচীন যোগের অনেক কিছু কেন গ্রহণ করেছিলেন তার কারণ বোঝা গেল।

শ্রীঅরবিন্দের যোগে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়

জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মীর মধ্যে যে বিরোধ তার কথা পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দ কীভাবে সে বিরোধের সমন্বয় তাঁর যোগে করেছেন তা দেখতে হবে। তিনি বলেন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মধ্যে—Meditation, Adoration ও Service-এ তিনের মধ্যে—বস্তুত কোন বিরোধ নেই। জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম এই তিনের যে কোন একটি অবলম্বন করে যোগ পথে যাত্রা সুরু করলেই অপর দুটি লাভ হয়ে থাকে। গীতার কথা (৪।৩১) কর্মের পরিসমাপ্তি জ্ঞানে; আর ভক্তির দ্বারা ভগবানকে যথার্থভাবে জানা যায় (গীতা ১৮।৫৫)। প্রচলিত ধারণা জ্ঞানলাভের পর আর কর্ম থাকে না। কিন্তু গীতায় একথা স্বীকার করা হয়নি, শ্রীঅরবিন্দও স্বীকার করেন না। তার কথা : The Integra Yoga

cannot reject the works of life and be satisfied with an inward experience only অর্থাৎ কেবল উপলব্ধি বা জ্ঞান নিয়ে পূর্ণযোগী সন্তুষ্ট থাকেন না। (Synthesis of Yoga, p. 198) পূর্ণ জ্ঞানীও কর্ম করেন ; এবং সে কর্ম হয়ে উঠে দিব্য কর্ম। দিব্যকর্ম কী তা আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন ও দিব্য কর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখবো। আবার শ্রীঅরবিন্দ বলেন ভক্তি (adoration) ও কর্ম (service) এ দুয়ের মধ্যেও কোন বিরোধ থাকতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দ জগৎকে মিথ্যা বলেন না, বলেন ভগবানের লীলা। তাই সৃষ্টিরক্ষা ভগবানের কাম্য ও প্রিয় কর্ম। শ্রীঅরবিন্দ বলেন প্রকৃত ভক্তি কর্মের প্রেরণাই যোগায়, কর্ম থেকে বিমুখ করে না—ভক্ত সৃষ্টিরক্ষা ভগবানের প্রিয় কর্ম বলে কর্ম করে থাকেন। বিনোবাভাবে মশাই তাঁর গীতার ব্যাখ্যা-পুস্তক "গীতা-প্রবচন"-এ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মকে একটি তেপায়ার তিনটি পায়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন ; বলেছেন যে তেপায়ার কোন একটি পায়ার অভাব হলেই তেপায়া দাঁড়াতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দও বলেন সাধনার ক্ষেত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের যোগে এই তিনের সমন্বয় করা হয়েছে ; তাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম Integral Yoga বা পূর্ণযোগ সার্থক। শ্রীঅরবিন্দের যোগ সঙ্কীর্ণ বা একদেশদর্শী নয়। •

শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম পূর্ণযোগ অন্য কারণেও সার্থক। মন, প্রাণ ও দেহ নিয়ে মানুষ। কেবল মনের, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির ও হৃদয়ের প্রীতি-ভক্তির উৎকর্ষ-সাধনই শ্রীঅরবিন্দের যোগের লক্ষ্য নয়। মানুষের প্রাণ ও দেহেরও যথোচিত উন্নতি-সাধন শ্রীঅরবিন্দের মতে প্রয়োজন। প্রাণ হলো আমাদের সকল শক্তির উৎস—ইচ্ছাশক্তি কর্মশক্তি প্রভৃতির যথোচিত বিকাশ হওয়া দরকার ; এবং যোগীর শক্তির অসাধারণ বিকাশ হয়ে থাকে। আর দেহের দিব্য পরিবর্তন যোগের আনুষঙ্গিক ফল, শ্রীঅরবিন্দ একথা বলে থাকেন। আমরা দিব্য পরিবর্তন প্রসঙ্গে সে কথার আলোচনা করবো। এইরূপে মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ—মন, প্রাণ ও দেহের বিকাশ শ্রীঅরবিন্দের যোগের লক্ষ্য ; তাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম পূর্ণযোগ।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ-পন্থা সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসের পন্থা নয়

শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনাদর্শ আগেকার বহু যোগীর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনাদর্শ থেকে ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ অদ্বৈত জ্ঞানযোগীদের কথা ধরা যাক্। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর প্রভৃতির নিকট জগৎ ছিল মিথ্যা ; তাই তাঁরা ছিলেন

সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী। তাঁর The Life Divine গ্রন্থে তিনি এর নাম দিয়েছেন The Refusal of the Ascetic, a yoga of world-shunning asceticism—সংসার ছেড়ে পর্বতগুহায় আশ্রয়-গ্রহণ শ্রীঅরবিন্দ সমর্থন করেন না। বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা তাঁর পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "দেহকে শব দেখা সন্ন্যাসের নির্বাণ পথের লক্ষণ। এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না। সর্ব বস্তুতে আনন্দ চাই—যেমন আত্মায় তেমনি দেহে। দেহ চৈতন্যময়; দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা আছে তাতে ভগবানকে দেখলে 'সর্বমিদং ব্রহ্ম'—'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' এই দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। শরীরেও সেই আনন্দের মূর্ত তরঙ্গ ছোটে। এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার বিবাহ সবই করা যায়।" 'Man is born to be happy' এবং জগৎ আনন্দময়ের লীলা, 'The ecstatic dance of Shiva' এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। এখানে তাঁর মত তন্ত্রের ভুক্তি-মুক্তির আদর্শের অনুরূপ। তাঁর মতে অধ্যাত্মে (অর্থাৎ ধর্মে) ও জীবনে কোন বিরোধ নেই।

তা বলে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ নিছক ইহকাল সর্বস্বও নয়। ইহকাল-সর্বস্বতা তাঁর মতে হলো The Materialist Denial. তাঁর কথা: All human greatness and fame and achievement are nothing before the greatness of the Infinte and the Eternal. অর্থাৎ অনন্ত ও শাশ্বত যা তার তুলনায় পার্থিব জীবনের যশ ও সফলতার মূল্য তুচ্ছ। মোটকথা শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী নিছক পরকাল-সর্বস্ব বা নিছক ইহকাল সর্বস্ব নয়। যদি হতো তবে তাঁকে সমন্বয়ের ঋষি বলা যেতো না।…… ..সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় তিনি জীবনকে অস্বীকার করেন না; আবার জড়বাদীর ন্যায় তিনি আত্মাকে অস্বীকার করেন না এবং ইহকাল-সর্বস্বও নন। জীবন ও অধ্যাত্ম উভয়ের দাবীই তাঁর যোগে স্বীকৃতি পেয়েছে। এদিক থেকেও তাঁর যোগ integral বা পূর্ণ।

অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত

আমাদের দেশের কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ একমত নন দেখা গেল। এখানে অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত একটু স্পষ্ট করে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। প্রাচীন যোগীদের অনেকের উপদেশ—অর্থং অনর্থং ভাবয় নিত্যং। অনেকে তো টাকা-পয়সা স্পর্শ করতেন না। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা "শীল" পালনে নিষ্ঠাবান তাঁদের অনেকে সোনা-রূপা

ছোঁন না। (তবে দেখা যায় তাঁদের কেউ কেউ কাগজের টাকা অর্থাৎ নোট ছুঁতে অরাজী নন !) কেবল এদেশের নয় পাশ্চাত্য জগতেও এরূপ অদ্ভুত আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। টলষ্টয়ের জীবনীতে তাঁর এক ধনী বন্ধুর কথা দেখা যায়। তিনি কখনও টাকা ছুঁতেন না। কোথাও যেতে হলে তাঁর সেক্রেটারী তাঁর টিকিট কিনে দিতেন ! অর্থ সম্বন্ধে এরূপ নানা রকম অদ্ভুত ও অযৌক্তিক আচরণের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। শ্রীঅরবিন্দ অর্থ সম্বন্ধে কী মত পোষণ করতেন তা নিশ্চয়ই জানবার বিষয়। অর্থ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত পাওয়া যায় তাঁর The Mother নামক পুস্তিকার চতুর্থ অধ্যায়ে। সেখানে তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম এই : অর্থ একটা শক্তি এবং মায়ের কাজে অর্থাৎ ভগবানের কাজে তা প্রয়োগ করতে হবে। সাধকের কাছে অর্থ হেয়ও হবে না, প্রেয়ও হবে না। অর্থ যদি আসে তবে সাধকের মনে যেন উল্লাস না হয় ; আর অর্থ যদি না আসে, যদি অর্থ-কষ্ট দেখা দেয়, তখনও সাধকের মনে যেন কোন ক্ষোভ না জন্মে ! অর্থের অনটন ও প্রাচুর্য দুই-ই সাধক সমচিত্তে গ্রহণ করবেন। নিজের জীবনেও শ্রীঅরবিন্দ এ নীতিরই অনুসরণ করতেন।

দেখা গেল অনেক বিষয়েই শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী আর প্রাচীন ভারতীয় যোগীদের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। এখানে শ্রীঅরবিন্দের যোগের নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্য। তাঁর যোগের লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে দিব্য জীবন প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। এখানে তাঁর যোগের অপর দুটি সংশ্লিষ্ট অঙ্গের আলোচনা দরকার। অঙ্গদুটির একটি হলো শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগপথের বাধা ; অপরটি যোগপথের সহায়।

যোগপথের বাধা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ

সাধন-পথে দুটি প্রধান বাধা ; তার একটি হলো সাধকের অহংবুদ্ধি (Egoism), অপরটি সাধকের অন্তরের স্ব-বিরোধ—Self-conflict। আমি সকলের থেকে পৃথক, এবং আমার স্বার্থ অপরের স্বার্থ থেকে ভিন্ন—এরই নাম অহংবুদ্ধি। অহংবুদ্ধির ফল সংসারাসক্তি। গীতায় বলা হয়েছে জ্ঞান-অসি দ্বারা এই দৃঢ়মূল আসক্তি ছিন্ন করতে হয়। আর গীতার ভাষায় সাত্ত্বিক জ্ঞানের সংজ্ঞা—তাই জ্ঞান যা দ্বারা মানুষ সর্বভূতে এক অবিনাশী পদার্থকে দেখে। তাই শ্রীঅরবিন্দের কথা সাধককে অহংবুদ্ধির উর্ধ্বে উঠতে হবে, জানতে হবে 'He is one with all'.

সাধকের অন্তরের স্ববিরোধ বাধাটি কী তা বুঝতে হলে স্মরণ রাখতে হবে

মানব প্রকৃতি জটিল; এবং যতদিন সাধকের জীবনের বিভিন্ন বিভাগ—দেহ প্রাণ মন একাভিমুখী না হয় ততদিন সাধকের জীবনে স্ববিরোধের অবসান হয় না। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলেছেন। তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন এভাবে—সাধকের মন হয়তো একটি নতুন আদর্শকে গ্রহণ করে নতুন ভাবে চলতে উন্মুখ হয়েছে, কিন্তু তার দেহ প্রাণ অশুদ্ধই রয়ে গেছে (unregenerate রয়েছে) অর্থাৎ নবভাবে উদ্বুদ্ধ হয়নি। ফল তার মন যে পথে চলতে চায় তার অশুদ্ধ দেহ প্রাণ তাতে বাধা দেয়। (চতুর্থ অধ্যায়ে দিব্যরূপান্তর প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরো আলোচনা করা হয়েছে।) সাধন পথে অগ্রসর হতে হলে এ দুটি বাধাকে অতিক্রম করা দরকার। তাই এ দুটি বাধাকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Synthesis of Yoga গ্রন্থে সাধন-পথের দুটি 'curses' (অভিশাপ) বলেছেন।

যোগপথের সহায় সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ

যোগপথের সাধককে কয়েকটি, বিশেষভাবে চারটি বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে। প্রথমত তিনি স্মরণ রাখবেন যোগে সফলতার জন্যে সাধকের উৎসাহ, আস্পৃহা একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত সাধকের সফলতা নির্ভর করে ভগবানের কৃপার উপর। তৃতীয়ত যোগপথে গুরুর নির্দেশ ব্যতীত অগ্রসর হওয়া যায় না। চতুর্থত উপযুক্ত কালে সফলতা আসবে, সেজন্যে সাধকের ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে হবে, অধীর হলে চলবে না।

(ক) সাধকের উৎসাহ

সাধকের উৎসাহ আস্পৃহা ব্যতীত যোগপথে সফলতা যে সম্ভব নয় একথা বলাই বাহুল্য। সাধকের এই উৎসাহের প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া যায় ভগবানের নিকট সাধকের আত্মসমর্পণে। সাধকের আস্পৃহা উৎসাহ যত বেশী, ভগবানে আত্মসর্পণের জন্যে তাঁর চেষ্টাও তত প্রবল হয়ে থাকে। বস্তুত আত্মসমর্পণ শ্রীঅরবিন্দের যোগের মূল সূত্র—তাঁর যোগের আদিতেও আত্মসমর্পণ, অন্তেও আত্মসমর্পণ। তাই শ্রীঅরবিন্দের যোগের নাম আত্মসমর্পণ যোগ দেওয়া চলে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন অন্য যোগ পন্থায় আত্মসমর্পণ হলো সাধনার শেষ ধাপ—জীবনব্যাপী সাধনার ফলে সাধক ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করতে সক্ষম হন; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের যোগে প্রথম থেকেই আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে সাধন-পথে চলবার অভ্যাস করতে হবে। আত্মসমর্পণ আর ফলাশা ত্যাগ করে সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া একই কথা। শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তিগত জীবনও এই

রীতিতে পরিচালিত হতো। তার বহু দৃষ্টান্ত আমরা তাঁর জীবন-কথা প্রসঙ্গে পাই। এখানে আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের মাসতুতো ভাই স্নকুমার বাবু ১৩৫৯ সনে মাসিক বসুমতী পত্রিকায় "শ্রীঅরবিন্দ, এ্যাক্রয়েড ঘোষ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ঐ প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখেছিলেন: "আমাদের বাড়িতে এক বৃদ্ধ আসিলে শ্রীঅরবিন্দ তাহাকে বলেছিলেন, 'সমস্তই ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া দেখ তিনি কি করেন।' প্রত্যক্ষভাবে দেখিলাম অরবিন্দ সমস্ত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।" ভগবানের হাতে সব ছেড়ে দাও তারপর 'wait and see'—এই হলো আত্মসমর্পণ।

(খ) ভগবানের কৃপা

একটি মাত্র পাখার সাহায্যে পাখী উড়তে পারে না; উড়তে হলে দুটি পাখার প্রয়োজন হয়। তেমনি সাধন পথে একমাত্র স্বচেষ্টাই সফলতার মূল নয়; স্বচেষ্টার সঙ্গে ভগবৎকৃপাও চাই। একথাটাই আমাদের শাস্ত্রে পুরুষকার ও দৈব নামে বর্ণিত হয়েছে। "আয় মা, সাধন-সমরে, ছেলে হারে কি মায়ে হারে"—এভাবের গান আমাদের দেশে কোন সাধকের মুখে শোনা গেছে। কিন্তু শুনতে ভাল লাগলেও এ-গানে ঠিক পথের নির্দেশ দেওয়া হয়নি, কেননা এখানে অহংবুদ্ধির আতিশয্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দের সাধন-মার্গে অহংবুদ্ধির সমূলে বিনাশই লক্ষ্য। তাই তিনি বলেন সাধকের স্বচেষ্টা সফলতার জন্য যে আবশ্যক তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু সাধককে স্মরণ রাখতে হবে যে ভগবানের কৃপা ব্যতীত শুধু স্বচেষ্টার দ্বারা যোগ-পথে সফলতা লাভ হয় না। (চতুর্থ অধ্যায় আবার আমাদের এ প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হবে।)

(গ) উপযুক্ত গুরু কে

সাধনপথে গুরুর সাহায্য প্রয়োজন। অজানা পথে চলতে গেলে পথিকের মাঝে মাঝে পথ নির্দেশের প্রয়োজন হয়ই; এবং যে পথের সঙ্গে পরিচিত একমাত্র সে-ই পথ নির্দেশ করতে পারে। গুরু হতে পারেন তিনি, যিনি নিজে সাধনপথে অগ্রসর বলে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে অনভিজ্ঞ সাধককে ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। গুরুর প্রয়োজন বলতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ যে এদেশের কুলগুরু-প্রথা সমর্থন করেননি তা বলাই বাহুল্য। বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা উপরোক্ত পত্রে (৩৭ পৃষ্ঠায়) শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "প্রচলিত গুরুগিরির উপর আমার আস্থা নাই।" তবে সত্য গুরু কে হবেন? যিনি

নিজে সাধনপথে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন এবং নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতা থেকে, নিজ জীবনের নৈতিক প্রভাব দ্বারা শিষ্যকে ঠিক পথ দেখাতে পারেন তিনিই গুরু হবার যোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ একথাও বলেন তিনিই সত্য গুরু, যাঁর শিক্ষায় শিষ্য কালক্রমে গুরুর সাহায্য ব্যতীতই সাধনপথে চলতে সক্ষম হন; অর্থাৎ শিষ্যের জীবনে গুরু আর অত্যাবশ্যক থাকেন না। আমরা জানি এক সময় শ্রীঅরবিন্দের জীবনেও গুরুর প্রয়োজন হয়েছিল, এবং লেলে মহারাজের কাছে তিনি কিছু সাহায্যও যে পেয়েছিলেন, সে ঋণ তিনি মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। (কিন্তু তাঁর কথা সত্য, গুরু হলেন সাধকের হৃদিস্থিত হৃষিকেশ অন্তর্যামী—যিনি অন্তরে থেকে সাধককে চালিয়ে থাকেন।) শ্রীঅরবিন্দ গীতার দশম অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকের প্রতিধ্বনি করে বলেছেন "It is he who destroys our darkness by the resplendent light of his knowledge." (Synthesis of Yoga, p. 68)। শ্রীঅরবিন্দের সাধনাও তাঁর অন্তর্যামী গুরুর নির্দেশেই পরিচালিত হয়েছিল।

(ঘ) যথাকাল ব্যতীত সাধনায় সফলতা হয় না

সাধনায় সফলতা যে উপযুক্ত কাল-সাপেক্ষ, একথা শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস করতেন। সাধকের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের উপদেশ সাধককে ধৈর্য ধরে সাধন-পথে চলতে হবে এবং উপযুক্ত কালের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে। সফলতার জন্যে অতিরিক্ত ব্যস্ত হওয়া, কিংবা সফলতা এলো না বলে নিরাশ হওয়া ঠিক নয়; যথাকালে সফলতা আসবেই, সাধকের এরূপ আস্থা থাকা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা চিঠিতে তিনি যা লিখেছিলেন তা থেকেই তাঁর উপদেশের মর্ম অনুধাবন করা সম্ভব হবে। তিনি লিখেছিলেন: "আমি কর্মসিদ্ধির জন্য অধীর নই। যা হবার ভগবানের নির্দিষ্ট সময়ে হবে; উন্মত্তের মত ছুটে ক্ষুদ্র অহংয়ের শক্তিতে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবৃত্তি নেই। যদি কর্ম-সিদ্ধি না-ও হয়, আমি ধৈর্যচ্যুত হব না। একর্ম আমার নয় ভগবানের।" সাধনপথে এই মনোভাবই হলো যথার্থ মনোভাব।

শ্রীঅরবিন্দের যোগ অসাম্প্রদায়িক

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগ প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন উঠবে—শ্রীঅরবিন্দের যোগপথে চলতে হলে কোন বিশেষ ধর্মমত গ্রহণ করতে হবে? শ্রীঅরবিন্দ বলেন তিনি কোন নতুন ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা নন। তাঁর যোগপথ গ্রহণ করতে হলে বিশেষ কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমতে বিশ্বাস রাখা আবশ্যক নয়।

তাঁর এক কৃষ্ণভক্ত শিষ্যকে তিনি বলেছিলেন তাঁর কৃষ্ণভক্তি আশ্রমে অবস্থানের ও পূর্ণযোগ অনুসরণে প্রতিবন্ধক হবে না। এমন কি যার ঈশ্বরে বিশেষ কোন বিশ্বাস নেই তার পক্ষেও শ্রীঅরবিন্দের যোগ গ্রহণ অসম্ভব নয়। তবে সাধকের এতটুকু শ্রদ্ধা থাকা চাই যে মানবের পক্ষে দেবমানব হয়ে ওঠা সম্ভব। আর মানবের দেবমানব হওয়ার অর্থ মানব মনের 'transformation' বা 'radical change' বা আমূল পরিবর্তন। দেবমানব হতে হলে যে সাধনপথ নির্দেশ করা হয়েছে সে পথে চলতে যিনি রাজী, তিনি শ্রদ্ধাবান হলেই শ্রীঅরবিন্দের যোগ গ্রহণ করবার যোগ্য। তাই দেখা যায় শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে হিন্দু অহিন্দু সকল সম্প্রদায়ের লোকই আছেন; এখানে স্বভাবতই স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতার একটা কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন তিনি যে ধর্ম-জীবনের কথা ও বিশ্বের ভাবী ধর্মের কথা বলেছেন তা গ্রহণ করতে হলে মুসলমান বা খ্রীষ্টান বা হিন্দু কাউকেই নিজের ধর্মসম্প্রদায় ত্যাগ করতে হবে না। ত্যাগ করতে হবে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি। সমন্বয়ের ঋষি শ্রীঅরবিন্দও যে এই উদার মতেরই সমর্থক হবেন তা তো সহজেই বোঝা যায়। তাঁর যোগের লক্ষ্য দিব্যজীবন লাভ, পরের অধ্যায়ে তা-ই হবে আমাদের আলোচ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দিব্যজীবন

শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ সম্পূর্ণ নূতন নয়

এই পরিচ্ছেদে আমাদের আলোচ্য শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ। গোড়াতে এই প্রশ্ন উঠবে যে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ কি এমন একটা জিনিস যার স্বপ্ন শ্রীঅরবিন্দের পূর্বে কেউ কখন দেখেননি? এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা এই যে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা যুগে যুগে এই স্বপ্ন দেখে এসেছেন। The Life Divine গ্রন্থের ৪৩৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন: It is a keen sense of this possibility which has taken different shapes and persisted through the centuries—the perfectibility of man, the perfectibility of Society, the Alevar's vision of the descent of Vishnu and the Gods upon earth, the reign of the saints (সাধুনাম্ রাজ্যম্) the city of God, the millenium etc."। আমাদের দেশের দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার নামক বিষ্ণুভক্তির পথ-প্রবর্তক আদি সন্তগণ পৃথিবীতে বিষ্ণুর ও দেবগণের অবতরণের কথা বলেছেন; মানুষ ও মানব সমাজ একদিন সকল অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠবে, অনেকের এ বিশ্বাস আছে। পৃথিবীতে সাধুগণের রাজ্য—রাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা একদিন হবে এটাও অনেকের বিশ্বাস। মধ্যযুগের খৃষ্টানগণের বিশ্বাস ছিল যে মৃত্যুর সহস্র বর্ষপরে খৃষ্ট পৃথিবীতে আবার স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। এ সবই বস্তুত মানুষের দিব্যজীবন লাভেরই স্বপ্ন। তাই একথা বলা চলে না যে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ একটা অভূতপূর্ব আজগবী ব্যাপার। তবে একথা ঠিক যে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ আর উপরোক্ত আদর্শও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ঠিক এক নয়। দিব্যজীবন বলতে শ্রীঅরবিন্দ কী বুঝতেন আমরা তা বোঝবার চেষ্টা করবো।

ইতিপূর্বে এই পুস্তকে নানা প্রসঙ্গে দিব্যজীবন কথাটি উল্লেখ করতে হয়েছে। যথা সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে দিব্যজীবন বা মানবের দেবজন্ম-

লাভই হলো সৃষ্টির লক্ষ্য; এবং মানবের দিব্যজীবনলাভ না হওয়া পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারার পরিসমাপ্তি হবে না। শ্রীঅরবিন্দের যোগ প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি ব্যক্তিগত জীবনে দিব্যজীবনলাভের জন্যই তাঁর যোগ-সাধনা। তবে তাঁর যোগের লক্ষ্য যে কেবল এ নয়, তাও আমরা দেখেছি। পৃথিবীতে, এই পৃথিবীতেই, দেবমানব-সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করার জন্যই যে তাঁর যোগ-সাধনা, এও আমরা দেখেছি, এবং এই যে তাঁর যোগের বৈশিষ্ট্য সে কথাও বলা হয়েছে। অতিমানসতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি মানবমনের স্বভাবিক অহংবুদ্ধি ও ভেদ-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ মানস-স্তর থেকে অতিমানস-বিজ্ঞানের স্তরে উঠলে চরম সত্য ব্রহ্মকে জানা যায়; এবং ব্রহ্মকে জানা ও ব্রহ্ম হওয়া একই কথা। দিব্যজীবনের অর্থও তা-ই।

গোড়াতেই বলা হয়েছে যে কোন সুস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষেই কেবল খেয়ে-পরে এবং আত্মসুখের সন্ধানে ছুটে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব নয়। জীবনের লক্ষ্য কী, কিসে জীবনের সার্থকতা প্রভৃতি প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে উদয় হয়, এবং একটা সার্থক মানবতার আদর্শ তাকে অনুসরণ করতে হয়। এই আদর্শ আবার প্রত্যেক মানুষের "শ্রদ্ধা" অনুসারে বিভিন্ন হয়ে থাকে—নাস্তিক আর আস্তিকের আদর্শ ভিন্ন না হয়ে পারে না; কিংবা একজন mystic ও একজন intellectual (অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির চরম উৎকর্ষই যাঁর নিকট মুখ্য, এবং সত্যকে জানবার উপায় হিসাবে বিচার-বুদ্ধির উপরই যিনি একান্ত নির্ভরশীল) এ দুয়ের জীবনের সার্থকতার আদর্শ যে এক হতে পারে না, তা সহজেই অনুমেয়। প্রচলিত বিভিন্ন জীবনাদর্শের ও শ্রীঅরবিন্দের জীবনাদর্শের মধ্যে পার্থক্য কী তার একটু বিচার করলে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে একটা ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

দুই শ্রেণীর জীবনাদর্শ

প্রচলিত জীবনাদর্শগুলি শ্রীঅরবিন্দ দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যাঁরা ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না, কিংবা ঐসব তত্ত্ব নিয়ে কোনপ্রকার আলোচনা করতে যাঁরা নারাজ, তাঁদের জীবনাদর্শের নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন 'The ideal of mundane development' বা ঐহিক উন্নতির আদর্শ, আর যাঁরা আস্তিক তাঁদের আদর্শকে শ্রীঅরবিন্দ 'The ideal of religious conversion' বা ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত প্রকৃতি-পরিবর্তনের আদর্শ এই আখ্যা দিয়েছেন। এই দুই আদর্শের পার্থক্য বোঝা দরকার।

(ক) ঐহিক উন্নতির আদর্শ

প্রথমোক্ত আদর্শ অনুসারে মানুষ হলো দেহ-প্রাণ-মন-বিশিষ্ট এক জীব। অবশ্য এই শ্রেণীর আদর্শবাদীদের সকলের আদর্শ যে এক তা নয়। তাদের মধ্যে একদল যে আদর্শে বিশ্বাস করেন তার নাম 'The religion of humanity'। এই আদর্শটি আজকাল অনেকের নিকট সমাদৃত, এবং তার কথা আমাদের পরে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ম প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হবে। ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস করেন না বলে এঁরা মনে করেন পরকালের দিকে না তাকিয়ে ইহকালেই দেহ-প্রাণ-মনের যথাসম্ভব বিকাশেই জীবনের সার্থকতা। কেবল নিজের নয় সকলের—সমাজের, দেশের এবং সম্ভব হলে সর্বমানবের—উন্নতি-সাধনই এঁদের কাম্য। আর উন্নতি কথাটিও এঁরা অতি বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করে থাকেন—মানবের সর্ববিধ উন্নতিই এঁদের কাম্য। যথা মনের উন্নতিসাধন বলতে এঁরা কেবল জ্ঞানের প্রসার বোঝেন না, মানুষের মনের সকল বৃত্তিরই অনুশীলন বোঝেন। আমাদের দেশে আধুনিক যুগে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অনুশীলন বা ধর্মতত্ত্বে এই আদর্শের ব্যাখ্যা করেছিলেন; তবে এঁদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তফাৎ এইখানে যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী, এবং ভক্তিবৃত্তির অনুশীলের কথাও তিনি বলেছেন; কিন্তু এঁদের ঐহিক উন্নতির আদর্শে ভক্তিবৃত্তি-চর্চার কোন স্থান নেই। এঁদের মতে মানুষের চিত্তবৃত্তি বিবিধ; তাই সকল বৃত্তিরই চর্চা প্রয়োজন। যথা কেবল মানুষের জ্ঞান-স্পৃহার নয়, তার সৌন্দর্য-তৃষ্ণারও চরিতার্থতা প্রয়োজন; মানুষের দয়া মায়া প্রভৃতি হৃদয়াবৃত্তির দাবীও মেটানো প্রয়োজন—সমাজের ও দেশের ও সবজগতের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ-বিসর্জন এঁরা কর্তব্য মনে করেন। মানুষ স্রষ্টা, তাই আর সৃজনী-শক্তির বিকাশের সুযোগ দেওয়া অবশ্য-কর্তব্য। দেহের স্বাস্থ্য ও দৈহিক উন্নতি এঁদের মতে অবহেলার জিনিস নয়। সংক্ষেপে এই ঐহিক উন্নতির আদর্শকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 'the perfection of the inner individual and the perfection of the outer living' (Synthesis of Yoga, p. 704) অর্থাৎ মানুষের অন্তরের বৃত্তিসমূহের পূর্ণ বিকাশ আর বাইরের জীবনের চরম উন্নতি। তিনি ঐ পুস্তকে (৭০৫ পৃষ্ঠা) আরো বলেন এই 'intellectual, volitional, ethical, emotional, aesthetic and physical training are all so much to the good', অর্থাৎ এই বিবিধ বৃত্তির অনুশীলন শ্রীঅরবিন্দের মতে সকলই কল্যাণকর। কিন্তু তাঁর মতে

শেষ পর্যন্ত এ উপায়ে জীবনের চরম সার্থকতা হয় না। তিনি বলেন এ আদর্শ 'full and wide', কিন্তু 'sufficiently full and wide' নয়। আমরা দেখেছি তাঁর যোগ 'world-shunning' নয়; তাই তিনি উপরোক্ত গুণ সমূহের অর্জনেরই পক্ষপাতী, বর্জনের নয়। কিন্তু তাঁর পুর্ণ মানবতার আদর্শ মানবের সকল বৃত্তির অনুশীলন এবং ঐহিক উন্নতির আদর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আর এই ঐহিক উন্নতির আদর্শ যে অসম্পূর্ণ, তার কারণ এ আদর্শের গোড়ায় গলদ রয়েছে; মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা—মানুষ তো কেবল দেহ-প্রাণ-মন নয়, মানুষ আবার spirit বা আত্মাও। তাই এই আদর্শে দেহ-প্রাণ-মনের বাইরের কোন জিনিসকেই আমল দেওয়া হয় না বলে এ আদর্শে আত্মার অগ্রগতির কোন অবকাশ নেই। তাই এ আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের মনঃপূত নয়।

(খ) ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত স্বভাব-পরিবর্তনের আদর্শও অসম্পূর্ণ

দ্বিতীয় আদর্শও, অর্থাৎ ধর্মবুদ্ধি-প্রণোদিত স্বভাব-পরিবর্তনের আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের মতে অসম্পূর্ণ। অবশ্য এ আদর্শের সঙ্গে অনেক বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ একমত; কারণ এ আদর্শে মানুষকে কেবল দেহ-প্রাণ-মন-বিশিষ্ট জীব বলে গণ্য করা হয় না, এবং ঈশ্বর আত্মা পরকাল প্রভৃতিও স্বীকার করা হয়। তবে এ আদর্শে এমন কতকগুলি বিষয় স্বীকৃত হয় যা শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেন না; যথা, এ আদর্শবাদীদের অনেকের বিশ্বাস মানুষ স্বভাবতই পাপ-প্রবণ, এবং ভগবানের কৃপায়ই হউক বা শাস্ত্রবিধির অনুসরণ দ্বারাই হউক স্বভাবপাপী মানুষকে নতুন মানুষ, নিষ্পাপ মানুষ হয়ে উঠতে হবে। শ্রীঅরবিন্দও মনে করেন দিব্যজীবনলাভের প্রথম সোপান মানুষের প্রাকৃত স্বভাবের পরিবর্তন। কঠোপনিষদের কথা দুশ্চরিত থেকে বিরত না হলে শ্রেয়লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে জীব ঈশ্বরের সনাতন অংশ; মানুষের মন অজ্ঞানাচ্ছন্ন সত্য, কিন্তু নিজেকে পাপী বলে অবসাদগ্রস্ত হওয়া তাঁর মতে নিতান্ত ভুল। বিশেষত এই আদর্শবাদীদের সংগে তাঁর প্রধান বিরোধ এই যে তিনি তাঁদের মতন একথা মানেন না যে ইহকালে নয় পরকালেই কেবল, মানবজীবনের সার্থকতার স্বপ্ন সফল হবে; তাঁর মতে এ পৃথিবীতেই মানব একদিন দেবমানব হয়ে উঠবে। (The Life Divine, p. 937) এবং এই আদর্শের অসম্পূর্ণতা দেখাতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেন এই আদর্শের প্রধান ত্রুটি এই যে "the inner change of the whole being" যা হলো দিব্যজীবনের লক্ষণ তার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। তিনি আরো বলেন এই দ্বিতীয় আদর্শের

লক্ষ্য হলো "a credal adherence, a formal acceptance of its ethical standards and a conformity to institution, ceremony and ritual—অর্থাৎ এই আদর্শের অনুসরণকারীরা বিশেষ একটা ধর্মমতে বিশ্বাস করা দরকার মনে করেন, এবং নীতি-বিধি, প্রচলিত ব্যবস্থাদি ও প্রচলিত অনুষ্ঠানাদি মেনে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু এ আদর্শ শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-মানবতার আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। তবে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-মানবতার বা Integral perfection-এর আদর্শ কী ?

শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-মানবতার আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পূর্ণ-মানবতার লক্ষ্য প্রভাবে ব্যক্ত করেছেন : "A divine perfection of the human being is our aim." (Synthesis of Yoga, p. 703)। এ কথাটাই আরো একটু বিস্তৃত করে ঐ পুস্তকের ৭০৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন : "a living of man in the Divine and a divine living of the spirit in humanity." এই বাক্য দুটির মর্ম বুঝলে শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ-মানবতার লক্ষ্য কী, এবং উপরোক্ত আদর্শ দুটির সঙ্গে তাঁর আদর্শের পার্থক্য কোথায় তা-ও বোঝা যাবে। উদ্ধৃত প্রথম বাক্যটি থেকে জানা যায় যে মানবজীবনের লক্ষ্য হলো ভাগবৎ জীবন বা দিব্যজীবনের পূর্ণতালাভ, কেবল মানব-দেহ-প্রাণ ও মনের উন্নতি নয়। এ আদর্শের অনুরূপ আদর্শ পাওয়া যায় খৃষ্টান শাস্ত্রের উক্তিতে, "Be ye holy and perfect even as your Father in heaven is holy and perfect" ; এবং আমাদের শাস্ত্রেরও এই বচনে : "বিষ্ণু ভূত্বা বিষ্ণুং যজেৎ।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর উপরোক্ত দ্বিতীয় বাক্যটিতে মর্ত্য জীবন ও ভাগবৎ জীবনের সম্পর্ক দেখিয়েছেন —মানুষকে যেমন ভাগবৎ জীবন লাভ করতে হবে তেমনি এ মর্ত্য জীবনেই ভাগবৎ জীবন বিকশিত করে তুলতে হবে। দেখা গেল উপরোক্ত Mundane development-এর আদর্শও Religious conversion-এর আদর্শ—এই উভয় আদর্শ থেকেই শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ ভিন্ন।

দিব্যজীবন লাভের জন্য প্রয়োজনীয় গুণসমূহ

মানবজীবনের এই পূর্ণতার আদর্শে পৌছাতে হলে কী প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথা : "We must know then, first, what are the essential elements that constitute man's total perfection ; secondly, what we mean by a divine as distinguished from a

human perfection." (Synthesis of Yoga, p. 703). অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে প্রথম জানা দরকার পূর্ণজীবন লাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় গুণগুলি কী ; দ্বিতীয়ত পূর্ণজীবনের মানবীয় ও দিব্য আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Synthesis of Yoga গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। নিম্নে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা গেল।

প্রথমত দিব্যজীবন লাভের পক্ষে সমতা, শক্তি, বীর্য ও শ্রদ্ধা এই গুণ চারটি একান্ত আবশ্যক। সমতার মূলে থাকে এ ধারণা যে সর্বভূতে রয়েছেন একই ঈশ্বর। তাই, গীতার ভাষায়, বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে যেমন, তেমনি তথাকথিত অস্পৃশ্য ব্যক্তিতে, এমনকি ইতর প্রাণীতেও সমদৃষ্টি প্রয়োজন—অর্থাৎ সকলের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান এ বিশ্বাস অটুট রাখা প্রয়োজন। সমতার অপর লক্ষণ সুখ-দুঃখ, মান-অপমান প্রভৃতি সকল অবস্থায় অবিচলিত থাকা। সমত্ববান ও যোগমুক্ত গীতার মতে একার্থক। তারপর দিব্যজীবনে দেহ-প্রাণ-মনের শক্তির চরম বিকাশ হয়ে থাকে। আবার বীর্যবান ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে আত্মা লভ্য নয়—মুণ্ডক উপনিষদের কথা (৩-২-৪) "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" আর শ্রদ্ধাও একান্ত আবশ্যক; ছান্দোগ্য উপনিষদে আরুণি ঋষির নিজ পুত্র শ্বেতকেতুর প্রতি উপদেশ (৬-১২-২): "শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি"—শ্রদ্ধার সঙ্গে চরমতত্ত্বের আলোচনা করতে হয়, শ্রদ্ধা ব্যতীত চরম জ্ঞান লাভ হয় না, এ-ই হলো ঋষির বক্তব্য। শ্রদ্ধার অপর একটি অর্থ বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস -না, আস্থা। বেদান্ত ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। শ্রীঅরবিন্দও বলেন সাধনার আরম্ভ শ্রদ্ধায়; যার ঈশ্বরে ও আত্মায় বিশ্বাস নেই তার পক্ষে দিব্যজীবনের সাধনা সম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় কোন সম্প্রদায়ের অনুমোদিত ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণায় বিশ্বাস আবশ্যক নয়; কোন বিশেষ ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলেও চলে, থাকলেও কোন ক্ষতি নেই; কিন্তু দিব্যজীবনের সম্ভাবনায়, আত্মার অগ্রগতিতে বিশ্বাস—অতটুকু শ্রদ্ধা শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় একান্ত আবশ্যক।

মানস-স্তর থেকে অতিমানস স্তরে ওঠা

দিব্যজীবন লাভের পক্ষে উপরোক্ত গুণ কয়টি ব্যতীত আরো কিছুরও প্রয়োজন আছে; তা হলো, শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, "evolution of the mental into gnostic being" (Synthesis of Yoga, p. 794)।

এ সম্বন্ধে অতিমানস-বিজ্ঞান ও মানস জ্ঞান প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে একটু আলোচনা হয়েছে ; এবং দিব্যজীবন লাভের সোপান প্রসঙ্গে পরেও আমাদের আলোচনা করতে হবে। এখানে কেবল একথাটার উল্লেখ প্রয়োজন যে সমতা, শক্তি, বীর্য ও শ্রদ্ধাই পূর্ণ-মানবতা লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয় ; কিন্তু সাধককে মানস জ্ঞানের স্তর থেকে অতিমানস-জ্ঞানের স্তরে উঠতে হবে। এবং এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের আরো একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন অতিমানস-বিজ্ঞানে আবার 'there are several gradations which open at their highest into the full and infinite Ananda' (Synthesis of Yoga, p. 495). অর্থাৎ সমতা প্রভৃতি গুণের ন্যায় অতিমানস-বিজ্ঞান ও আনন্দও পূর্ণ-জীবনের উপাদান বা elements। এবং এ প্রসঙ্গে বারীন্দ্রকুমারের নিকট লিখিত উপরোক্ত পত্র থেকে পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিও স্মরণীয় যে "বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়" (৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সাধকের স্বচেষ্টা ও ভগবানের অনুগ্রহ

দ্বিতীয়ত পূর্ণ-জীবনের মানবীয় আদর্শে যাঁরা আস্থাবান তাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না ; তাই তাঁদের আত্মোন্নতির মূলে থাকে শুধু তাঁদের স্বচেষ্টা। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বারবার একথা বলেছেন যে ভাগবৎ জীবন বা দিব্যজীবন একদিকে প্রথমে সাধকের স্বচেষ্টা অপরদিকে পরে যথাসময়ে ভগবানের অনুকম্পা বা Grace, এ দুয়ের ফল। সাধকের স্বচেষ্টাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন সাধকের তরফে aspiration বা ভগবৎ-অভিমুখী 'ascent' ; আর ভগবানের অনুকম্পা হলো শ্রীঅরবিন্দের মতে ভগবানের 'descent'। পূর্ণ-জীবনের মানবীয় ও ভাগবৎ আদর্শের মধ্যে এই একটি প্রধান পার্থক্য।

দিব্য রূপান্তরের তিনটি ধাপ

সাধকের আস্পৃহা ও ভগবানের অনুকম্পা এ দুয়ের ফল সাধকের জীবনের দিব্য রূপান্তর। এই দিব্য রূপান্তরের পথ দীর্ঘ ও সময়-সাপেক্ষ। শ্রীঅরবিন্দ এই পথে তিনটি ধাপের কথা বলেন। সাধক এক-একটি ধাপ অতিক্রম করেন, সংগে সংগে তাঁর উপলব্ধিও উন্নততর হতে থাকে ; আর তাঁর জীবনের ও চেতনারও ধাপে ধাপে রূপান্তর হতে থাকে। এই ক্রমশ উন্নততর তিনটি ধাপের প্রথমটির নাম শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন Psychic awakening বা অন্তরাত্মার জাগরণ। সাধনপথে দ্বিতীয় ধাপ হলো Spiritual transformation—বাংলায় বলা যেতে পারে অধ্যাত্ম রূপান্তর বা আত্মার সত্য

উপলব্ধি। সাধনার তৃতীয় ও শেষ ধাপের নাম তিনি দিয়েছেন Supramental transformation—বাংলায় অতিমানস রূপান্তর বলা যেতে পারে।

Psyche অন্তরাত্মা বা চৈত্য পুরুষ

Spirit বা আত্মা এবং Supermind কথা দুটি পূর্বে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে; এখানে একটি নতুন কথা Psyche-এর উল্লেখ করা হলো। Psyche ও Psychic awakening কথা দুটির দ্বারা শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝাতে চান তা প্রথমে দেখা দরকার। Psyche কথাটি একটি গ্রীক্ শব্দ। কথাটির মূলগত অর্থ যা শ্বাসগ্রহণ করে; অর্থাৎ জীবিত থাকে; মানুষের ক্ষেত্রে তা হলো Soul। পাশ্চাত্য দর্শনে আত্মা কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে Soul কথাটির ব্যবহার হয়ে থাকে। প্রাচ্য দর্শনে যাকে আত্মা বা জীবাত্মা বলা হয় তা, আর ইংরেজী Soul কথাটি ঠিক এক নয়। অনেকে, যথা স্বামী বিবেকানন্দ, আত্মা অর্থে ইংরেজী Soul কথাটির ব্যবহারের বিরোধী ও Self কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। শ্রীঅরবিন্দও আত্মা অর্থে Self বা Spirit কথা দুটির ব্যবহারই সমীচীন মনে করেন। তিনি Psyche কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে ইংরেজীতে Soul এবং বাংলায় "অন্তরাত্মা", "চৈত্যপুরুষ" কথা দুটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে আত্মা বা জীবাত্মা আর যাকে তিনি অন্তরাত্মা বা Soul বলেন তা ঠিক এক বস্তু নয়।

জীবাত্মা ও অন্তরাত্মার মধ্যে সম্পর্ক

জীবাত্মা আর যাকে শ্রীঅরবিন্দ অন্তরাত্মা বা Psyche বলেন এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী তা আমরা দেখবো। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর Lights on Yoga গ্রন্থের ২৫শ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল:

"The phrase 'central being' in our Yoga is usually applied to the portion of the Divine in us which supports all the rest and survives through death and birth. This central being has two forms—above it is Jivatman, our true being, of which we become aware when the higher knowledge comes—below it is the Psychic being which stands behind mind, life and body."

উপরের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে মানুষের দেহ প্রাণ মনের কেন্দ্রে, তাদের ধারক বা আশ্রয় হয়ে রয়েছে পরমাত্মার এক সনাতন অংশ। পরমাত্মার

এই সনাতন অংশ জীবন-মৃত্যুর অতীত। যখন আমাদের জ্ঞান পূর্ণতর হয় তখন আমরা পরমাত্মার এই সনাতন অংশকে জীবাত্মা বা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে জানতে পারি; আর যখন জ্ঞান অপরিপক্ক থাকে তখন জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। অপরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায় অন্তরাত্মা বা Psychic being-এর উপলব্ধি হয়, আর পরিপক্ক জ্ঞানের অবস্থায় যে জীবাত্মার উপলব্ধি হয় দুই-ই জীবনের কেন্দ্রস্থিত পরমাত্মার সনাতন অংশের দুটি বিভিন্ন রূপ। সংক্ষেপে জীবাত্মার উপলব্ধির মূলে যে জ্ঞান তা পূর্ণতর জ্ঞান; আর অন্তরাত্মার উপলব্ধির মূলে যে জ্ঞান তা হলো আত্মজ্ঞানের প্রথম ধাপ।

জীবাত্মা আর অন্তরাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Lights on Yoga গ্রন্থের ১০ম পৃষ্ঠায় একথাগুলিও বলেছেন: "The true being may be realised in one or both of two aspects—the Self or Atman and the Soul or Antaratman, Psychic being, Chaitya Purusha. The difference is that Atman is felt as universal; the other (Psychic being) as individual supporting the mind, life and body. এই উক্তি থেকে জানা যায় যে জীবাত্মার উপলব্ধি হলো একটি universal consciousness। অন্যত্র universal consciousness-এর প্রতিশব্দ হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ cosmic consciousness কথাটি ব্যবহার করেছেন। Universal বা cosmic consciousness বলতে কী বোঝায়? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর The Life Divine গ্রন্থের ৪৮৫ পৃষ্ঠায় cosmic consciousness কথাটির এ অর্থ করেছেন: "Spirit knows itself as the Self of all, knows all as itself and in itself." অর্থাৎ সাধকের যখন আত্মার উপলব্ধি হয় তখন তিনি নিজেকে সকলের আত্মা বলে জানেন; সকলকে নিজ থেকে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করেন। পক্ষান্তরে সাধকের যখন অন্তরাত্মার উপলব্ধি মাত্র হয় তখন সাধক নিজেকে দেহ প্রাণ মনের অতিরিক্ত এক বিশেষ ব্যক্তি বলে উপলব্ধি করেন। অর্থাৎ তখনও সাধকের এ উপলব্ধি হয় না যে সর্বভূতে একই আত্মা বিদ্যমান। মোটকথা অন্তরাত্মার উপলব্ধি নিম্নতর উপলব্ধি—মানুষ যে দেহ প্রাণ মনের অতিরিক্ত আত্মা এ উপলব্ধি; আর জীবাত্মার উপলব্ধি হলো উচ্চতর উপলব্ধি, সর্বভূতের সংগে সাধকের ঐক্যানুভূতির উপলব্ধি। একটি উপমা দ্বারা দুই উপলব্ধির ঐক্য ও পার্থক্য বোঝান যায়:

গাঢ় কুয়াশা সূর্যকে একেবারে অদৃশ্য করে রাখে, কুয়াশা একটু হাল্‌কা হলে আকাশের স্থান বিশেষ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠে; তখন আকাশের ঐ বিশেষ স্থানে সূর্যমণ্ডলের আভাস পাওয়া যায়; সর্ব আকাশে তখনও সূর্যালোক দেখা যায় না কিংবা সূর্যের দীপ্ত রূপের অনুভূতিও তখন হয় না। তারপর কুয়াশা যখন সম্পূর্ণ কাটে তখন আকাশের সর্বত্র একই সূর্যালোক উজ্জ্বল হয়ে উঠে, সূর্যও প্রকটিত হয়। তেমনি অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন মানুষের নিকট আত্মা সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে—দেহ প্রাণ মনকেই সে তার সব বলে জানে। কিন্তু যখন অন্তরাত্মা জাগে তখন নিজের মধ্যে সাধক অন্তরাত্মার আলো উপলব্ধি করেন; সর্বভূতে যে একই আত্মা বিদ্যমান এ বোধ তখনও দূরে। এ বোধ জন্মে তখন যখন অজ্ঞান দূর হয়, যখন জ্ঞান পূর্ণতর হয়। অর্থাৎ অন্তরাত্মার উপলব্ধি জ্ঞানের প্রথম ধাপ; আর জীবাত্মার উপলব্ধি হয় জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থায়। এ দুই উপলব্ধির সংগে সংগে সাধকের জীবনও পরিবর্তিত (transformed) হতে থাকে—সাধক জীবনের উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠে থাকেন।

চৈত্যপুরুষের স্বরূপ ও কাজ

এই চৈত্যপুরুষ বা অন্তরাত্মার স্বরূপ ও তার কাজ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ অনেক কথাই বলেছেন। তিনি বলেন অন্তরাত্মা হলো মানুষের True conscience; তার কাজ হলো পথ দেখিয়ে সাধককে ভগবানের অভিমুখে নিয়ে যাওয়া। জীবনে সাধক যে সাধু (saint) ও জ্ঞানে ঋষি হয়ে উঠেন তা এই অন্তরাত্মারই জন্যে। শ্রীঅরবিন্দ অন্তরাত্মাকে আবার Sun-flower বা সূর্যমুখী ফুলের সংগে তুলনা করেছেন। সূর্যমুখী ফুলের মুখ সব সময়ই সূর্যের দিকে থাকে। তেমনি পরমাত্মার সনাতন অংশ বলে অন্তরাত্মার দৃষ্টি সব সময় পরমাত্মার উপর, সত্য, শিব, সুন্দরের উপর নিবদ্ধ থাকে। তাই অন্তরাত্মা সাধকের অভ্রান্ত পথপ্রদর্শক True conscience। কোন কোন সাধক যে জীবনে অন্তরাত্মার নির্দেশে চলাই শ্রেয় মনে করে থাকেন তার দৃষ্টান্ত গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেটিস্। সক্রেটিস্ তাঁর পথপ্রদর্শক এক Daemon বা অন্তরদেবতার কথা বলেছেন। সকল সংকটে তাঁর এই Daemon সক্রেটিসের পথ নির্দেশ করতেন; এবং এই Daemon-এর নির্দেশ সক্রেটিস সানন্দচিত্তে মেনে চলতেন। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে এই অভিযোগ আনা হলো যে তিনি দেশের যুবকদের ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করছেন। এ অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড। কথিত আছে সক্রেটিস্ প্রথমে বিচারালয়ে এ অভিযোগের কী উত্তর দেবেন মনে মনে তার

আলোচনা করছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর Daemon-এর নিকট নির্দেশ পেলেন: "বিচারালয়ে এ অভিযোগের কী উত্তর দিবে তার আলোচনায় ক্ষান্ত হও।" সক্রেটিস্ তাঁর এ নির্দেশ মেনে নিলেন এবং অভিযোগের উত্তরে কী বলবেন সে আলোচনায় ক্ষান্ত হলেন।

আবার এই অন্তরাত্মাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "a divine spark of God, the ever pure flame of the Divine, the hidden Guide, the inner light or inner voice of the mystic." (The Life Divine, p. 207). এই অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ক্রমে ক্রমে দীপ্ত হুতাসন হয়ে ওঠে; অর্থাৎ সাধনা যত অগ্রসর হতে থাকে অন্তরাত্মার উপলব্ধিও ততই স্ফুটতর হতে থাকে। এই অন্তরাত্মার জ্ঞান 'changes, grows and develops from life to life' (The Life Divine, p. 208)—অর্থাৎ জন্মে জন্মে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দ জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন; গীতায় বলা হয়েছে "বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে" (৭-১৯); শ্রীঅরবিন্দও এখানে সেরূপ অভিমতই প্রকাশ করলেন।

প্রাকৃত মানুষ কেন অন্তরাত্মার খোঁজ রাখে না

প্রাকৃত মানুষ এই অন্তরাত্মার কোন খবর রাখে না কেন, শ্রীঅরবিন্দ এ প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং উত্তরও দিয়েছেন। তিনি বলেন এ কথা ঠিক যে অন্তরাত্মাই মানবের দেহ প্রাণ মনের ধারক ও আশ্রয়; বস্তুত অন্তরাত্মাকে দেহাদির "রাজা" বলা চলে। কিন্তু এই "রাজা" থাকেন আড়ালে; দেহ-প্রাণ-মনাদি কোশের আড়ালে। চিত্তের গোপন কুঠরীতে, উপনিষদের ভাষায় "গুহায়াং নিহিতং" হয়ে অন্তরাত্মা অবস্থিত। অন্য কথায় বলা চলে দেহ প্রাণ মন অহংকার প্রভৃতি কোশ দ্বারা আচ্ছাদিত বলে অন্তরাত্মা আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কিন্তু কখনো কখনো কারো কারো কানে অন্তরাত্মার বাণী ধরা পড়ে। তার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিখ্যাত কবিতা On The Intimations of Immortality From Recollections of Early Childhood.

Psychic awakening বা অন্তরাত্মার জাগরণের ফল

অন্তরাত্মা জাগ্রত হলে; অর্থাৎ সাধকের অন্তরাত্মার উপলব্ধি হলে কী হয়? সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন: "When one realises the Psychic being (there follows) a sense of union with the Divine and

dependence upon It, and sole consecration to the Divine alone." অর্থাৎ তখন সাধকের এ বোধ জন্মে যে ঈশ্বর তাঁর থেকে দূরে নন; তখন সাধক অন্তরাত্মার নিকট আত্মসমর্পণ করেন, এবং তাঁর এ বোধ জন্মে যে অন্তরাত্মাই তার নিয়ন্তা ও পথপ্রদর্শক; এবং অন্তরাত্মার নির্দেশেই জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে সাধক তখন কৃতসংকল্প হন। সাধক তখন দিব্য-রূপান্তরের সাধনার প্রথম সোপানে আরোহণ করেছেন। তিনি পথ পেয়েছেন; কিন্তু তখনও তাঁর সম্মুখে দীর্ঘ পথ।

অধ্যাত্ম-রূপান্তর বা Spiritual Transformation

দিব্য-রূপান্তর সাধনার দ্বিতীয় ধাপ হলো অধ্যাত্ম রূপান্তর। সাধনার এই ধাপে উঠলে সাধকের আত্মার অনুভূতি লাভ হয় এবং এ বোধ জন্মে যে সর্বভূতে এক-ই আত্মা বিগুমান—এ-সব কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। এই অনুভূতির একটি আনুষঙ্গিক ফল এই যে সত্য ও জ্ঞানের আলোতে, শান্তি ও আনন্দে সাধকের জীবন পূর্ণ হয়। এ অবস্থায় দেহে আত্ম-বুদ্ধিরও অবসান হয়; ফলে দেহের সুখ-দুঃখ আর দেহীর উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, তখন জীবাত্মার উপমা যেন শুষ্ক নারিকেল। কী অর্থে তিনি এ উপমা দিয়েছেন তা জানা যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের নিম্ন উদ্ধৃতি থেকে:

"নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে তার শাঁস খোলা থেকে আলাদা হয়ে যায়। তেমনি আত্মজ্ঞান হলে দেহাত্ম-বুদ্ধি চলে যায়—দেহের সুখ-দুঃখে দেহীর সুখ-দুঃখ বোধ হয় না।" জীবাত্মার অনুভূতির আর একটি ফল হলো এই যে 'The individual is aware of the eternal being that he is' (The Life Divine p. 792)। ইহা তো "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" মুণ্ডক উপনিষদের (৩-২-৯) ঐ বিখ্যাত কথাটিরই প্রতিধ্বনি।

শ্রীঅরবিন্দের মতে অধ্যাত্ম-রূপান্তরে সাধনার পরিসমাপ্তি নয়

অধ্যাত্ম-রূপান্তরে কি সাধনার পরিসমাপ্তি? শ্রীঅরবিন্দ এখানে অধিকাংশ ভারতীয় ঋষিদের সংগে একমত নন। শ্বেতাশ্বতর ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বারবার বলা হয়েছে "য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" অর্থাৎ যাঁরা আত্মাকে জানেন —আত্মাকে জানা আর পরমাত্মাকে জানা একই কথা—তাঁরা অমৃত হন। তাই ভারতীয় ঋষিদের অনুশাসন "আত্মানং বিদ্ধি"—আত্মাকে জান। কেবল ভারতীয় ঋষিগণ নয় গ্রীস প্রভৃতি দেশেও সাধকগণ 'know thyself' এই বাক্যটিকে জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে গ্রীসের এক

বিখ্যাত মন্দিরের দ্বারে গ্রীক ভাষায় know thyself কথা দুটি উৎকীর্ণ ছিল। এ-ই ছিল ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের ঋষিগণের সাধনার শেষ লক্ষ্য। ভারতের ঋষিগণ সমাধির সাহায্যে এই আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হতে সচেষ্ট হতেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের মতে এ হলো ব্যক্তিগত মুক্তি আর এ মুক্তি তাঁর মতে তাঁর Integral মুক্তির আদর্শের সবটা নয়। ব্যক্তিগত মুক্তি তাঁর সাধনার লক্ষ্য হলেও চরম লক্ষ্য নয়। তাই শ্রীঅরবিন্দের মতে অধ্যাত্ম-রূপান্তরই সাধনার শেষ কথা নয়; সাধনার শেষ ধাপ হলো Supramental Transformation বা অতিমানস রূপান্তর।

অতিমানস রূপান্তর বা দিব্য-রূপান্তর

দিব্য-রূপান্তর, বা Supramental Transformation, অর্থাৎ এই পৃথিবীই একদিন স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে। শ্রীঅরবিন্দের এই স্বপ্ন তাঁর আগে অন্য কোন যোগী ঋষি দেখেননি। আমরা দেখেছি শ্রীঅরবিন্দের মতে অতীতে Supermind তত্ত্ব ভারতে ও অন্য দেশেও কারো কারো কাছে অজ্ঞাত ছিল না; সমাধির সাহায্যে অতীতের সাধকদের কেউ কেউ অতিমানস স্তরে উঠতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন 'What was missed was the way to make it integral for the life and to bring it down for transformation of the whole nature, even of the physical nature'. (The Riddles of This World p. 31). অর্থাৎ অতীতের সাধকদের সিদ্ধি integral বা পূর্ণ-সিদ্ধি ছিল না; কেননা তাঁরা সর্ব জীবনের, মন প্রাণ দেহের প্রত্যেকটির, পরিবর্তন চাননি। দ্বিতীয়ত Supermind বা অতিমানস বিজ্ঞানেই তাঁরা সমাধির সাহায্যে উঠতে চেয়েছিলেন; অতিমানস বিজ্ঞানকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে সর্ব জীবনের, এমন কি দেহেরও পরিবর্তন করবার উপায় তাঁদের জানা ছিল না।

পূর্ণ-সিদ্ধি বলতে শ্রীঅরবিন্দ বোঝেন সংক্ষেপে Transformation of mind, life and body; দ্বিতীয়ত তাঁর মতে অতিমানস-বিজ্ঞানকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনার উপায় হলো "descent of the Supramental Divine through self-giving and surrender অর্থাৎ সাধকের আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের ফলেই কেবল পৃথিবীতে একদিন দেবতার অবতরণ সম্ভব হবে মানব দেবমানব হয়ে উঠবে। পরে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের self-giving ও self-surrender কথা দুটির আবার উল্লেখ করতে

হবে। দিব্য-রূপান্তর সম্বন্ধে যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে এবং পাঠকদের মনে যে সব প্রশ্ন ও সংশয় জাগা সম্ভব এখানে তার একটু উল্লেখ করা দরকার।

দিব্য-রূপান্তর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

শ্রীঅরবিন্দের আগে কোন যোগীই তো সমগ্র মানুষের, অর্থাৎ মানুষের দেহ প্রাণ মন প্রভৃতি সর্ব অঙ্গের কিংবা সমগ্র মানব সমাজের দিব্য-রূপান্তরের কথা বলেননি। তবে কি শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-রূপান্তরের স্বপ্ন একটা অবাস্তব জিনিস? এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন: "I know with absolute certitude that the Supramental is a truth, and that its advent is in the very nature of things inevitable. The question is as to the when and how. (Sir Aurobindo On Himeself and On the Mother p. 233) অর্থাৎ একদিন মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে, মানব দেব-মানব হয়ে উঠবে। তবে সেদিন কবে আসবে? সে সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। সে ভবিষ্যৎ সুদূর ভবিষ্যৎও হতে পারে; কিংবা অনতিদূর ভবিষ্যৎও হতে পারে। তবে শ্রীঅরবিন্দের বিশ্বাস প্রথম প্রাণী থেকে মানবের স্তরে পৌছতে যেমন লক্ষ লক্ষ বছর কেটেছে, মানবের পক্ষে দেব-মানবের স্তরে পৌছতে অত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন না-ও হতে পারে। শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগ মানুষের উচ্চতর স্তরে উঠবার ব্যাপারটিকে হয়ত ত্বরান্বিত করবে।

মানবের দিব্য-রূপান্তর স্বপ্ন অবাস্তব না হলেও তার সম্বন্ধে নানা সংশয় ও ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। কীভাবে পৃথিবীতে দেব-মানব সমাজ গড়ে উঠবে? এককালে পৃথিবীতে অতিকায় সরীসৃপের যুগ ছিল; আজ তারা সব লুপ্ত। পৃথিবীতে দেব-মানবের আবির্ভাব হলে আজিকার মানুষ কি লোপ পাবে না, আজিকার মানুষ ও ভাবী দেব-মানব কি একই সময়ে পাশাপাশি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে? কথাটার খুব যে গুরুত্ব আছে, তা নয়। এ হলো অনাগত ও অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা। তবে শ্রীঅরবিন্দ বলেন It is the individual who receives the intuition (The Life Divine p 773)। অর্থাৎ অতিমানস-বিজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষই প্রথমে লাভ করবেন; সমগ্র মানব সমাজ একই সময়ে এই জ্ঞানের অধিকারী হবে, এ আশা করা যায় না। আলোকপ্রাপ্ত লোকেরা সমাজের সম্মুখে নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সমাজকে ক্রমে

ক্রমে উন্নত স্তরে উপনীত করবেন এই কথাটাই যুক্তিযুক্ত। তবে একথা ঠিক যে একদিন পৃথিবী হবে দেব-মানবের বাসভূমি।

অনেকের মনে আবার এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মাতে পারে যে পৃথিবীতে অতিমানসের অবতরণের ফলে রাতারাতি ভোজবাজির ন্যায় মানুষের আমূল পরিবর্তন ঘটবে—পৃথিবী রাতারাতি স্বর্গ হয়ে উঠবে; পৃথিবীর মানুষ দেবতা হয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ একখানা পত্রে বলেছেন: "All that is absurd. The descent of the Supramental means that the power will be there in the earth-consciousness as a living force" ঐ পত্রেই তিনি তাঁর এই মতের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়েছেন: পৃথিবীর ক্রমবিকাশের ধারায় একদিন প্রাণীজগতে মানুষের মন-বুদ্ধির আবির্ভাব হলো; কিন্তু তা বলে কি সকল প্রাণীই মানুষের মতন বুদ্ধি লাভ করলো? আর মানুষে মানুষেও কি বুদ্ধির দিক থেকে বিস্তর ব্যবধান রয়ে গেল না? জ্ঞানী-শিরোমণি সক্রেটিস্ এবং একজন অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ান বা আমেরিকার আদিম অধিবাসীর মধ্যে ব্যবধান কী বিপুল! আসল কথা উচ্চতর জ্ঞানের স্তরে উপনীত হতে হলে মানুষকে সেজন্য সাধনার সহায়ে প্রস্তুত হতে হবে। অতিমানসের অবতরণের সুযোগ গ্রহণ করতে হলে মানুষকে তার যোগ্য হতে হবে। রাতারাতি পৃথিবী স্বর্গ হয়ে উঠবে না।

দেহের দিব্য-রূপান্তর

দিব্য-রূপান্তর প্রসঙ্গে সবচেয়ে দুর্বোধ্য হলো দেহের দিব্য-রূপান্তর কথাটির দ্বারা শ্রীঅরবিন্দ কী বোঝাতে চেয়েছেন! নানাস্থানে তিনি এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন: তাঁর "The Life Divine" গ্রন্থের ৮৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন: "The body will be turned by the power of spiritual conciousness into a true and fit and perfectly responsive, instrument of the Spirit." অন্যত্র তিনি বলেছেন: "The body will be responsive to the light and able to carry out all that the free mind could demand of it." কথা দুটির অর্থ স্পষ্ট। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে একথাটাই অপ্রিয় সত্য যে তার অন্তর যা চায় দেহ তা-তে বাধা ঘটায়। কিন্তু অতিমানসের অবতরণের ফলে যে মানুষ মুক্ত হবেন তাঁর দেহ ও অন্তরের মধ্যে এ বিরোধ থাকবে না—তাঁর দেহ তাঁর মনের একটি উপযুক্ত ও আজ্ঞাবহ যন্ত্র হয়ে উঠবে।

শ্রীঅরবিন্দের উপরোক্ত কথার অর্থ স্পষ্ট; কিন্তু মানবদেহের রূপান্তর ঠিক যে কী হবে তা-তো জানা গেল না। এ প্রসঙ্গে দৈহিক অমরতা ও মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বিভিন্ন স্থানে যা বলেছেন তার একটু উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'The Life Divine' গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: "Science itself begins to dream of the physical conquest of death." অর্থাৎ আজ বিজ্ঞান দৈহিক অমরতার স্বপ্ন দেখছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের আয়ুসীমা অনেক বেড়েছে এবং আরো বাড়বে। কিন্তু অতি উৎসাহী বৈজ্ঞানিক যাই বলুন না কেন, বিজ্ঞান যে একদিন সত্যি সত্যিই মৃত্যুকে জয় করবে, এই পৃথিবীতেই মানুষ শুধু বিজ্ঞানের কল্যাণে (অতিমানসের অবতরণের ফলে নয়) দৈহিক অমরতা লাভ করবে, বিজ্ঞানের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আছে কি? ভবিষ্যদ্বাণী করবার দরকার নেই। অন্য কারণেও এরূপ দৈহিক অমরতার স্বপ্ন যে অবাস্তব অন্তত অনাবশ্যক শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকেই তা দেখানো যায়।

শ্রীঅরবিন্দের মতে বিশ্বের বিধানে মৃত্যুর একটা স্থান ও প্রয়োজন রয়েছে। আমরা দেখি মৃত্যুর ভিতর দিয়েই নবজীবনের সূচনা হয়—বীজ বিনষ্ট হয়ে গাছের জন্ম দেয়। আর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ও প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর অভিমত নিম্নলিখিত ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন: "The material or physical causes of death are not its sole or true cause; its true and inmost reason is the spiritual necessity for the evolution of a new being." (The Life Divine p. 732). অর্থাৎ মৃত্যু কেন ঘটে থাকে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে মৃত্যুর দৈহিক কারণগুলিই মৃত্যুর একমাত্র বা প্রকৃত কারণ নয়; মৃত্যু ঘটে থাকে এজন্যে যে নইলে নবজীবনের উন্মেষ সম্ভব হয় না। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোকে বলা হয়েছে "বহুনাম্ জন্মানামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে" অর্থাৎ বহু জন্মের পর জ্ঞানলাভ করে মানুষ ভগবানকে লাভ করে। দিব্যজীবনের পথে বারবার মৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করতে হয়। এজন্যেই বিশ্বের বিধানে মৃত্যুর স্থান ও প্রয়োজন।

কিন্তু অতিমানসের অবতরণের ফলে দেহের কী পরিবর্তন ঘটবে তা এখনও বলা হয়নি; এবং স্পষ্ট করে কোথায়ও শ্রীঅরবিন্দ বলতে পারেননি, কিংবা বলতে চাননি। কেন তা আমরা দেখবো। একস্থানে তিনি যা বলেছেন তা

এই : "Even body, if it can bear the touch of Supermind, will become more aware of its own truth—will gain an Occult knowledge of body cells and tissues which may one day become conscious and contribute to the transformation of the physical being. মানবদেহ লক্ষ লক্ষ কোশের সমষ্টি। সে কোশগুলির প্রত্যেকটি জীবন্ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণাগারে দেহ থেকে কিয়ৎসংখ্যক কোশ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, জীবন্ত কোশগুলির জৈবক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যাদির ব্যবস্থা করে বছরের পর বছর অনির্দিষ্টকালের জন্য কোশগুলিকে জীবিত রাখতে সক্ষম হয়েছেন; এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোশগুলির বংশবৃদ্ধিও হয়েছে। এ পরীক্ষিত সত্য; এবং এর সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অতিমানস অবতরণের ফলে একদিন কোশগুলি কেবল জীবন্ত না থেকে সচেতনও হয়ে উঠতে পারে—একথাটাকে শ্রীঅরবিন্দ সম্ভব মনে করেন। তাঁর উপরোক্ত উদ্ধৃতির এই মর্ম। কথাটাকে তিনি একটা সুনিশ্চিত ব্যাপার না বলে একটা সম্ভবপর ব্যাপার বলে বর্ণনা করেছেন।

আসল কথা অতিমানস অবতরণ এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কথা। তার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা যে সম্ভব নয় তা শ্রীঅরবিন্দ তার "জগন্নাথের রথ" প্রবন্ধে বলেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে জগন্নাথের রথ যেদিন জগতের রাস্তায় বের হবে, অর্থাৎ অতিমানসের অবতরণ পৃথিবীতে সত্যই ঘটবে সেদিন পৃথিবীর বক্ষে সত্যযুগ নামবে। কিন্তু "জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকৃতি বা নমুনা কেহ জানে না; কোন জীবন-শিল্পী আঁকিতে সমর্থ নয়।" তাই অতিমানসের অবতরণের ফল কী হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অবাস্তব ও অনাবশ্যক। একথাটা তাঁর ১৯৪৯ সনের একখানা চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন। তাঁর কথা: "My speculations about an extreme form of divinisation (অর্থাৎ দিব্য-রূপান্তর) are something in a far distance and are no part of preoccupations of the spiritual life in the near future." (Sri Aurobindo On Himself And On The Mother p 286).

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অপর একখানা পত্র থেকে নিম্নের উদ্ধৃতিটি আমরা তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করতে পারি। উদ্ধৃতিটি এই: "In a supra-

mental world imperfection and disharmony are bound to disappear.……But what, how, by what degree it will do it is a thing that ought not to be said now—when the Light is there, the Light itself will do its work. It will establish a perfection, a harmony……—for the rest, well, it will be the rest—that is all." (Letter p. 51, Sri Aurobindo Circle—Third number)

একদিন যে মর্ত্যে অতিমানসের অবতরণ ঘটবে এ বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ নিঃসন্দেহ। অতিমানসের অবতরণের ফলে পৃথিবীর দিব্য-রূপান্তর যে ঘটবে তা-ও নিঃসন্দেহ। তবে কীভাবে, কখন্ তা ঘটবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা নিরর্থক। তা না করে দিব্যজীবনের পথে চলতে ইচ্ছুক সাধকের সম্মুখে শ্রীঅরবিন্দ যে কর্মের আদর্শ স্থাপন করেছেন তার আলোচনাই শ্রেয়তর। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আদর্শ এক মহামূল্যবান অবদান। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা তার আলোচনা করবো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিব্যকর্ম বা The Gospel of Divine Action

শ্রীঅরবিন্দের মতে সাধনায় কর্মের স্থান

জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্মীসকলের মতেই সাধনার আরম্ভ কর্মে। আর গীতায় বলা হয়েছে কেউ ক্ষণমাত্র কর্ম না করে থাকতে পারে না। শ্রীঅরবিন্দের মতে কর্ম কেবল সাধনার আরম্ভ নয়, সাধনার শেষও অর্থাৎ মুক্তির উপায়ও বটে। তাঁর কথা : "Action is not only a preparation but itself the means of liberation". আর শ্রীঅরবিন্দের মতে মুক্তিলাভের পরও সাধককে আমরণ কর্ম করে যেতে হয়; এবং সে কর্ম হলো "মুক্তস্য কর্ম"। দিব্যকর্ম আর "মুক্তস্য কর্ম" একই কথা। দিব্যকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ কী বলেন, তা-ই প্রথমে আমাদের জানতে হবে। দিব্যকর্মের ইংরেজী প্রতিশব্দ হিসাবে তিনি 'divinely inspired action' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

কর্মের বিভিন্ন আদর্শ

পাশ্চাত্য জগতে এবং আমাদের দেশেও, প্রাচীন কালে ও আধুনিক কালে, কর্মের নানা আদর্শ প্রচলিত ছিল ও আছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এই সকল আদর্শের দোষ-গুণ দেখিয়েছেন। প্রথমে এই সকল বিভিন্ন আদর্শের একটু আলোচনা দরকার।

(ক) পশ্চিমের মানবতা-ধর্ম বা Religion of humanity

আজ পশ্চিমে কর্মের যে আদর্শ অধিক সমাদৃত তা হলো-- Religion of humanity বা মানবতা ধর্ম। এই ধর্মের প্রধান লক্ষণ বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্য আত্মত্যাগ, মানব-সেবা, জন-কল্যাণ প্রভৃতি। মানবসমাজের সর্ববিধ উন্নতি—রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আর্থিক, শিক্ষাগত উন্নতি—মানবতাবাদীদের কাম্য। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বিশেষভাবে 'The Ideal of Human Unity' গ্রন্থের ৩৪শ অধ্যায়ে এই মানবতা-ধর্মের আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন এই Religion of humanity অষ্টাদশ শতকের পশ্চিমের যুক্তিবাদীদের মানসপুত্র। এই যুক্তিবাদীদের প্রচলিত খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাস ছিল না কিন্তু মানবের জন্য তাঁদের দরদবোধ ছিল অসীম। দর্শন-শাস্ত্রে যে মতবাদ Positivism নামে খ্যাত তা হলো এই মানবতা-ধর্মের দার্শনিক রূপ। শ্রীঅরবিন্দ কর্মের এই আদর্শের নিন্দা করেন না, কিন্তু এই আদর্শকে কর্মের সর্বোত্তম আদর্শ বলেন না। 'Synthesis of Yoga' গ্রন্থের ১৭৩ সংখ্যক পৃষ্ঠায় তিনি মানবতা-ধর্মের ত্রুটি এভাবে দেখিয়েছেন: "Altruism, Philanthropy, humanitarianism, service are all flowers of the mental consciousness, and are at best the mind's cold and tale imitation of the spiritual flame of Universal Divine Love. Not truly liberative from ego-sense they widen it at most and give it a higher satisfaction, impotent in practice to change man's vital nature……।" (অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে বিশ্বপ্রেম, মানবপ্রেম, জনসেবা প্রভৃতি সুন্দর জিনিস সন্দেহ নাই—শ্রীঅরবিন্দ এদের ফুলের সংগে তুলনা করেছেন; তবে এরা হলো মানসস্তরের জিনিস; মনের উর্ধ্বতর অতিমানসস্তরের জিনিস নয়। (স্মরণ রাখতে হবে শ্রীঅরবিন্দের মতে কর্ম দিব্যকর্ম হয়ে উঠে তখনি যখন কর্মের উৎস হয় অতিমানস স্তর।) উপরের উদ্ধৃতিতে একথাও বলা হয়েছে যে ভগবানের প্রেম সর্বভূতে প্রেমরূপে

আত্মপ্রকাশ করে ; কিন্তু মানবতা-ধর্মের বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি ভগবৎপ্রেমের একটু সামান্য অনুকরণ-মাত্র। আর মানবতা-ধর্মের অপর একটি ত্রুটি এই যে তা মানুষকে তার অহংবুদ্ধি থেকে মুক্তি দিতে পারে না, বড় জোর তার দ্বারা মানুষের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির পরিবর্তে একটা বৃহৎ অহংবুদ্ধির চরিতার্থতা লাভ হয়—ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধির স্থলে বৃহত্তর জাতিগত, দেশগত অহংবুদ্ধি কর্মের প্রেরণা যোগায়। তারপর শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে মানুষের প্রাণ-মনের প্রকৃতি-পরিবর্তন ব্যতীত দিব্যজীবন লাভ অসম্ভব ; কিন্তু এই মানবতা-ধর্ম মানবের সেই প্রকৃতি-পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম।)

(খ) কর্মের ভারতীয় আদর্শসমূহ—(১) মহাযান বৌদ্ধ আদর্শ

মানবকল্যাণ যে কর্মের একটা উচ্চ আদর্শ সে কথাটা আমাদের দেশেও অজ্ঞাত ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'Synthesis of Yoga' গ্রন্থে (৩০৯।১০ পৃষ্ঠা) তার কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। তার প্রথম দৃষ্টান্ত হলো মহাযান বৌদ্ধধর্মের পরম কারুণিক অমিতাভ বুদ্ধ। নির্বাণ অমিতাভের করায়ত্ত ; কিন্তু তিনি সংকল্প করলেন যতদিন একটিমাত্র মানবও নির্বাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে ততদিন তিনি নিজে কিছুতেই নির্বাণে প্রবেশ করবেন না।

(২) ভাগবতের রন্তিদেবের প্রার্থনা

শ্রীঅরবিন্দের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ভাগবৎপুরাণ থেকে নেওয়া। ভাগবতের ৯ম স্কন্ধের রাজর্ষি রন্তিদেবের কাহিনী থেকে একটি শ্লোকের ইংরেজী অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'Synthesis of Yoga' গ্রন্থের ৩০৯ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন ভাগবতের বিখ্যাত শ্লোকটি এই :

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তাং অপুনর্ভবং বা
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥

শ্রীঅরবিন্দ শ্লোকটির এই অনুবাদ করেছেন : "I desire not the supreme state with all its eight siddhis, nor the cessatian of rebirth ; may I assume the sorrows of all creatures who suffer and enter into them so that they may be made free from grief." এখানে অপুনর্ভব কথাটি লক্ষ্যণীয়। শ্রীঅরবিন্দ কথাটির অনুবাদ করেছেন cessation of rebirth। ভারতীয় সাধকগণের লক্ষ্য সাধারণতঃ মোক্ষ ; এবং মোক্ষ বলতে তাঁরা বোঝেন জন্মান্তরের হাত থেকে—বারবার পৃথিবীতে গতাগতির হাত থেকে—নিষ্কৃতি। ভাগবতে উপরের শ্লোকটিতে বলা হয়েছে যে

দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্যে অপুনর্ভব বা জন্মান্তরের হাত থেকে নিষ্কৃতিও কাম্য নয়। মানবপ্রেমের, মানব-কল্যাণের এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? আর লক্ষ্য করতে হবে উপরের শ্লোকে কেবল মানবের দুঃখ দূর করার কথা বলা হয়নি; সকল দেহধারী জীবের দুঃখ-মোচনের কথা বলা হয়েছে—কেবল মানব-প্রেমের নয় বিশ্বপ্রেমের কথাই আমরা এখানে পাই।

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের আদর্শ

শ্রীঅরবিন্দের মানবপ্রেমের তৃতীয় দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দের একখানা পত্র। অতি শ্রদ্ধার সংগে স্বামী বিবেকানন্দকে the great Vedantin বলে শ্রীঅরবিন্দ উল্লেখ করেছেন, এবং স্বামিজীর পত্রখানার কিছু অংশ তাঁর 'Synthesis of Yoga' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান ভারতের দুই মহান ধর্মগুরু। দুয়ের মধ্যে মিল ও অমিল দুই-ই দেখা যায়। তাই দুজনের মতের তুলনামূলক আলোচনা শ্রীঅরবিন্দের মত বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে। এক সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা যে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন একথা তিনি নিজেই বলেছেন (Sri Aurobindo On Himself And On The Mother পুস্তকের ১২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বাংলার একজন সুধী শ্রীঅরবিন্দকে স্বামী বিবেকানন্দের উত্তর-সাধক বলেছেন।

স্বামিজীর পত্রখানার কথায় আসা যাক্। উক্ত পত্রখানা তিনি লিখেছিলেন আলমোড়া থেকে ১৮৯৭ সনের ৯ই জুলাই আমেরিকার Miss Mary Hales নাম্নী তাঁর এক শিষ্যাকে। ঐ পত্রে তিনি লিখেছিলেন: "I have lost all wish for my salvation. May I be born again and again and suffer thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in the sum-total of all souls—and above all my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, is the special object of my worship. He who is the high and the low, the saint and the sinner, the God and the worm, Him worship, the visible, the knowable, the real the Omnipresent. Break all other idols." অর্থাৎ তাঁর শিষ্যাকে স্বামিজী এই পত্রে যা লিখেছিলেন তার সারমর্ম এই যে তাঁর মতে ঈশ্বর হলেন সর্বজীবের সমষ্টি—the sum-total of

all souls। আর বিশেষভাবে পাপীতাপী, দীন-দুঃখীই স্বামিজীর পূজার পাত্র ; এবং ঐসব দীন-দুঃখীর সেবাই প্রকৃত ঈশ্বর-পূজা। এই প্রকৃত ঈশ্বর-পূজার জন্য তিনি বার বার জন্মগ্রহণ করতে এবং সহস্র সহস্র দুঃখ বরণ করতে প্রস্তুত। এখানে 'অপুনর্ভব' সম্বন্ধে স্বামিজীর মত জানা গেল , এবং তাঁর মতে কর্মের লক্ষ্য বা আদর্শ কর্ম কী তা-ও জানা গেল। প্রথমে 'অপুনর্ভব' সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মত কী দেখা যাক্। তা জানা যায় স্বামিজীর উক্ত পত্রখানার উপর যে মন্তব্য শ্রীঅরবিন্দ করেছেন তা থেকে।

শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য : "The true salvation or the true freedom from the chain of rebirth is not the rejection of terrestrial life ; it is the inner identification with the Divine. He who is free inwardly, even doing action does nothing at all, says the Gita ; for it is Nature that works in him under the control of the Lord of Nature.······Even if he assumes a hundred times the body, he is free from any chain of birth. Therefore the sadhaka of Integral Yoga must cast away from him attachment to the escape from rebirth (Synthesis of Yoga p. 310). এখানে শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃত 'অপুনর্ভব' বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা করেছেন ; এবং বলেছেন পূর্ণযোগের সাধকের জন্মান্তর গ্রহণের হাত থেকে নিষ্কৃতির প্রতি কোন আসক্তি থাকবে না। দেখা গেল স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়ের মতেই অপুনর্ভবের কামনা বর্জনীয়, কর্ম করাই সাধকের লক্ষ্য।

আর একটি বিষয়েও উভয়ের মধ্যে মিল। উভয়ের কেউ-ই মানবতাবাদীদের মতন ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জনকল্যাণকর কর্মের পক্ষপাতী নন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন তিনি বারবার জন্মগ্রহণ করতে এবং সহস্র সহস্র দুঃখ সহ্য করতে প্রস্তুত যদি তিনি তার দ্বারা প্রকৃত ঈশ্বর-পূজার সুযোগ পান। আর শ্রীঅরবিন্দ কর্মের ভিতর দিয়ে inner identification with the Divine অর্থাৎ অন্তরে ঈশ্বরের সংগে ঐক্য অনুভব করতে চান। ঈশ্বরের পূজা, ঈশ্বরের সংগে ঐক্য-বোধ উভয়ক্ষেত্রেই মুখ্য।

(৪) শ্রীঅরবিন্দের কর্মের আদর্শ

তবু একথা বলতেই হবে যে করণীয় কী, শ্রেষ্ঠতম কর্ম কী সে বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিভঙ্গী স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভিন্ন। দুজনের

দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বুঝলে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের স্বরূপ কী তা বোঝা যাবে। আমরা স্বামিজী ও শ্রীঅরবিন্দের পত্র থেকে তা বুঝতে চেষ্টা করবো। স্বামিজীর কর্মের আদর্শ তাঁর শিষ্যা Miss Mary Hales-কে লেখা পূর্বোক্ত পত্র থেকে আমরা জেনেছি। তাঁর কর্মের আদর্শ তিনি আরো পরিষ্কার করে বলেছেন তাঁর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের নিকট লেখা এক পত্রে। ঐ পত্রে স্বামিজী তৈত্তিরীয় উপনিষদের বিখ্যাত অনুশাসন বাক্য "মাতৃদেবো ভব" "পিতৃদেবো ভব" কথাগুলি স্বামী অখণ্ডানন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছিলেন: "You have heard মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব (Look upon your mother as God, look upon your father as God)—but I say দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব—the poor, the illiterate, the ignorant, the afflicted—let these be your God. Know that service to these alone is the highest religion. (Letters of Svami Vivekananda)। এই আদর্শেরই অনুপ্রেরণায় স্বামী অখণ্ডানন্দ মুরশিদাবাদ জেলার এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে শিক্ষাদান ও জনসেবাকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। আর বেলুড়মঠ ও রামকৃষ্ণমিশনের দরিদ্রনারায়ণের সেবার ও তাদের বহু উৎকৃষ্ট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহের আশ্চর্য সফলতার মূলেও রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের কর্মের এই মহান আদর্শ।

কিন্তু Humanitarianism ও Philanthropy যে সুন্দর জিনিস তা স্বীকার করেও শ্রীঅরবিন্দ তাদের কর্মের উচ্চতম আদর্শের কোঠায় স্থান দেন নি। এখানে স্বামী বিবেকানন্দের ও শ্রীঅরবিন্দের আদর্শের মধ্যে অমিল। এই দুই আদর্শের পার্থক্য স্পষ্ট করে শ্রীঅরবিন্দ একখানা পত্রে দেখিয়েছেন। পত্রখানা 'Sri Aurobindo On Himself and On The Mother' পুস্তকের ২১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সম্ভবত কোন পত্রলেখক Miss Hales-কে লেখা স্বামিজীর পত্রখানার কিছু অংশ উদ্ধৃত করে তার প্রতি শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং হয়ত Humanitarianism ও Philanthropy সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিমত জানতে চান। উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "As to the extract about Vivekananda, the point I make there does not seem to me humanitarian. You will see that I emphasise the last sentence of the page quoted from Vivekananda, not the words about God the poor, and sinner and criminal. The

point is about the Divine in the world, the All, Sarvabhutani of the Gita. That is not merely humanity, still less only the poor or the wicked. Surely even the rich or the good are the part of the All ; and those who are neither good nor bad, nor rich nor poor. Nor is there any question (I mean in my own remarks) of philanthropic service ; so neither *daridrer seva* is the point.……I had already altered my view point from the 'Our Yoga for the sake of humanity' to 'Our Yoga for the sake of the Divine'. অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দের মতে মানবতাবাদীদের বিশ্বমৈত্রী বা মানবপ্রেম কর্মের সর্বোত্তম আদর্শ নয়। গীতায় সর্বভূতে ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে ; শ্রীঅরবিন্দ সেই কথার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। ঈশ্বর কেবল মনুষ্যের মধ্যে আছেন তা তো নয়, সর্বভূতেই আছেন। আর মনুষ্যের মধ্যে ঈশ্বর কা কেবল দীনদরিদ্র, দুঃখী-তাপী ও পাপীর মধ্যে আছেন ? যারা দীনদরিদ্র বা পাপী-তাপী নয় তাদের মধ্যে কী ভগবান নেই ? তবে বিশেষভাবে দরিদ্রনারায়ণের সেবার কথা উঠবে কেন ? এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে মতভেদ। আর শ্রীঅরবিন্দ বলেন তাঁর যোগের লক্ষ্য সর্বমানবের কল্যাণ এমন কথা এক সময় তিনি বলেছিলেন ; কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে ; (এখন) তাঁর যোগের লক্ষ্য ভগবানের জন্য কাজ। অন্যত্র শ্রীঅরবিন্দ স্বামিজীর কর্মের আদর্শকে a mixture of Budhist compassion and modern philanthropy বলেছেন। স্বামিজীর কর্মের আদর্শ যে মহান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; তাঁর মানবপ্রেমও অসাধারণ ; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মের আদর্শ তা থেকে স্বতন্ত্র। স্বামিজীর লক্ষ্য বিশেষভাবে মানব-কল্যাণ, আর শ্রীঅরবিন্দের লক্ষ্য ভগবানের অভিপ্রায় ও নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন।

দিব্যকর্ম কী নয়

প্রথমে শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্ম কী নয় তা বলে পরে দিব্যকর্মের স্বরূপ ও সোপানগুলি কী তা বলা হবে। দিব্যকর্ম কী নয় তা বুঝতে হলে তম, রজ ও সত্ত্ব এই তিন গুণভেদে যে মানুষের কর্মভেদ হয়, অর্থাৎ কর্মের পার্থক্য হয়, সে সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথা স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের দর্শনের সুবিদিত মত এই যে সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনটি গুণের সমবায়ে মানব-প্রকৃতি গঠিত।

সর্বমানবেই এই তিন গুণ অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তবে প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে এই তিন গুণের কোন একটির আধিক্য ঘটে বলে মানুষকে তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক এই তিন শ্রেণীর কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। এই তিন শ্রেণীর মানুষের কর্মও যে ভিন্ন তা বলা বাহুল্য। গীতার ১৪শ অধ্যায়ে তা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। তামসিক প্রভৃতির লোক নিরুদ্যম, তাই হীনদশায় পতিত; ভারতবাসী তার দৃষ্টান্ত। রজোগুণ প্রবল কর্মের উৎস। রাজসিক প্রকৃতির লোক সংসারে বড় হতে চায় এবং বড় হয়ে থাকে। ভোগ-সুখে কিন্তু অশান্তিতে তার দিন কাটে। পাশ্চাত্য জগৎ তার দৃষ্টান্ত।

এখানে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে পড়ে। সকলেই জানেন স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম-মহামেলায় খ্যাতি অর্জন করলে, আমেরিকার বহু ধনীগৃহে তিনি সম্মানিত অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হন। কথিত আছে আমেরিকার ধনীগৃহের বিলাস ও ঐশ্বর্যের মধ্যে তাঁর রাত্রে ঘুম হতো না, এই ভেবে যে পাশ্চাত্যজগতের লোকেরা সাংসারিক দিক থেকে কত উন্নত আর তাঁর দেশবাসীরা কত হীন! তাই দেশে ফিরে এসে স্বামিজীর একটি প্রধান কাজ হলো ভারতের (গৃহস্থ) যুবকদের মনে এই প্রেরণা জাগানো যে তাদের রজোগুণী হয়ে মানুষের মতন বাঁচতে হবে।

তামসিকতার ঊর্ধ্বে ওঠবার উপায় রজোগুণী হওয়া

তামসিকতায় নিমগ্ন বলেই ভারতবাসী দৈন্যদশায় পতিত। এই হলো স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের মত। এই দৈন্যের পঙ্ক থেকে উদ্ধার পেতে হলে ভারতবাসীকে প্রথমে রজোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে; কিন্তু সেখানেই তার সাধনার, তার কর্মের শেষ নয়। শ্রীঅরবিন্দের কথা, রজোগুণী হওয়া "is not in itself a thing evil or unprofitable; it is rather the condition for the upward evolution of our human nature out of the 'tamsic' ignorance and inertia; it is the 'rajasic' stage of the graded ascent of man towards supreme self-knowledge, power and bliss. But if we rest eternally on this plane the মধ্যমাগতি of the Gita, our ascent remains unfinished; the evolution of the soul incomplete (Essays on the Gita)। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে, সাধনপথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হলে, প্রথমে তমোগুণের ঊর্ধ্বে উঠে রজোগুণী হতে হবে। তামসিকতা পরিহার করে

রাজসিক প্রকৃতিতে আরোহণ ব্যতীত আধ্যাত্মিক উন্নতি আদৌ সম্ভব নয়। আবার একথাও ঠিক যে রজোগুণী হয়ে ওঠা এবং রজোগুণে স্থিতিও সাধনার শেষ কথা নয়। গীতাতে তাকে এক মধ্যবর্তী অবস্থা বলা হয়েছে। রজোগুণের ঊর্ধ্বে উঠে সত্ত্বগুণী হলে শান্তি, সুখ ও জ্ঞানের আলো লাভ হয়ে থাকে। তবে কি সত্ত্বগুণী হওয়াই সাধনার শেষ কথা?

সত্ত্বগুণও সাধনার শেষ কথা নয়

শ্রীঅরবিন্দের মতে সত্ত্বগুণও গুণ। গুণ কথার এক অর্থ বন্ধন-রজ্জু; এবং শ্রীঅরবিন্দের অভিমত এই যে সত্ত্বগুণও বন্ধনের কারণ। তাঁর কথা Sattwa also binds and must be transcended—অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উর্দ্ধেও সাধককে উঠতে হবে, এবং তম রজ ও সত্ত্ব এই তিন গুণের অতীত ত্রিগুণাতীত অবস্থায় উপনীত হতে হবে; নইলে চরমজ্ঞান অজ্ঞাত, চরমপদ সাধকের অনায়ত্ত থাকবে—এক কথায় তাঁর সাধনার পরিসমাপ্তি হবে না। সত্ত্বগুণী হওয়া যে সাধনার শেষ কথা নয়, তা শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "জগন্নাথের রথ" নামক প্রবন্ধে সুন্দর কবিত্বপূর্ণ ভাষায় দেখিয়েছেন। ঐ প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকদের তিন প্রকার রথের বা যানের আরোহী-রূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা এই:

"তমোগুণী পুরুষ যেন কচ্ছপগতি, আধ-ভাঙা গরুর গাড়ীর মালিক। গাড়ির মালিক ভূঁড়ি-সর্বস্ব, ময়লা-কাপড়-পরা এক অন্ধবৃদ্ধ। গাড়ীর মালিকের মুখে বুলি 'যা আছে বা ছিল তাই ভাল; যা হবার চেষ্টা তা-ই খারাপ।' অর্থাৎ এই লোকটি চরম নিরুদ্যমের দৃষ্টান্ত এবং ভারতবাসীর প্রতীক।

"রজোগুণী পুরুষ যেন একজন বিলাসী মটোর গাড়ীর মালিক। ভীমবেগে রাজ-পথ চূর্ণ করিয়া অশান্ত অশ্রান্ত গতিতে সে চলিতেছে; যাকে সম্মুখে পায় দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যায়। এই পথে চলায় যথেষ্ট ভোগসুখ আছে; বিপদও অনিবার্য; ভগবানের নিকট পৌঁছানো অসম্ভব। আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ তার দৃষ্টান্ত।"

"সত্ত্বগুণী পুরুষ এমন একটি রথের আরোহী যা নিপুণ কারিগরের সৃষ্টি। যে অগ্রসর হইতেছে সুপথে সযত্নে ত্বরারহিত মন্থরগতিতে। যে উপরিস্থ উত্তুঙ্গ প্রদেশে ভগবানের মন্দির এই রথ তারই চারিদিকে ঘুরিতেছে, কিন্তু কিছু দূরে রহিয়া। সেই উচ্চভূমির খুব নিকটে সে পৌঁছিতে পারে না। পৌঁছিতে যে পারে না তার কারণ এখনও তার অহংকার ঘুচে নাই; অর্থাৎ এখনও সে ত্রিগুণাতীত হইতে পারে নাই। তবে তার জীবন সুপথে সযত্নে চালিত হইতেছে।"

এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা গেল সত্ত্বগুণী তামসিকতার জড়ত্ব ও রাজসিকতার অশ্রান্ত কর্মের উর্ধ্বে উঠেছেন সত্য, তবু ভগবানের মন্দিরে পৌঁছানো তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়—অর্থাৎ সত্ত্বগুণ-লাভ হলেও সাধনার শেষ হয় না। কীভাবে কর্মের ক্রমোচ্চ সোপান পরম্পরা অতিক্রম করে সাধক সত্ত্বগুণেরও উর্ধ্বে উঠে অহংকার-মুক্ত ও ত্রিগুণাতীত হন এবং দিব্যকর্মের স্তরে আরোহণ করেন এইবার আমাদের তা দেখতে হবে।

দিব্যকর্মের সোপান পরম্পরা

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'Synthesis of Yoga' গ্রন্থের ২৮৩ পৃষ্ঠায় দেখিয়েছেন কী ভাবে পরপর উচ্চ থেকে উচ্চতর কর্মের সোপান অতিক্রম করে কর্মের উচ্চতম বা দিব্যকর্মের স্তর সাধক আরোহণ করবেন। আমরা তাঁর নিজের কথায় সোপানগুলির বর্ণনা করবো। সোপানগুলি এই :

The first step is to consecrate all our works as a sacrifice to the Divine in us and in the world. অর্থাৎ পরমাত্মা মানুষের অন্তরে এবং সর্বজগতে রয়েছেন। কর্মযোগের প্রথম সোপান হলো সর্বকর্ম দ্বারা পরমাত্মার অর্চনা করা—ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে সর্বকর্ম করা। সাধকের মনে শুভ ফলপ্রাপ্তির আশা থাকে বলে এ কর্ম সকাম কর্ম। তবে এ-ও উচ্চস্তরের কর্ম বই কী ?

The second step is to renounce attachment to the fruit of works. অর্থাৎ কর্মের দ্বিতীয় বা উচ্চতর স্তর হলো নিষ্কাম কর্ম বা কর্মফলে আসক্তিবর্জন। গীতায় এই নিষ্কাম কর্মের কথাই বলা হয়েছে—কর্ম করতে হবে, কিন্তু ফলাশা ত্যাগ করতে হবে। কর্ম দ্বারা ভগবানের অর্চনা করলে ভগবান প্রসন্ন হয়ে কর্মীর মঙ্গল করবেন এই আশায় নিষ্কাম কর্মী কর্ম করেন না। তবে কি নিষ্কাম কর্ম ফলপ্রসূ হয় না ? নিষ্কাম কর্ম নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হয় এবং নিষ্কাম কর্মের ফলে স্বভাবতই নিষ্কাম কর্মীর মঙ্গল হয়ে থাকে ; তবে শুভ লাভের আশায় কিংবা অশুভ এড়াবার আকাঙ্ক্ষায় নিষ্কাম কর্মী কর্ম করেন না। ফলের দিকে না তাকিয়ে যা করণীয় সাধক তা করে যান।

নিষ্কাম কর্মও দিব্যকর্ম নয়

অনেকে তো একেই কর্মের শেষ কথা মনে করবেন ; কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন এর অপেক্ষাও কর্মের উচ্চতর আদর্শ, সাধকের উচ্চতর অবস্থা আছে এবং তা-ই হলো কর্মের উচ্চতম সোপান। সে সোপান সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ

বলেন: The third step is to get rid of the central egoism and even the ego-sense of the work. অর্থাৎ মানুষের অহংবুদ্ধি বা কর্তৃত্বাভিমান—আমি কর্তা, কর্ম আমার এই অভিমান মানুষের একেবারে মজ্জাগত। কর্মফলের আশা ত্যাগ করলেও এই কর্তৃত্বাভিমানের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে "নাহংকারাৎ পরঃ রিপুঃ"—অহংকার বা আমি কর্তা এই অভিমান অপেক্ষা মানুষের বড় শত্রু আর কিছু নেই। দিব্যকর্মের সাধককে এই কর্তৃত্বাভিমানও বর্জন করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের কথা সাধককে sense of doing-ও বর্জন করতে হবে, তখন সাধক acts as the conscious instrument of the Eternal worker. অর্থাৎ ভগবান সতত ক্রিয়াশীল। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের বাইশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন "পার্থ, আমার ত্রিলোকে কিছু করণীয় নাই, অপ্রাপ্য বা প্রাপ্তব্যও কিছু নাই, তবু আমি কর্মে ব্যাপৃত থাকি।" যে সাধক দিব্যকর্মের স্তরে উঠেন তাঁর এই বোধ জন্মে যে তিনি সতত ক্রিয়াশীল ভগবানের হাতে একটি সচেতন যন্ত্রমাত্র। সাধক যন্ত্রমাত্র, তাই "আমি কর্তা" এই অভিমান তাঁর থাকে না। তিনি যা করেন তা যন্ত্রের মতন করে যান।

দিব্যকর্মের লক্ষণসমূহ

এই প্রসংগে গীতার বাণীর সারমর্ম হিসাবে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'Essays on the Gita' গ্রন্থের ৫১০ পৃষ্ঠায় যা বলেছেন তা থেকে দিব্যকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কী তা বোঝা যায়। সেখানে তিনি বলেছেন: It is only by discovering your true self and living according to its true truth······that your doings turn into a divinely authentic action. Know then your self; know your true self to be God and one with the self of all others. Know your soul to be a portion of God.······Offer first, all your actions as a sacrifice to the Highest and the One in you and to the Highest and the One in the world; deliver last all you are and do into his hands for the Supreme and Universal Spirit to do through you his own will and works in the world." অর্থাৎ দিব্যকর্মের সাধককে প্রথমে নিজের স্বরূপ কী তা জানতে হবে—ভগবানের সংগে এবং সর্বভূতের সংগে নিজের ঐক্য উপলব্ধি করতে হবে;

২২

তারপর ক্রমে ক্রমে কর্মের উচ্চতম সোপানে উঠতে হবে। প্রথমে যজ্ঞ হিসাবে কর্ম দ্বারা ভগবানের অর্চনা করতে হবে। তারপর ক্রমে ক্রমে কেবল কর্ম (অর্থাৎ কর্মফল) নয় নিজেকেও অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্বাভিমান ও অহংবুদ্ধিও ভগবানের হাতে সমর্পণ করতে হবে। তখন কী হয়? শ্রীঅরবিন্দ বলেন যখন সাধকের self-giving ও self-surrender পূর্ণ হয় তখন সাধকের এই বোধ জন্মে যে God Himself (the real person in us) becomes the shadhaka of the sadhana (Synthesis of Yoga p 50) অর্থাৎ সাধকের এই উপলব্ধি হয় যে তিনি যন্ত্রমাত্র এবং ভগবানই তাঁর মধ্য দিয়ে জগতের কাজ করছেন, নিজের ইচ্ছা পূরণ করছেন। এটি শ্রীঅরবিন্দের সাধনার একটি মূল কথা। বারীন্দ্রকুমারের নিকট লেখা পত্রের ৩৭ পৃষ্ঠায় শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "আমাদের শক্তি নয়, ভগবানের শক্তিই এই যোগের সাধক।"

উপসংহারে দিব্যকর্মের স্বরূপ ও লক্ষণগুলির একটু পুনরুক্তি করা যাক্। দিব্যকর্মের ভিত্তি আত্মজ্ঞান—পরমাত্মার সংগে ও সর্বভূতের সংগে ঐক্যবোধ। এই ঐক্যবোধকে একস্থানে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "the eternal bed-rock truth of nature." অর্থাৎ জ্ঞানের মূল কথা। ভগবানে প্রীতিপূর্বক আত্মসমর্পণ—self-giving ও self-surrender দিব্যকর্মের প্রধান অঙ্গ। self-surrender বলতে কেবল কর্মফল বর্জন বোঝায় না। অহংবুদ্ধি ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জনও বোঝায়। সাধক যন্ত্রমাত্র তাই ভগবানই সাধনার প্রকৃত সাধক। সাধকের এই বোধ হলে কর্ম 'মুক্তস্য কর্ম' হয়ে উঠে। জীব কর্মের কর্তা নয়, প্রকৃতি ও প্রকৃতির অধীশ্বর পরমাত্মাই কর্মের প্রকৃত কর্তা, সাধকের এই বোধ হলে সাধক পাশ-মুক্ত হন, মুক্তিলাভ করেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবের পাশ-মুক্তির উপায় প্রসঙ্গে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তখন মুণ্ডক (৩।১।১) ও শ্বেতাশ্বতর (৪।৬) উপনিষদের ভাষায় সাধক "বীতশোক" হন, আনন্দময় অবস্থা লাভ করেন। তখন ঈশোপনিষদের কথা "ন কর্ম লিপ্যতে নরে" আর গীতার কথা "হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান ন হন্তি ন নিবধ্যতে" (অর্থাৎ তিনি সমস্ত লোক হনন করলেও কিছুই হনন করেন না এবং কর্মের ফলে তাঁকে আর আবদ্ধ হতে হয় না) সাধকের এই উপলব্ধি হয়। গীতার "যোগ কর্মসু কৌশলম্" কথাটির মর্ম এই। এই হলো দিব্যকর্মের স্বরূপ।

সমাপ্ত

নির্দেশক সূচী